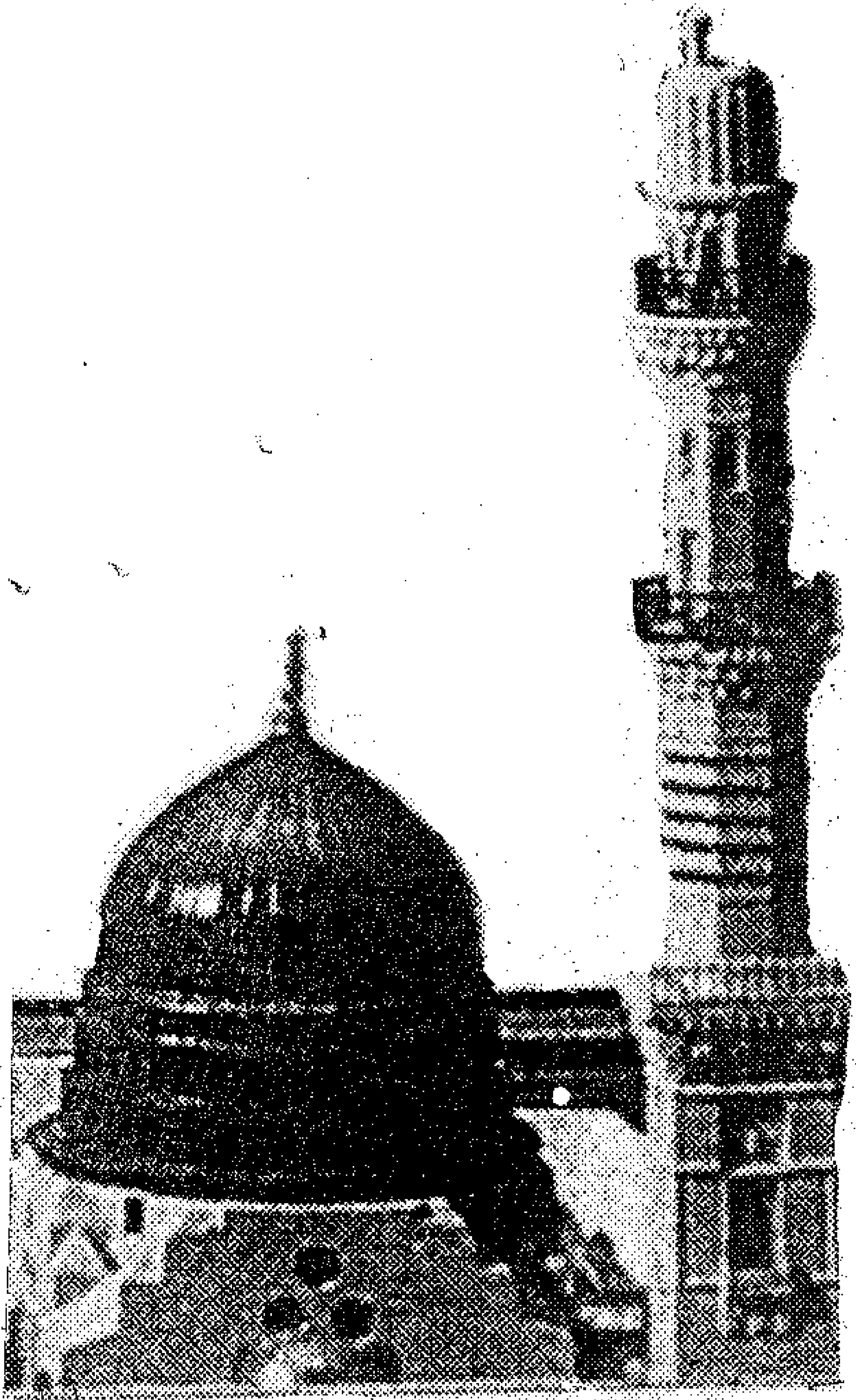


মাদারেজুন্ নবুওয়াত



শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত

প্রথম খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

সেরহিন্দ প্রকাশন
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাদারেজুন্ নবুওয়াত ঃ
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

অনুবাদক ঃ
মাওলানা মুমিনুল হক

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্

প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর ১৯৯৪ ইং
জমাদিউস্ সানী ১৪১৫ হিঃ

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জুন ১৯৯৫ ইং
মহররম-১৪১৬ হিঃ

তৃতীয় প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৯৮ ইং
ফোন ঃ ২৩৯৪৯০, ২৩১০১২

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুর রৌউফ সরকার

মুদ্রণ ঃ
নাটোর প্রেস লিঃ/৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ২৩৯৪৯০, ২৮৩০০৯

বিনিময় ঃ
১২০.০০ (একশত কুড়ি টাকা মাত্র)

MADAREZUNNABUWAT/by Shaekh Abdul Haque Muhaddeshe Dehlabhi (Rh.) transliterated by Maolana Mominul Haque/Published by Serhind Prakashan/Ex. Taka 120.00 US $ 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'সুসংবাদ' বললে কম বলা হবে। প্রায় চারশ' বছর পর 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' এর মতো জ্যোতির্ময় গ্রন্থটি আমরা আমাদের আপন ভাষায় পেলাম। পবিত্রতা ও প্রশংসা মহান প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই। অন্তরের অন্তঃস্থলজাত সকল উৎকৃষ্ট দরূদ ও ছালাম রসূলে আজম সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মুজতাবা সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি। যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন এবং তিনি যাঁদেরকে ভালোবাসেন—তাঁদের সকলের প্রতি। আমিন।

আমরা যাঁরা বিশ্বাসী বান্দা, বলুনতো দেখি—আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন রসূল মোহাম্মদ (সঃ) ছাড়া আর কে? আমরা তো আমাদের অদৃষ্টের

প্রতি ধৈর্য ধারণ করেছি একথা জেনে যে, প্রকৃত অর্থে আমরা 'এতিম। পৃথিবীতে এসে জ্ঞানবুদ্ধি হতেই জেনেছি, আমাদের সর্বাপেক্ষা আপনজন আমাদের জন্মের প্রায় চৌদ্দশত বছর আগেই অন্তরাল গ্রহণ করেছেন। সুতরাং শোক আমাদের জন্মগত সহচর। নবীবিরহ্ আমাদের অদৃষ্টের অমোঘ লিখন। পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ না করে আমরা আপনতম নবীর সঙ্গে আর মিলতে পারবোনা। অতএব, নিরূপায় বিরহীদের যা হয়, প্রিয়তমজনের স্মৃতিইতিবৃত্তপ্রসঙ্গই আমাদের বিরহ্‌বিক্ষত বুকের একমাত্র সান্ত্বনা।

সেকারণেই প্রিয়তম রসূলের জীবনী রচনার কাজ চলে আসছে চৌদ্দশত বছর ধরে। বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন ভাষায়। সে সমস্ত পবিত্র জীবনীগ্রন্থের মধ্যে 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থ। গ্রন্থকার হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) বহুগ্রন্থপ্রণেতা সর্বজনমান্য আউলিয়া বুজর্গ, আলেম। 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। সুস্থসচেতন অভিজ্ঞান এবং পবিত্র প্রেমানুভূতি এখানে একই নির্ঝরিনির সলিল হয়ে প্রবাহিত হয়েছে অন্তহীন সাফল্যের সমুদ্রের দিকে। এর বাংলা রূপায়ণের শ্রমসাধ্য দায়িত্বটি পালন করেছেন এই নগণ্য ফকিরের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মুমিনুল হক সাহেব। আল্লাহ্‌তায়ালা মূল গ্রন্থকারকে, অনুবাদককে এবং সেরহিন্দ প্রকাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

এখনতো সন্দেহ অবিশ্বাসের আঘাতে টলটলায়মান আমাদের সাধের পৃথিবী। তার উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে কাফের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং মুনাফিক আবুল আলা মওদুদীর ফেৎনাবাজ অনুসারীরা। এই নূরে ভরপুর গ্রন্থটি তাদেরকে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করবার কাজে একটি বিজয়ী দলিল হিসাবে কাজ করবে–এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ্। আল্লাহ্‌তায়ালাই হককে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাতিলকে ধ্বংস করেন। আমরা কাদিয়ানী ও মওদুদী ফেৎনাসহ্ সকল ফেৎনার ধ্বংস কামনা করি। আমিন।

ওয়াচ্ছালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ

কাননে কুসুম কাঁপে সাগরে সলিল
ভ'রে যায় ফেরেশ্‌তায় জমিন আকাশ
নিয়ে আসে কে আরবে দ্বীনের দলিল
কাঁপে বিশ্ব সুখে পেয়ে তাহার সুবাস।
কুল মাখলুক জুড়ে দরূদ সালাম
কাবার কপাটে লাগে নূরের আঘাত
ধ্বংস ক'রে মিথ্যাচার নতুন কালাম
বহালো মরুর বুকে প্রেমের প্রপাত।
ধারা তার দুর্নিবার আরবে আজমে
কখনো অশনি আনে কখনো শিশির
করে দ্যায় পাক সাফ যেনো জমজমে
সকল আবিল দীল্ দিবস নিশির
দ্বাদশ তিথির স্মৃতি হেজাজী হেলাল
তোমরাই জামাল নিয়ে মত্ত মহাকাল।

সেরহিন্দ প্রকাশন-এর বই

- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব'দা ওয়া মাআদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১ম খণ্ড)
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (২য় খণ্ড)
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (৩য় খণ্ড)

- নূরে সেরহিন্দ
- নক্‌শায়ে নক্‌শবন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্‌তী
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা (আঃ)
- তুমিতো মোর্শেদ মহান

- নবী নন্দিনী
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- পিতা ইব্রাহিম
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- পথ পরিচিতি

- **THE PATH**
- নামাজের নিয়ম
- সোনার শিকল
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- মালাবুদ্দা মিনহু
- রমজান মাস

প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ

- জননীদের জীবন কথা

প্রথম অধ্যায়

মহানবী (সঃ) এর আঙ্গিক ও গঠনগত সৌন্দর্য

নূরানী চেহারা

হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নূরানী চেহারা মোবারক জামালে এলাহীর দর্পন ও অসীম নূরের বহিঃপ্রকাশের আধার। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত বারা ইবন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মানবকুলের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও কমনীয়। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চেয়ে সুন্দর কোনো কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।—হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর বক্তব্যে 'কোনো কিছুই দেখিনি' কথাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি কিন্তু কোনো মানুষকে দেখিনি অথবা কোনো পুরুষকে দেখিনি—এরূপ বলেননি। তাঁর বর্ণনার মধ্যে অধিক ব্যাপকতা রয়েছে। নবী করীম (সঃ) এর আঙ্গিক সৌন্দর্যের আধিক্য বোঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য। মোটকথা, মহানবী (সঃ) এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা সমস্ত কিছুর উপর অগ্রগণ্য ছিলো। এমর্মে তিনি আরও বলেছেন, নবী করিম (সঃ) এর নূরানী চেহারাখানা এতো উজ্জ্বল যে, সূর্যের উজ্জ্বলতাও তার কাছে হার মেনেছে। যেমন কবি বলেন, রাতের পর এমন কোনো দিবসের অভ্যুদয় ঘটেনি যা মহানবী (সঃ) এর নূরানী চেহারার চেয়ে উজ্জ্বল।—মোটকথা তাঁর নূরানী চেহারার জ্যোতির্ময়তার তুলনায় অন্য সবকিছুর উজ্জ্বলতা নেহায়েতই নগণ্য।

সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, হজরত বারা ইবন আযিব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হুজুর আকরম (সঃ) এর নূরের আভাকে স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে কি তরবারীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে? তিনি বলেন, না। বরং তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা ছিলো চন্দ্রের ন্যায়। তরবারীর সাথে চেহারার তুলনা যথাযথ হতে পারে না। কেননা তরবারিতে গোলাকৃতি অনুপস্থিত। তাই তিনি চেহারা মুবারককে চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন। চন্দ্রের মধ্যে চাকচিক্য আছে। তদুপরি গোলাকৃতিও বিদ্যমান।

১—

ছহীহ্ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (বারা ইবন আযিব) উত্তরে বললেন, না। বরং হুজুরের চেহারা মোবারক চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় ছিলো। অর্থাৎ গোলাকার। যদিও চন্দ্রের তুলনায় সূর্যের মধ্যে কিরণ ও চাকচিক্য অধিক, তথাপিও চন্দ্রের মধ্যে যে লাবণ্য বিদ্যমান সূর্যে তা নেই। আর লাবণ্য এমন এক সৌন্দর্য যা দেখলে অবর্ণনীয় পুলকানুভূতি লাভ করা যায় এবং অন্তর আকৃষ্ট হয়—যার অনুভূতিলাভ কেবল সুস্থ সৌন্দর্যবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকেন। 'ছাবাহাত' হজরত ইউসুফ (আঃ) এর গুণ ছিলো আর 'মালাহাত' গুণটি হুজুর আকরম (সঃ) এর শানে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এমর্মে স্বয়ং হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেন 'আনা মালিহ্ ওয়া আখি আছবাহ্'—অর্থাৎ আমি লাবণ্যময় আর আমার ভাই ইউসুফ (আঃ) উজ্জ্বল।

'নবী করীম (সঃ) এর চেহারা মুবারক গোল ছিলো' একথার অর্থ এই নয় যে, চেহারা বৃত্তের ন্যায় ছিলো। কেননা বৃত্তাকার গোল হওয়াটা রূপ ও সৌন্দর্যের পরিপন্থী। বরং চেহারা মুবারক গোল ছিলো মানে এমন এক ধরনের গোল ছিলো যা দেখতে লম্বা নয়। এ ধরনের চেহারা রূপ, লাবণ্য, পৌরুষ ও মহত্ত্বের নিদর্শন। কথিত আছে যে, তাঁর চেহারা মুবারক ছিলো مكلثم 'মুকালছাম'। مطهم 'মুতহাম' নয়। 'মুকালছাম' গোলগাল চেহারাকে বলা হয়। কাযী আয়ায (রঃ) কর্তৃক রচিত কিতাবুশ্‌শিফা গ্রন্থে 'মুকালছাম' এর বর্ণনা দেয়া রয়েছে। যার চেহারায় চিবুক ছোট হয়ে থাকে তাকে মুকালছাম বলে। আর চিবুক ছোট হওয়া মানে চেহারা গোলগাল হওয়া। কেননা চিবুক লম্বা হওয়ার কারণেই চেহারা লম্বাটে হয়। আর 'মুতহাম' বলা হয় মাংশল চেহারাকে যা দৃশ্যতঃ স্ফীত বলে মনে হয়।

অভিধানে 'মুকালছাম' শব্দটি বৃত্তাকার ও সমন্বিত করা অর্থেও এসেছে। আবার অভিধানে উক্ত শব্দটির অর্থ 'দুর্বল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এদুটি অর্থই সৌন্দর্যের পরিপন্থী। নবী করীম (সঃ) এর চেহারা মুবারকের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি মুলায়েম মৃত্তিকাখন্ড সদৃশ ছিলেন। سهل 'সহল' নরম ও সমতল ভূমিকে বলা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় سيل الحدث 'সাইলুল হাদীত' 'প্রবাহিত গন্ড।' سيلان 'সাইলান' 'প্রবাহিত হওয়া' শব্দ থেকে যার উৎপত্তি। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হজরত ইবন আছীর (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় اساله درخدين যার অর্থ গন্ডদেশ এমন লম্বা ছিলো যা উঁচু নয়। বেরিয়ে পড়ে এমন নয়।

শায়েখ ইবন হাজার আছকালানী (রঃ) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেকের এ অনুসন্ধিৎসা হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী করীম (সঃ) এর চেহারা মুবারক তরবারীর মতো ছিলো কি না? ব্যাপারটি চিন্তা ভাবনার দাবী রাখে।

কোনো কোনো হাদীছে নবী করীম (সঃ) এর চেহারা মুবারকের উপমা স্বরূপ 'এক ফালি চাঁদ' বা 'অর্ধচন্দ্র' ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে। বিভিন্ন কবিতায়ও এরকম উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে। হজরত কা'ব ইবন মালিক (রাঃ) যিনি সাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন—তাঁর কবিতায়ও এ ধরনের উপমা দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এর প্রয়োগ ও যথার্থতার ব্যাপারে একটি সামঞ্জস্যশীল সমাধানে পৌঁছানো উচিত। সুতরাং সমাধানস্বরূপ কেউ কেউ এরকম বলেছেন যে, উপরোক্ত উপমাসমূহ দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) কখনও কারো প্রতি পূর্ণ অভিমুখী হয়েছেন বা কারও প্রতি আংশিকভাবে মুখ ফিরিয়েছেন—সকল অবস্থাগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। এজাতীয় সমাধানের পক্ষে সহায়ক দলীল স্বরূপ তিবরানী শরীফে প্রাপ্ত হজরত জুবায়ের ইবন মুৎইম (রাঃ) এর হাদীছখানি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের দিকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, মনে হলো যেনো একখানা অর্ধচন্দ্র। তবে সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান এটাই যে, চন্দ্র বা অর্ধচন্দ্র বা একফালি চাঁদ, —এজাতীয় যে উপমাগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে, তা হুজুর পাক (সঃ) এর ললাট মুবারকের উপমা। অর্থাৎ তাঁর ললাটখানি ছিলো যেমন একফালি চাঁদ। ছহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত কা'ব ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর ললাট মুবারকে যখন ভাঁজ পড়তো তখন চেহারা মুবারক চন্দ্রের ফালির মতো ঝক মক করতো। 'সাররাহ' নামক আরবী অভিধানে 'দু ফাতহাযোগে' শব্দটির অর্থ লিখা হয়েছে 'ললাটে ভাঁজ পড়া'। তার বহুবচন হচ্ছে اسرار 'আসরার' আর মুনতাহাল জমু হচ্ছে اسارير 'আসারীর'। হাদীছ শরীফে শব্দটি পাওয়া যায়, তাঁর নূরানী কপাল মুবারকের ভাঁজগুলি চমকাতে থাকতো। হুজুর পাক (সঃ) এর চেহারা মুবারককে একফালি চাঁদের সাথে উপমা দেয়ার ব্যাপারটিকে কেউ কেউ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, এক ফালি চাঁদে যেরূপ কলংক খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি হুজুর পাক (সঃ) এর চেহারা মুবারক ছিলো কলংকহীন। এধরনের সমাধান অবশ্য দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, কোনোকিছুর সৌন্দর্যকে যখন চন্দ্রের সাথে তুলনা করা হয়, তখন চন্দ্রের কলঙ্ককে বাদ দিয়ে শুধু তার জ্যোতির্ময়তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে ।

সাইয়্যেদুনা হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর চেহারা মুবারক ছিলো আলোকোজ্জ্বল বৃত্তাকার চন্দ্রের ন্যায়। دائره قمر 'দায়েরায়ে কামার' বলা হয় পুর্ণিমার চন্দ্রকে। ফারসী ভাষায় যাকে বলা হয় খিরমনশাহ্। (আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) বলেন, আমার মনে হয় চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে এবং তার আলোকময় বৃত্তকে দেহের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে হুজুর পাক (সঃ)-এর চেহারার ঐ আভার প্রতিই প্রকাশ্যভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা নূরের-আকৃতিতে চন্দ্রের বৃত্তের ন্যায় চেহারা মুবারককে বেষ্টন করে নিয়েছে। উপমা প্রদান করাটা হচ্ছে হুজুর পাক (সঃ) এর নূরের ধারার পূর্ণ কিরণ, তাঁর মহত্বের ভাবগাম্ভীর্যতা এবং শান শওকত প্রকাশের একটা পদ্ধতি মাত্র। চেষ্টা করে ও লক্ষ্য করে দেখতে হবে, উক্ত উপমার প্রতি আত্মিক দৃষ্টি প্রদান করার পর কি অবস্থা উদ্ভাসিত হয়। আর দৃষ্টিপাতকারীর দৃষ্টিতে তাঁর সৌন্দর্য ও শান শওকত কিভাবে প্রতিভাত হয়। কেননা এ আত্মিক দৃষ্টি নয়নযুগলকে পরিতৃপ্ত করে আর অন্তরকে মহানবী (সঃ) এর প্রেমভালোবাসা ও আজমতের নূর দ্বারা কানায় কানায় ভরপুর করে দেয়।

হজরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) এর হাদীছেও 'চন্দ্রের বৃত্ত' এই উপমা বিদ্যমান। আর চন্দ্রের সাথে যেসব উপমা এসেছে সেগুলি দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ণিমার চন্দ্র বুঝানো হয়েছে এবং এটাই প্রসিদ্ধ। যেমন ইমাম বায়হাকী (রঃ) হজরত আবু ইছহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা এক হামাদানী মহিলা আমাকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে হজ করেছি। তা শুনে আমি তাকে বললাম তাহলে তাঁর চেহারা মুবারকের বর্ণনা দাও দেখি। তখন মহিলাটি বললেন, তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার শশীর ন্যায় সুন্দর। আমি এরূপ সৌন্দর্য পূর্বেও দেখিনি। পরেও দেখিনি।

অনুশীলনকারী সন্ধানীগণ সর্বদাই তাঁর ললাটে নূরের জ্যোতির্ময় ধারাকে আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে অবলোকন করে শুক্লপক্ষের রজনীর ন্যায় প্রাপ্ত হতেন। এমন আত্মিক দর্শন থেকে কখনও অমনোযোগী হতেন না, কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না। কেননা 'দীদার' হচ্ছে নগদলভ্য ।

হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে, দর্শনকারীর দৃষ্টিতে হুজুর পাক (সঃ) ছিলেন একজন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার শশীর ন্যায় ঝকমক করতো।

দু'জাহানের সৌন্দর্য হুজুর পাক (সঃ) কে সূর্যের সাথে উপমা না দিয়ে চন্দ্রের সাথে উপমা দেয়ার কারণ সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন, চন্দ্র তার জ্যোৎস্নার মাধ্যমে চোখকে শীতল

করে। হৃদয়কে পুলকানুভূতি প্রদান করে। মনে আনে প্রেমভালোবাসা এবং অনুভবে আনে পরম অস্বাদ। জ্যোৎস্নার প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব। কিন্তু সূর্যের আলোর দিকে তাকানো সম্ভব নয়। এতে চোখ ঝলসে যায়। অন্তরে বিস্বাদ সৃষ্টি হয়। অবশ্য হুজুর পাক (সঃ) কে সূর্যের সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। তা হচ্ছে এই, হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব মহান গুণাবলীর প্রকাশস্থল। শাঁন শওকত ও অবিসংবাদী কর্তৃত্বের দিক দিয়ে তিনি সূর্যের মতো। পৃথিবীপ্লাবী আলোর ছটায় সূর্য যেমন জগতকে বেষ্টন করে নেয়। তিনিও তেমনি তাঁর নূরের কিরণের মাধ্যমে সারা জাহানকে বেষ্টন করে নিয়েছেন। মহানবী (সঃ) এর ব্যক্তিসত্তার হকীকতের (প্রকৃত তত্ত্বের) রহস্য অবহিত হতে মানুষ অক্ষম। এ দিক দিয়েও তিনি সূর্যের মতো। দূরবর্তী বা নিকটবর্তী যে কেউ হোক না কেনো, তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতার শেষপ্রান্ত সম্পর্কে অবহিত হতে বা অনুধাবন করতে সকলেই অক্ষম ও সামর্থহীন—এদিক দিয়েও তাঁকে সূর্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন কবির ভাষায় বলা হয়েছে, মোহাম্মদ (সঃ) এর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করতে সৃষ্টজগত অক্ষম।' দূরের ও নিকটের কেউই তাঁর প্রকৃত পরিচিতি লাভ করতে পারেনা। তিনি এক সূর্যতুল্য মহান সত্তা, যা দূর থেকে ক্ষুদ্রাকৃতিতে মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সোজাসুজি কেউ যদি তাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাহলে দৃষ্টি অবসন্ন হয়ে যাবে। ফলকথা তিনি হচ্ছেন এমন এক উজ্জ্বল রবি, যার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে সৃষ্টিকুল অক্ষম।

এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে সূর্যের উপমা। তবে অবলোকন ও অনুভূতির দিক দিয়ে চন্দ্রের উপমাই শোভনীয়।

মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ায় নেহায়া কিতাব থেকে সংকলিত হয়েছে, হুজুর পাক (সঃ) যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক আয়না সদৃশ হয়ে যেতো। এমনকি দেয়াল দরোজার নক্‌শা এবং মানুষের চেহারার প্রতিবিম্ব তাতে ঝলমল করতে থাকতো।

হজরত জাবের ইবন সামুরাহ (রাঃ) বলেন, একদা এক চাঁদনি রাতে আমি হুজুর পাক (সঃ) কে দেখলাম। তখন তাঁর শরীর মুবারকের উপর দু'খানি লাল কাপড় ছিলো। আমি কখনও তাঁর দেহ মুবারকের প্রতি তাকাই আবার কখনও চাঁদের জ্যোৎস্নার প্রতি তাকাই। আল্লাহর কসম চাঁদের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা রসূলে পাক (সঃ) কেই আমার কাছে বেশী সুন্দর মনে হলো। বর্ণনাকারী সাহাবীর 'আমার কাছে' শব্দটিতে নবী করীম (সঃ) এর রূপলাবণ্যের দ্বারা তিনি যে পরম আস্বাদ উপভোগ করছিলেন তার ইঙ্গিত

খুঁজে পাওয়া যায়। এটি তাঁর আনন্দ উপভোগের বহিঃপ্রকাশ বটে। তবে প্রকৃত অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।। রসূল (সঃ) এর রূপ লাবণ্য সর্বোপরি—এতে কোনো সন্দেহ্ নেই।[1]

হুজুর আকরম (সঃ) এর উন্নত মানের গুণাবলী কবিত্বের দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা কাব্যিক ধারণা ও স্বভাবের অন্তর্গত। নতুবা তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যাবলী এবং আঙ্গিক গুণাবলীর তুলনা তো হতেই পারে না।

পবিত্র আঁখিযুগল

হুজুর আকরম (সঃ) এর নয়ন মুবারকের আলোচনা দু'টি দিক দিয়ে উপস্থাপিত হতে পারে। প্রথম আলোচনা হুজুর পাক (সঃ) এর নয়ন মুবারকের অবস্থানস্থল এবং আকৃতি কেমন ছিলো, তার গঠন কেমন ছিলো—এ প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় আলোচনা, তাঁর দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা সম্পর্কে। আলোচনার প্রথম প্রসঙ্গ সম্পর্কে হজরত আলী (কাঃ) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা এরূপ—তিনি বলেন, তাঁর পবিত্র চক্ষু ছিলো ডাগর ডাগর এবং চোখের ভ্রু ছিলো দীর্ঘ। ডাগর চক্ষু বা বড় চক্ষু বলার উদ্দেশ্য "তাঁর চোখ ছোট ছিলোনা" একথা বুঝানো। আবার বড় অর্থ এও নয় যে, অস্বাভাবিক বড় যা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মহানবী (সঃ) এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনার ব্যাপারে মৌলিক বিষয় এটাই যে, তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ ছিলো মধ্যম ধরনের স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যশীল। কেননা রূপ-সৌন্দর্য, মর্যাদা ও পূর্ণতার ভিত্তি হলো মধ্যম ও স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা।

অন্য এক হাদীছে এসেছে, তাঁর নয়ন যুগলের পুতুলির রং ছিলো 'আশকালুল আইনাইন' সাদা ও লাল মিশ্রিত। অর্থাৎ চোখের পুতুলির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রগগুলি ছিলো লাল রঙের। তাঁর চক্ষুদ্বয়ের স্বরূপ বর্ণনায় কালো ও লাল রঙ শব্দটির ব্যবহার খুব কম পাওয়া যায়। তবে নেহায়া নামক কিতাবে বলা হয়েছে, হুজুর পাক (সঃ) এর আঁখিদ্বয়ের রং ছিলো কালো ও লাল মিশ্রিত। হাঁ এটাও প্রিয়জনের চোখের সৌন্দর্যের একটি দিক। তবে

---

[১] টীকাঃ-হাদীছ শরীফে حلة 'হুল্লাতুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। حله 'হুল্লাহ' চাদর ও লুঙ্গি সমন্বিত জোড়া কাপড়কে বলা হয়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, রসূল (সঃ) লাল পোশাক পরিধান করলেন কেমন করে। অথচ পুরুষের জন্য লাল পোষাক বৈধ নয়। তার জবাব হচ্ছে 'লাল' বলতে এখানে লাল নক্শা করা পোশাককে বুঝানো হয়েছে। নিরেট লাল রং নয়। এটা মুহাদ্দিসগণের নিশ্চিতি। তবে যারা حله 'হুল্লাহ' বলতে রেশমী জামা আর حمرا 'হামরা' বলতে নিরেট লাল রং মনে করেন তারা ভ্রান্তির মধ্যে আছেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে اشكل العينين 'আশকালুল আইনাইন'। অবশ্য বিভিন্ন কবিতায় উদ্যমী নওজোয়ানদের প্রশংসার ক্ষেত্রে شهلة 'শাহ্‌লাহ্' শব্দের ব্যবহার এসেছে। অভিধান গ্রন্থে اشكل 'আশকাল' এর অর্থ করা হয়েছে লাল ও সাদা রঙ্গের মিশ্রিত যৌথ বর্ণ-যার সাদা বর্ণের উপর রক্তিমাভা ঝিলিক দেয়। شكلة 'শাকলাহ' কে سحرة 'সাহ্‌রাহ্' ও বলা হয় যা سحر 'সেহের' (যাদু করা) শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যাকে বলা হয় মায়াবী চোখ। কেননা এধরনের চোখ মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কোনো কোনো হজরত 'আশকালুল আইনাইন' এর ব্যাখ্যা করেন طويل شق العينين 'তাবীলু শাক্‌কিল আইনাইন' অর্থাৎ দীর্ঘ সরু চোখ। অভিধান গ্রন্থেও এরকম অর্থ করা হয়েছে। কাযী আয়ায মালেকী (রঃ) এর বর্ণনাও এরকম। শামায়েলে তিরমিজিতেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। আমিরুল মু'মিনীন হজরত আলী (কাঃ) এর ভাষ্য عظيم العينين 'আযীমুল আইনাইন' (বড় চোখ) ও বাহ্যত উপরোক্ত অর্থই প্রদান করে। প্রকৃত তত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন।

এক বর্ণনায় এসেছে ادمج العينين 'আদমাজুল আইনাইন'। ঘন কালো চোখকে ادمج 'আদমাজ' বলা হয়। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে প্রশস্ত-। অন্য এক বর্ণনায় আছে اكحل العينين 'আকহ্‌লুল আইনাইন'–সুরমাযুক্ত চোখ। অর্থাৎ হুজুর পাক (সঃ) এর লোচনদ্বয় সুরমা ছাড়াই সুরমাযুক্ত পরিদৃষ্ট হতো।

দ্বিতীয় আলোচনা হুজুর পাক (সঃ) এর দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা সম্পর্কিত। এ মর্মে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) দিবালোকে যে রকম দেখতে পেতেন ঠিক তেমনি দেখতে পেতেন. রাতের অন্ধকারে। হাদীছখানা বুখারী শরীফ থেকে সংগৃহীত। বায়হাকী শরীফেও হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কাযী আয়ায (রঃ) "কিতাবুশ্ শিফা" তে এরূপ বর্ণনা করেছেন। হুজুর পাক (সঃ) এর দৃষ্টিশক্তি এতো প্রখর ছিলো যে, ছুরাইয়া নক্ষত্ররাজীর অভ্যন্তরে এগারটি নক্ষত্র তিনি পরিষ্কার দেখতে পেতেন। সুহাইলির বর্ণনায়, বারোটি দেখতে পেতেন । তাঁর দৃষ্টি আকাশের তুলনায় যমিনের দিকেই অধিকতর নিবদ্ধ থাকতো। নবী করীম (সঃ) যে অতুলনীয় লজ্জাশীলতার অধিকারী ছিলেন এটি হচ্ছে তার দলীল। বিভিন্ন হাদীছে যদিও এরূপ বর্ণনা এসেছে যে, হুজুর (সঃ) আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করতেন। কখনও কম করতেন আবার কখনও বেশী। এগুলো ওহীপ্রাপ্তির অপেক্ষায় সাধারণতঃ

করে থাকতেন। নতুবা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভ্যাস ছিলো দৃষ্টি অবনত রাখা। হুজুর আকরম (সঃ) অধিকাংশ সময় চোখের একপাশ দিয়ে তাকাতেন। তাঁর এহেন দৃষ্টিপাত চূড়ান্ত লজ্জাশীলতার নিদর্শন। কিন্তু আবার কারও প্রতি যদি মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন, তখন পরিপূর্ণভাবেই তার প্রতি ঘুরে যেতেন। ডানে বামে পাশ ঘুরিয়ে অথবা শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলাটা তিনি পছন্দ করতেন না। কেননা এ ধরনের কথা বলা অহংকারীর স্বভাব। তাঁর নজর মুবারক সামনে পিছনে সমানভাবে কার্যকর ছিলো। সুতরাং বিভিন্ন সহীহ্ হাদীছে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি অনেক সময় মুকতাদীগণকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা রুকু সেজদায় আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। আমি তোমাদেরকে সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় দিক দিয়েই দেখতে পাই, কাজেই তোমাদের রুকু সেজদা আমার কাছে গোপন নয়। এ বর্ণনার তাৎপর্য ও মাহাত্ম আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। আর এরকম অবস্থা শুধু তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থাও এরকমই ছিলো। এটা সহজবোধ্য ব্যাপার নয়। কেননা তাঁর নিগুঢ় রহস্যে উপনীত হওয়া তো কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। হবেও না। নবী করীম (সঃ) এর প্রকৃত মাহাত্ম অবহিত হওয়ার দাবী করা মুতাশাবেহ্ আয়াতসমূহের তাবীল ও তফছীর সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দাবীতুল্য। আকল, কিয়াস, চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কিত মর্যাদা—এতো তাঁর মর্যাদা বটে। তবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত ব্যাপার কি কেবলই চোখের দৃষ্টি? না অন্তর্দৃষ্টি—নাকি এ অন্তর্দৃষ্টি তাঁর নামাজের অবস্থার জন্যই নির্ধরিত ছিলো—যাতে নূরের আধিক্যের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে সৃষ্ট জগতের পর্দা উঠে যেতো। নাকি এরকম গুণাবলী তাঁর সকল অবস্থা ও সকল সময়ের জন্য বিস্তৃত ছিলো? এর সমাধানে বলা যায়, পরোয়ারদিগারে আলম তাঁর হাবীবে পাকের সকল অঙ্গকে এরূপ দর্শনের যোগ্যতা ও শক্তি প্রদান করতে পারেন অথবা এ দৃষ্টিক্ষমতা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে মোজেজার ভিত্তিতে শর্তহীনভাবে প্রদান করেছিলেন।

কেউ কেউ এরকম বলেন যে, মহানবী (সঃ) এর দু'স্কন্ধের মধ্যে সূচাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম দু'টি চোখ ছিলো যার মাধ্যমে তিনি পশ্চাদ্ভাগেও দেখতে পেতেন। পোশাকের দ্বারা তা আচ্ছাদিত করা যেতোনা। অথবা কেবলা শরীফের দেয়ালে দর্পনের মতো মুকতাদীগণের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হতো—এভাবে তিনি তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করতেন। তবে এদু'টি কথাই আশ্চর্যজনক এবং সূক্ষ্ম। তবে হাঁ, এ ধরনের কথা যদি কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায় তবে আমরা অকপটে এর উপর ইমান

আনবো। নতুবা চিন্তাভাবনা করার অবকাশ আছে। কেননা এই বর্ণনা সীরাত বিশেষজ্ঞগণের বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে পাওয়া যায়নি।

এক্ষেত্রে দর্শন কে যদি নবী করীম (সঃ) এর কলবী দর্শন ধরা হয়, তাহলে এদ্বারা বুঝাবে ওহী (অবহিত করণ), কাশ্‌ফ্ ও এলহামের মাধ্যমে তিনি যে এলেম প্রাপ্ত হতেন তার দর্শন। সীরাত বিশেষজ্ঞগণের নিকট এটাই বিশুদ্ধ কথা। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা যে রকম হুজুর পাকের পবিত্র কলবের আকলগত এলেম ও অনুভূতিতে প্রশস্ততা এবং বেষ্টন প্রদান করেছেন। ঠিক তদ্রূপ তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ক্ষমতার অনুভব শক্তি ও এদরাকের মধ্যেও বেষ্টন প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বন্ধুর জন্য ছয় দিককে একই দিকে পরিণত করে দিয়েছেন। এব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

কতিপয় লোক এধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করে বলে যে, কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম পাওয়া যায়—হুজুর (সঃ) তো নিজেই বলেছেন "আমি নিছক একজন বান্দা, দেয়ালের অন্তরালে কি আছে তা আমি জানি না" এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। এধরণের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সঠিক বিবরণও পাওয়া যায় না। তাদের এধরনের কথা সমর্থন করা যদিও কঠিন তবু যদি ধরেও নেয়া যায় তাহলে, তদুত্তরে আমরা বলবো যে, হুজুর (সঃ) এধরণের এনকেশাফ (গায়েব দৃশ্য উন্মোচিত) হওয়াটা তাঁর নামাজের অবস্থার সাথে বিশিষ্ট। আর যদি তিনি এ প্রকারের এলেম হাসিল করে থাকেনই তবে তা আল্লাহ্‌তায়ালার অবহিত করানোর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। অন্যান্য সমস্ত গায়েবের এলেম সম্পর্কিত ব্যাপারেও এ একই অবস্থা মনে করতে হবে। এজন্যই এজাতীয় লোকেরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে হুজুর পাক (সঃ) এর এলেম ছিলোনা বলে উষ্ট্রী হারানোর ঘটনা দলিল স্বরূপ গ্রহণ করে থাকে। ঐ ঘটনাকালে মুনাফেক সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিলো, "মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আকাশের খবর বলে অথচ এতটুক জানে না যে, তার উষ্ট্রী কোথায় আছে" (নাউযুবিল্লাহ্)।

মুনাফিকদের এ ধরনের কুকথা যখন নবী করীম (সঃ) এর কর্ণগোচর হলো তখন তিনি বললেন, আমি স্বয়ং কিছু জানি না, স্বয়ং কিছু প্রাপ্ত হইনা। তবে এতটুকু জানি এবং পেয়ে থাকি যা আল্লাহতা'য়ালা আমাকে জানান এবং প্রদান করেন। তিনি সর্বদা এরূপ কথাই বলছিলেন। এমন কি এক সময় আল্লাহতায়ালা তাঁকে অবহিত করে দিলেন যে, উষ্ট্রী অমুক স্থানে আছে। উক্ত উষ্ট্রীটি একটি বৃক্ষের সঙ্গে আটকা পড়ে গিয়েছিলো। লোকেরা সেখানে গেলো। দেখতে পেলো উষ্ট্রী বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু ঐ অবস্থাতেই আছে। সুতরাং এ ঘটনা থেকে একথাই সাব্যস্ত হলো যে, হুজুর পাক (সঃ)

এর নিজস্ব সত্তাগত কোনো এলেম ছিলোনা। ঠিক ততটুকুই ছিলো যতটুকু আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে প্রদান করেছেন। চাই তা নামাজের অবস্থাতেই হোক বা নামাজ বহির্ভূত অবস্থাতেই হোক। এ সত্যটুকুর ব্যাপারে তো কোনোরকম জটিলতার অবকাশ নেই।

হুজুর পাক (সঃ) এর শ্রুতিগত প্রখরতা

হুজুর আকরম (সঃ) এর শ্রবণ-শক্তি সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণনা এসেছে—"আমি ঐ সমস্ত জিনিস দেখতে পাই, যা তোমরা দেখতে পাওনা। আর আমি ঐ সমস্ত ধ্বনি শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাওনা। আমি আকাশের আতইয়াত (উর্ধজগতের এক বিশেষ প্রকারের ধ্বনি) ও শুনতে পাচ্ছি। উটের পালানের (গদির কাঠ) আওয়ায, খালি পাকস্থলীর আওয়ায। (দুঃখ কষ্টে পড়ে উট যে আওয়ায করে বা এজাতীয় অন্যান্য আওয়াযকে আতীতা বলা হয়)। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আকাশও আওয়ায করার উপযোগী। কেননা নভোমন্ডলে অর্ধহাত (বা এক বর্ণনায় আছে চার আঙ্গুল) জায়গাও এরূপ নেই যেখানে ফেরেশতাগণ সেজদা করেনা। এক বর্ণনায় আছে, আকাশের অগণিত ফেরেশতা কেউ সেজদারত আবার কেউ কিয়ামরত অবস্থায় রয়েছে। সীরাতের কিতাবসমূহে নবী করীম (সঃ) এর শ্রবণ-শক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি বর্ণনা এবং তার যথাযথ অবস্থা আলোচনা করা হয় নি। তবে হাঁ 'জামে সগীর' কিতাবে এতটুকু বর্ণনা আছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর শ্রবণক্ষমতা অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিলো।

ললাট মুবারক

হুজুর আকরম (সঃ) এর ললাট মুবারকের তারীফ ও সিফাত বর্ণনা সম্পর্কে সাইয়েদুনা হজরত আলী (কাঃ) বলেছেন, তিনি প্রশস্ত ললাটের অধিকারী ছিলেন। অন্য বর্ণনায় উপরোক্ত কথাগুলোই এসেছে। এক হাদীছে এসেছে واسع الجبين 'ওয়াসিউল জাবীন'। আবার পাওয়া যায় واسع الجبهه 'ওয়াসিউল জাবহাতে'। এসবগুলোর একই অর্থ 'প্রশস্ত ললাট।' চেহারা মুবারকের প্রশংসায় হজরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে, নবী করীম (সঃ) এর পেশানী মুবারকে যখন ভাঁজ পড়তো, তখন মনে হতো যেনো একটুকরো চন্দ্র। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেন, হুজুর (সঃ) এর পেশানী মুবারক থেকে সৌভাগ্য এবং নূরানিয়াত উপচে পড়তো। গোপনলিপির (ভাগ্যের) আধার হচ্ছে

কপাল—উপরোক্ত সত্যটির তাৎপর্য প্রতিফলিত হতো খানায়ে কাবার দরোজায়। যখন তিনি তাঁর কপাল মুবারককে খানায়ে কাবার দরোজায় স্থাপন করতেন এবং ঘষতেন তখন সৌভাগ্য ও খোশনসীবির আলামত সমুজ্জ্বল হয়ে পেশানী মুবারকে ফুটে উঠতো।

পবিত্র ভ্রু যুগল

হুজুর আকরম (সঃ) এর ভ্রূ মুবারকের বর্ণনায় হজরত আলী (কাঃ) বলেন, মহানবী (সঃ) এর পেশানী মুবারক উজ্জ্বল এবং ভ্রুযুগল সম্মিলিত ছিলো। مقرون الحاجبين 'মাকরুনুল হাজেবাইন' এর অর্থ ভ্রু যুগলের পশম পরস্পরে মিলিত থাকা। তবে নবী করীম (সঃ) এর হুলীয়া শরীফ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে অন্যতম সাহাবী হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে ভ্রুযুগল মিলিত নয়। এ দু'খানা বর্ণনার মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বিশুদ্ধ বিবরণ এটাই যে, হুজুর পাক (সঃ) এর ভ্রুযুগল সম্মিলিত ছিলোনা। বাহ্যতঃ এ সম্মিলন খুব ঘন, ভ্রু যুগলের পশম খুব নিবিড়ভাবে মিলিত হয়ে গিয়েছিলো—এমনটি নয়। আবার ভ্রু যুগলের মধ্যবর্তীস্থান এমন খালিও ছিলোনা যাতে ভ্রু দু'খানি পরস্পর আলাদা মনে হয়। বরং মধ্যবর্তীস্থানে হালকা কিছু পশম ছিলো। এমনিভাবে হাদীছদ্বয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়েছে। এব্যাপারে আল্লাহতায়ালা সর্বজ্ঞ।

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এর ভ্রুযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে একটি রগ ছিলো, যা রাগান্বিত অবস্থায় ভেসে উঠতো। তদুপরি হজরত ইবন হালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, লম্বা ধনুক সদৃশ, অধিক চুল এবং টানাটানা ভ্রু। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, টানা টানা ভ্রু ঘন পশমবিশিষ্ট। কামুস ও সেহাহ্ কিতাবে زج 'যজ্জ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে সরু ভ্রু বা লম্বা ভ্রু । যেমন—এজাতীয় ভ্রুকে ফার্সী ভাষায় ধনুকসদৃশ ভ্রু বলা হয়। বায়হাকী শরীফে কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে—আমি রসূল করীম (সঃ) কে দেখেছি তাঁর চেহারা মুবারক খুবই সুন্দর, ললাট মুবারক বড়ো এবং ভ্রু মুবারক সরু ছিলো। ভ্রু মুবারক সরু থাকার মানে হচ্ছে ভ্রুর পশমগুলি খোপাবাঁধা ছিলোনা। ভ্রু মুবারকের পশম অধিক ছিলো। এর অর্থ, পশম কোথাও কম কোথাও খালি—এমনটি ছিলোনা। বিক্ষিপ্তও ছিলোনা। এবড়ো থেবড়োও ছিলোনা।

পবিত্র নাসিকা

হুজুর আকরম (সঃ) এর নাসিকা মুবারক সম্পর্কে اقنى الانف 'আকনালআনফ' ও اقنى العرنين 'আননালইরনীন' এরূপ বর্ণনা এসেছে। عرنين 'ইরনীন' শব্দের অর্থ ভ্রু এর পশমের নীচের মিলিত স্থানের উচ্চতা (অর্থাৎ নাকের উচ্চতা) আবার اقنى 'আকনা' শব্দের ব্যাখ্যা سائل الحاجبين 'সায়েলুলহাজেবাইন' ও হয়ে থাকে—ভ্রু এর নিম্নদেশ ক্রমশঃ প্রবাহিত হয়ে আসা। অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান বা (নাসিকা) লম্বা ও সরু—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যশীল। আবার سيلان 'সায়লান' প্রতিশব্দ دقت 'দিক্‌কত' সরুও হয়ে থাকে। যার ভাবার্থ হচ্ছে নাসিকার স্থূলত্ব রহিত হওয়া।

হুজুর আকরম (সঃ) এর নাসিকা মুবারক এত নূরানী এবং উজ্জ্বল ছিলো যে, কোনো দর্শনকারী ভালোভাবে খেয়াল করে না দেখলে সাধারণত এরকমই দেখতে পেতো যে, তাঁর নাসিকা মুবারক উন্নত। কিন্তু আসলে উন্নত ছিলোনা। বরং নূরের তাজাল্লির কারণে এরকম উঁচু মনে হতো। অধিকন্তু এ দৃশ্যমান উ ্চতার মধ্যে সৌভাগ্য ও নেকবখতীর দ্যুতি পরিস্ফুটিত হতো।

পবিত্র মুখ

হুজুর আকরম (সঃ) এর মুখ মুবারক সম্পর্কে হজরত জাবির (রাঃ) থেকে সহীহ্ মুসলিম শরীফে এরূপ বর্ণনা এসেছে, রসূল (সঃ) প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন। এরকম বর্ণনা শামায়েলে তিরমিজিতে হজরত ইবন আবি হালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছ শরীফে পাওয়া যায়। সে যুগে আরববাসীরা কোনো পুরুষের মখগহ্বর প্রশস্ত হওয়াটাকে প্রশংসার যোগ্য মনে করতো। আর সংকীর্ণ মুখগহ্বর নিন্দাযোগ্য ভাবতো। আর নারীদের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ মুখগহ্বর ছিলো প্রশংসনীয়। তাই আরবের কবিগণ মুখগহ্বরের সংকীর্ণতাকে তাদের প্রেয়সীগণের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যেতো। অন্য হাদীছে ظليع القمر 'যালিউলকামার' শব্দের পর يفتح الكلام ويختمه باشداقه 'ইয়াকতাহুল কালামা ওয়া ইয়াখতিমুহু বিআশদাকিহি' এটুকু বাক্য অতিরিক্ত পাওয়া যায়। অর্থাৎ হুজুর আকরম (সঃ) প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী হতো ভরাট স্বরে আর সমাপ্ত হতো شدق 'শিদক' অবস্থায়। 'শিদক' শব্দটিকে যদি কাসরা

দিয়ে পড়া হয়, তখন তার অর্থ হয়, মুখগহ্বরের সংকীর্ণ অবস্থা। আর 'শাদাক' ফাতহা দিয়ে যদি পড়া হয় তখন তার অর্থ হয় প্রশস্ত মুখগহ্বর।

خطيب اشدق 'খতীবুন আশদ্দাক' বলা হয় প্রশস্ত তালুর অধিকারী বক্তাকে। আবার خطيب مشدق 'খতীবুন মুশদ্দিক' বলা হয় ফাসাহাত বা অলংকারসমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী বক্তাকে। মোটকথা এইযে, নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে যে বাণী নির্গত হতো, তা ছিলো নেহায়েত সম্পন্ন ও ভরাট বাক্যের সমাহার। তিনি কখনো অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিতান্তই স্পষ্টভাষী। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, নবী করীম (সঃ) পরিপূর্ণ ফাসাহাত বা অলংকৃত বাক্যের অধিকারী ছিলেন। তবে এমন বাগাড়ম্বরতা নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় যা কৃত্রিম, বানোয়াট ও নাহক—নবী করীম (সঃ) এর বাণী এ থেকে পবিত্র ছিলো। কোনো কোনো সীরাত বিশেষজ্ঞ 'যালিউলকাম মুফলিজুল আসনান' এর অর্থ করেছেন ঠোঁটের কাছাকাছি হওয়া। অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) এর বাণী সর্বদাই ঠোঁটের কাছাকাছি থাকতো। দ্বিধাদন্দ্বের পরে বিলম্ব করে কিছু বলতে হতো না।

তিনি ছিলেন مفلج الاثنان 'মুফলিজুল আসনান' অর্থাৎ তাঁর দন্ত মুবারক প্রশস্ত ছিলো। সাররাহ্ নামক কিতাবে مفلج 'মুফলিজ' এর অর্থ করা হয়েছে সামনের পাটির দাঁত প্রশস্ত হওয়া। এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম (সঃ) এর সামনের দাঁত উজ্জ্বল, শুভ্র ও প্রশস্ত ছিলো। 'আশনাব' শব্দের অর্থ দাঁতের শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা। হজরত আলী মুর্তযা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) এর সামনের দাঁত উজ্জ্বল ও চকচকে ছিলো। হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) এর ওষ্ঠযুগল প্রশস্ত ছিলো। যখন তিনি কথোপকথন করতেন তখন এরকম দেখা যেতো, যেনো ওষ্ঠযুগলের ফাঁক দিয়ে সামনের দাঁত থেকে নূরের ঝিলিক বেরুচ্ছে। আল্লাহতা'য়ালা নবীপ্রেমিক কবি বুসিরীর উপর রহম করুন। তিনি কতোই না সুন্দরভাবে দন্ত মুবারকের উপমা দিয়েছেন—

كانما اللؤ لؤ المكنون فى صدف
من معدنى منطق منه ومبتسم

কাআন্নামাল্লুলুউল মাকনুনুফী সাদাফিন মিন মাদানাই মানতিকিম মিনহু ওয়া মুবতাসিমি—নবী করীম (সঃ) এর দন্ত মুবারক কথোপকথনের ও মুচকি হাসির সময় দেখলে মনে হতো ঝিনুক পাটি থেকে বেরিয়ে আসা পরিচ্ছন্ন মুক্তা দানা।

ইমাম তিবরানী (রঃ) আওসাৎ নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখগহ্বরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয়তা সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী ছিলো। এক বর্ণনায় আছে, হুজুর পাক (সঃ) এর দন্ত মুবারক বড়ো বড়ো ছিলো। সামগ্রিক বর্ণনার ভিত্তিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সঃ) এর মুখ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পূর্ণ ও যথাযথ ছিলো।

পবিত্র মুখের লালা

রসূলে আকরম (সঃ) এর মুখের লালা রোগীদের জন্য পূর্ণ শেফা ছিলো। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে—খয়বরের যুদ্ধের দিন হজরত আলী মুর্তযা (রাঃ) এর চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিলো, তখন হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় মুখের লালা মুবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী (কাঃ) সুস্থ হয়ে গেলেন। অন্য এক ঘটনা—একদা হুজুর (সঃ) এর কাছে একটি পানির মশক আনা হলো। তিনি সেখান থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করে উক্ত মশকের মধ্যে ফেলে দিলেন। এর পর উক্ত মশকের পানি যখন কূপে ফেলা হলো, তখন পানি থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ ছড়াতে লাগলো। একদা হজরত আনাস (রাঃ) এর কূপের পানিতে হুজুর (সঃ) স্বীয় পবিত্র মুখের লালা মুবারক ফেলে দিলেন। এর পর দেখা গেলো যে মদীনা শরীফের সমস্ত কূপের পানির চেয়ে উক্ত কূপের পানিই অধিক সুস্বাদু। একবার হুজুর (সঃ) এর কাছে কতিপয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনা হলো। তিনি স্বীয় মুখের লালা মুবারক তাদের মুখে দিলেন। অতঃপর শিশুগুলি এতোই পরিতৃপ্ত হলো যে, সারাদিন তারা আর দুধই পান করলো না। ইমাম হাসান (রাঃ) একদা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় জিহবা মুবারক তাঁর মুখের ভিতর পুরে দিলেন। প্রিয় দৌহিত্র নানাজানের জিহবা মুবারক চুষতে লাগলেন। সমস্ত দিন তিনি আর ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করলেন না। এ ধরনের অসংখ্য মোজেযা রয়েছে।

পবিত্র হাসি

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হজরতে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সঃ) কে কখনও এরকম জোরে অট্টহাসি করতে দেখেন নি—যাতে মুখের লাহাওয়াত দৃষ্টিগোচর হয়। লাহাওয়াত শব্দটি 'লাহাওয়া' এর বহুবচন। কণ্ঠনালীর শেষ প্রান্তে উপরের তালু সংলগ্ন গোশতের টুকরাকে লাহওয়াত বলা হয়। (বাংলায় যাকে বলে, আলা জিহবা)।

হুজুর আকরম (সঃ) এর ওষ্ঠাধরে সর্বদাই মৃদু হাসি লেগে থাকতো। কোনো কোনো হাদীছে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি এতো বেশী হাসতেন না যাতে নাওয়াজেয দাঁত দৃষ্টিগোচর হয়। 'নাওয়াজেয' চোয়ালের শেষ প্রান্তের দাঁতকে বলা হয়। পূর্ণ বয়সী হওয়ার পর যে দাঁত উঠে থাকে মানুষেরা সাধারণতঃ তাকে আক্কেল দাঁত বলে থাকে। হাসির এরূপ বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে হয়। প্রকৃত অবস্থা এরূপ নয়। উপরের বর্ণনা আসলে কোনো ব্যক্তির অত্যধিক হাসাহাসি করার একটা উদাহরণ মাত্র। এ অবস্থা রসূল (সঃ) এর ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিপন্থী। উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে আবার কেউ এরূপ সমাধান দিয়েছেন যে, নাওয়াজেয বলতে আক্কেল দাঁত বুঝানো হয় নি বরং সমস্ত দাঁতকেই বোঝানো হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) এর হাসি—মৃদু হাসিই ছিলো। আওয়াজবিহীন বড়ো হাসিকে যেহেক বলা হয়। আর যেহেকের প্রাথমিক অবস্থা মুচকি হাসি। এতে খুশির প্রাবল্য যদি বেশী থাকে তবে কখনও কখনও দু'একটি দাঁত প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় যদি আওয়ায বিদ্যমান থাকে তবে তাকে বলা হয় কাহ্‌কাহা বা অট্টহাসি। নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসলে তাকে বলে যেহেক। আর যদি একেবারেই শব্দ না থাকে এবং দাঁত বের না হয় তবে সে হাসিকে 'তাবাস্‌সুম' বা মৃদু হাসি বলে। সাররাহ্ নামক কিতাবে আছে, ওষ্ঠদ্বয় মিলিত থাকা অবস্থায় যে হাসি হয় তাকে তাবাস্‌সুম বলে। তবে তাবাস্‌সুম বা মুচকি হাসির এ সংজ্ঞাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—যে নিঃশব্দ হাসিতে দাঁতের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়।

হজরত শায়েখ ইবন হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, নবীকরীম (সঃ) এর বিশেষ থেকে বিশেষতর অবস্থার অধিকাংশ হাসি তাবাস্‌সুম বা মুচকি হাসি ছিলো। তবে এটা হতে পারে যে কখনও কখনও তিনি যেহেক হাসি হেসেছেন। কিন্তু তাই বলে যেহেকের সীমা অতিক্রম করেন নি। আর কাহ্‌কাহা বা অট্টহাসির তো প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ অট্টহাসি মাকরূহ্। অধিক হাসাহাসি করলে বা যেহেক হাসির উপর অতিরঞ্জিত করলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে আকরম (সঃ) যখন হাসতেন তখন পার্শ্ববর্তী দেয়াল আলোকিত হয়ে যেতো এবং তাঁর পবিত্র দাঁতের নূরে দেয়ালে সূর্যরশ্মির ন্যায় ঝিলিক মারতো। তিনি যখন ক্রন্দন করতেন তখনও এরূপ অবস্থা হতো। ক্রন্দনের সময় আওয়াজ উচ্চ হতো না। পবিত্র চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতো। তামার ডেগের ভিতর ফুটন্ত পানির শব্দের মতো পবিত্র বক্ষাভ্যন্তর থেকে

এক ধরনের বিশেষ শব্দ শোনা যেতো। কোনো কোনো বর্ণনায় তাকে চাকা ঘূর্ণনের আওয়াযের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর এরকম ক্রন্দন কখনও নিজের দুঃখযাতনার জন্য হতো না। তিনি কাঁদতেন আল্লাহ্তায়ালার জালালী সিফাতের তাজাল্লীর কারণে, উম্মতে মরহুমার প্রতি অপার স্নেহ মমতা বা কোনো মাইয়্যেতের উপর আল্লাহ্তায়ালার দরবারে রহমত যাঞ্চা করার জন্য। তিনি যখন তন্ময় হয়ে আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করতেন অথবা কোনো কোনো সময় রাত্রে নামাজ আদায় করতেন তখন এমন করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতো। তিনি কখনও হাই তুলতেন না। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এ কাজটি থেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। হাই তোলা দৈহিক ও আঙ্গিক অবসন্নতার বহিঃপ্রকাশ। হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যক্তিত্বে এরকম অবস্থা আদৌ ছিলোনা। তারিখে বুখারী ও হজরত ইবনে আবী শায়বা (রাঃ) এর তসনীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম (সঃ) কখনও হাই তোলেন নি। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এরকমও আছে, কোনো নবীই কখনও হাই তোলেন নি। এক হাদীছে এরকম উল্লেখ আছে, হাই শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। কারও যদি হাই প্রবল হয়ে যায় তাহলে বাম হাতের পিঠ মুখের উপর স্থাপন করতে হবে অথবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরতে হবে। হাই তোলার সময় হা-হা অথবা আহ্ আহ্ শব্দ মুখ থেকে বের করা নেহায়েত মন্দ কাজ। এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হাই তুলে আওয়ায বের করে, শয়তান তার মুখের ভিতর থেকে হাসাহাসি করতে থাকে।

পবিত্র কণ্ঠস্বর

হুজুর আকরম (সঃ) এর কণ্ঠস্বর ছিলো সীমাহীন প্রেমে ভরা। তাঁর পবিত্র মুখনিসৃত ধ্বনি ও তার মাধুর্য অন্য সকল আওয়াযের চেয়ে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিলো। তাঁর চেয়ে সুন্দর আওয়ায ও মিষ্টি কথার কোনো মানুষ পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর কালাম মুবারকের প্রশংসায় এরূপ বর্ণনা এসেছে اصدق الناس لجة 'আসদাকুন্নাছে লুজজাতান'। কেননা তাঁর রসনা মোবারক মাখরাজ থেকে শব্দ বের করে এনে যথাযথ উচ্চারণ করতে যেমন সক্ষম ছিলো, তেমনি ছিলো তাঁর বাক্যে সঠিকতা, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আজ পর্যন্ত কেউই উক্ত গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হননি।

সাইয়েদুনা হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্তায়ালা এমন কোনো নবীকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নি যাঁর কণ্ঠস্বর ও বাক্যাবলী সুন্দর ছিলোনা। আর উক্ত গুণাবলীর দিক দিয়ে আমাদের নবী (সঃ) ছিলেন সর্বাগ্রে। এমর্মে কোনো কবি এরকম বলেছেন

দর দেলেহ্‌ার উম্মতি তার হক নারাস্ত
রুয়ে যাওয়াজ পয়গম্বর মুজেযাস্ত

অন্য কোনো মানুষের কণ্ঠ যেখানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হতো সেখানে হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র যবানের ধ্বনি বিনা বাঁধায় পৌঁছে যেতো। বিশেষ করে নসীহ্‌ত, ভয় প্রদর্শন বা খওফে খোদা সম্বলিত বক্তৃতায়। সুতরাং পর্দার অন্তরালে নারী সমাজও সে আওয়ায শুনতে পেতো। পবিত্র হ্‌জ সম্পাদনকালে মিনা প্রান্তরে তিনি যে খোৎবা প্রদান করেছিলেন, সে খোৎবা সমস্ত লোকের কর্ণকুহরে পৌঁছে গিয়েছিলো।। দূরের ও কাছের সবাই আপন আপন অবস্থানে থেকেই সে খোৎবা শুনতে পেয়েছিলেন।

যে হাদীছে এরূপ বর্ণনা এসেছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) মিনার প্রান্তরে খোৎবা দিচ্ছিলেন। আর হ্‌জরত আলী (রাঃ) হুজুর (সঃ) এর আগে আগে যেয়ে তার ব্যাখ্যা করছিলেন। সে হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে, হুজুর (সঃ) এর বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়া। হুজুর (সঃ) এর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ছিলো বলে তিনি উচ্চ আওয়াযে তা শুনিয়ে দিয়েছেন—এমনটি নয়।

পবিত্র অলংকারপূর্ণ বাণী

হুজুর আকরম (সঃ) এর যবান মোবারক থেকে নির্গত ভাষার অলংকার, গভীর ভাবসম্পন্ন বাক্য, আশ্চর্য ধরণের প্রকাশ ভঙ্গিমা, বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম বিষয়ের নির্দশন ও সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে এত বিপুল ছিলো যে, কেউ এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর আশ পাশেও ঘেঁষতে সক্ষম নয়। তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা এবং তাঁর বাচনভঙ্গি যে কিরূপ ছিলো তার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর চেয়ে অধিক মিষ্টভাষী ও অলংকারগুণসম্পন্ন আর কাউকেই সৃষ্টি করেননি।

একদা হ্‌জরত ওমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌। আপনিতো কখনও বাইরেও তশরিফ নিয়ে যাননি বা মানুষের সঙ্গে তেমন উঠাবসা করেননি। তা সত্বেও এরূপ অলংকৃত ভাষাগুণ আপনি কোথেকে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্‌জরত ইসমাইল (আঃ) এর ভাষা ও পরিভাষা যা বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিলো সেগুলি হ্‌জরত জিব্রাইল (আঃ) আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন আর আমি সেগুলি রপ্ত করে নিয়েছি। তদুপরি তিনি বলেছেন, আমার রব আমাকে আদব শিখিয়েছেন, সুতরাং আমার আদব সুন্দর। আরবী ভাষায় ঐ এলেমকে আদব বলা হয় যা ফাসাহাত (অলংকরণ) ও বালাগাত (অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ বা হৃদয়স্পর্শী বাক্য) এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালন হয়েছে বনী সাআদ ইবন বকর গোত্রে। আর এ গোত্রটি ছিলো তাঁর ধাত্রীমাতা হজরত হালীমা সাদীয়া (রাঃ) এর গোত্র। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্ত আরবে অলংকৃত ভাষার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আরবী বর্ণকে তার মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকে উচ্চারণকারীদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ আমার মতো সঠিক উচ্চারণ আর কেউ করতে পারে না। এই হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যদিও কেউ কেউ আপন আপন নির্ধারিত পরিভাষার পরিমাপে নানারূপ মন্তব্য করেছেন। তথাপি এর অর্থ বিশুদ্ধ—এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীছের ভাবার্থ এদিকেই ধাবিত হয় যে, তিনি সমস্ত আরবে সর্বাধিক ভাষালংকার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ض 'দোয়াদ' বর্ণটি কেবল আরবী ভাষায়ই পাওয়া যায়। দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষাতে এর প্রতিবর্ণায়ন পাওয়া যায় না। হুজুর আকরম (সঃ) ছাড়া সারা আরবে এমন কেউ ছিলোনা যে উক্ত বর্ণটিকে যথাযথ উচ্চারণ করতে পারেন। এ বর্ণটির উচ্চারণস্থল ডান বা বাম পার্শ্বের চোয়ালের দাঁত। তবে এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, বাম পার্শ্বের চোয়ালের দাঁত থেকে উচ্চারণ করাটা অধিকতর সহজ। অবশ্য সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ দু' পার্শ্ব থেকেই উচ্চারণ করতেন।

হুজুর আকরম (সঃ) নেহায়েত পরিষ্কার এবং বিস্তারিতভাবে কথা বলতেন। এমন পরিষ্কার করে বলতেন যে, প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে গণনা করা সম্ভব হতো। তিনি এক একটি শব্দ প্রয়োজনে তিন তিন বার করে উল্লেখ করতেন। যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। কথোপকথনকালে কখনও সন্দেহ বা দুর্বোধ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তিনি এরূপ করতেন। নতুবা সকল কথার ক্ষেত্রে এমনটি হতোনা।

পবিত্র সমষ্টিভূত বাক্য

খতেমুল আম্বিয়া আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর পবিত্র বাক্যাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি স্বয়ং এরশাদ ফরমান, আমাকে জামে কালামের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে এবং আমার জন্য কালামকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। জামে কালাম এর অর্থ হচ্ছে, এমন শব্দসম্বলিত বাক্য যা সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত অথচ অধিক অর্থবাহী। উলামায়ে কেরাম আপন আপন শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে হুজুর পাক (সঃ) এর এ জাতীয় কিছু বাণী সংগ্রহ

করেছেন। বিশেষ করে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাদশাহ্, শাসক বা বড়ো বড়ো আমীরগণের নিকট যে সব চিঠিপত্র প্রদান করেছেন—উলামায়ে কেরাম এগুলিকে সংকলন করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় জামে কালাম হুজুর পাক (সঃ) এর অবয়বিক পূর্ণতা ও সৌন্দর্য রূপায়ণের অন্তর্ভূত। মনে করা হয়, এসমস্ত বাণী হুজুর পাক (সঃ) এর যবান মোবারক থেকেই নিঃসৃত।

প্রথম হাদীছ

১. নিশ্চয়ই আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর।— এই হাদীছখানা দ্বীনের ভিত্তিসমূহের ভিতর এক সুমহান ভিত্তি। হাদীছ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে জামে বা পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধিক ফলদায়ক। কোনো কোনো মহৎ ব্যক্তিতো এ হাদীছকে দ্বীনী এলেমের এক তৃতীয়াংশ বলে থাকেন। যেহেতু দ্বীনের মূল অংশ হচ্ছে তিনটি—কথা, কাজ ও নিয়ত। আবার কেউ কেউ একে এলেমে দ্বীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু আমল দু' প্রকার। প্রথম কলব বা অন্তর্জগতের আমল। দ্বিতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল। কলবী আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। এর ভিত্তিতেই এ আমলকে অর্থাৎ নিয়তকে এলমে দ্বীনের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। এমনকি দু অংশের মধ্যে এই অর্ধাংশটিই হচ্ছে অধিকতর ব্যাপক। মূলতঃ নিয়তই কলবী আমল ও শারীরিক আমল এবং সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়তকে যদি সম্পূর্ণ এলেম বলা হয় তবুও অত্যুক্তি হবে না।

২. সুন্দর ইসলাম হচ্ছে বেহুদা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই উত্তম রূপে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে যাবতীয় অতিরিক্ত কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে দূরে সরে থাকবে।

৩. পরিপূর্ণ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমানেরা নিরাপদ।

৪. কোনো ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত মুমেন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার অপর ভাইদের জন্য তাই পছন্দ করবে।

৫. দ্বীন মানে পরিপূর্ণ কল্যাণকামনা।

৬. অপবাক্যের সাথে মুছিবত জড়িত।

৭. মজলিশ বা সংস্থাসমূহ আমানতদারীর উপরে নির্ভরশীল।

৮. যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, সে উক্ত কথার আমানতদার।

৯. মন্দ পরিহার করা একপ্রকারের সদ্‌কা।

১০. লজ্জাশীলতা পরিপূর্ণ কল্যাণ।

১১. এলেমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে শ্রেয়।

১২. সুস্থতা ও শ্রমবিমুখতা দু'টি ক্ষতিকর নেয়ামত। অধিকাংশ লোক এই দুই অবস্থায় অবস্থিত।

১৩. যে ব্যক্তি মালে ভেজাল মিশ্রিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৪. কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী কল্যাণকারীর ন্যায়।

১৫. কোনো বস্তুর মহব্বত তাকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়।

১৬. যে যাকে মহব্বত করে সে তার সঙ্গে।

১৭. তোমার পরিবার পরিজনের উপর থেকে শাসনের দন্ড উঠিয়ে নিওনা।

১৮. তোমাদের নিকট ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের জন্য উত্তম।

১৯. আমলের ক্ষেত্রে যে অলস, বংশ মর্যাদার মাধ্যমে সে ব্যক্তিগত সম্পন্ন হতে পারে না।

২০. সাক্ষাৎ করো বিরতির সাথে, (আখেরাতের) পণ্য সংগ্রহ করো মহব্বতের সাথে।

২১. নিশ্চিন্ততার প্রশস্ততা থেকে দূরে থাকো।

২২. মনে প্রাণে না চাইলে কারও উপর দ্বীন প্রবল হয় না।

২৩. ঐ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজকে দ্বীনদার বানায় এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।

২৪. অনাচারী ঐ ব্যক্তি, যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহ্তায়ালার রহমতও কামনা করে।

২৫. ঐ ব্যক্তি শক্তিমান নয় যে মানুষের উপর প্রাবল্য লাভ করে, বরং যে স্বীয় প্রবৃত্তির উপর প্রাবল্য লাভ করে সেই প্রকৃত শক্তিমান।

২৬. প্রশংসা করা মুমেন ব্যক্তির বসন্ত সদৃশ।

২৭. অল্পে তুষ্ট থাকা এমন এক ধনভান্ডার যা কখনও বিলুপ্ত হয় না।

২৮. খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অর্ধেক জীবন।

২৯. মানুষের প্রতি ভালোবাসা রাখা বুদ্ধিমত্তার অর্ধেক।

৩০. সুন্দর প্রশ্ন করা এলেমের অর্ধেক।

৩১. তদবীরের ন্যায় কোনো এলেম নেই।

৩২. জিহ্বাকে সংযত রাখার মতো কোনো পরহেজগারী নেই।

৩৩. সৎ চরিত্রের ন্যায় কোনো মহব্বত নেই।

৩৪. রেজাআত (দুগ্ধপান) স্বভাববহির্ভূত কাজ।

৩৫. ইমানই নিরাপত্তা।

৩৬. যে ব্যক্তি আমানতদার নয় সে ইমানদার নয়।

৩৭. যে অঙ্গীকার রক্ষা করেনা সে দ্বীনদার নয়।

৩৮. মানুষের সৌন্দর্য তার ভাষার অলংকারে।

৩৯. মূর্খতার চেয়ে কঠিন কোনো অভাব নেই।

৪০. বুদ্ধিমত্তার চেয়ে প্রিয় কোনো ধন নেই।

৪১. এলেমকে এলেমের প্রতি সম্মিলন করার চেয়ে সুন্দর কোনো সম্মিলন নেই।

৪২. দুনিয়াতে সঙ্গীহীন বা মোসাফিরের মতো থাকো এবং নিজকে কবরের বাসিন্দা মনে করো।

৪৩. ক্ষমাগুণ বান্দার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে থাকে।

৪৪. বিনয় বান্দার সম্মানকে বৃদ্ধি করে।

৪৫. দান করলে মালের ঘাটতি হয় না।

৪৬. নেকীর ভাণ্ডার মুসিবত গোপন করার মধ্যে।

৪৭. আপন ভাইয়ের নিন্দনীয় কাজকে প্রকাশ করোনা। এরূপ করলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে শাস্তি দিবেন অথবা ঐকাজে লিপ্ত করিয়ে দিবেন।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ প্রত্যেকটিই বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম এবং দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণে পরিপূর্ণ। এসমস্ত কথামালা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এ ধরনের বাক্য আরও অসংখ্য ও অগণিত রয়েছে। কার্যত এ সময় যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা হলো। এসকল বাক্যের প্রত্যেকটি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তবে দফতরকে দফতর পূর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু লেখা শেষ হবেনা।

الدين النصيحة كله 'আদ্দীনুন্নাসিহাতু কুল্লুহু' 'দ্বীন মানে পরিপূর্ণ কল্যাণ কামনা' হাদীছখানা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের সকল এলেমের আধার। দুনিয়ার আলেম সম্প্রদায় সকলে যদি এই হাদীছের ব্যাখ্যা করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান তবুও এর একাংশ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কেননা তাঁরা যা কিছুই আলোচনা করবেন তা তাঁদের জ্ঞান ও ধারণার পরিমন্ডল অনুপাতে করবেন। কিন্তু এ বাণীর স্থান আরও উর্দ্ধে।

মস্তক মোবারক

হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র মস্তক প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আবী হালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) এর মাথা মোবারক বড়ো ছিলো। মাথা বড়ো হওয়া মস্তিষ্কের সম্মান, আকলের পরিপূর্ণতা এবং চিন্তার উদারতার প্রমান। মগজের ধারক হচ্ছে মাথা। এক্ষেত্রে মাথাকে বড়ো বলার

উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি না হওয়া। বড়ো হওয়া মানে আস্বাভাবিক বড়ো হওয়া নয়। তাঁর দেহের অন্যান্য অঙ্গের সাথে মাথা সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক ছিলো। যেমন অন্যান্য অঙ্গ সম্পর্কে স্বাভাবিকতার কথা বলা হয়েছে। তাঁর অঙ্গ সম্পর্কিত বর্ণনার ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মকেই স্মরণ রাখতে হবে।

পবিত্র কেশরাজি

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি হজরত আনাছ (রাঃ) কে রসূলুল্লাহ্, (সঃ) এর পবিত্র কেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, হুজুর পাক (সঃ) এর মাথার চুল رجل রাজিল জাতীয় ছিলো। রাজিল শব্দটি را 'র'এর মধ্যে যবর ও جيم 'জীম'এর মধ্যে যের দিয়ে পড়তে হবে। তার অর্থ হচ্ছে নরোম বা মোলায়েম। চুল মোবারক সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনায় سبط 'সাবত' (যবরও ب 'বা' সাকিন যোগে) শব্দও এসেছে। যার অর্থ নরোম ও ঝুলন্ত চুল। আবার قطط 'কাতিত'(কাফ-এ যবর ও তা এ যের যোগে) শব্দও পাওয়া যায়। যার অর্থ শক্ত ও পেঁচানো চুল। হাবশীদের চুলের ন্যায়। এদেশে যাকে থোকা চুল বা কোঁকড়ানো চুল বলা হয়। চুলের বর্ণনায় আবার কোনো কোনো হাদীছে جعد 'জাআদ' শব্দও পাওয়া যায়। যার অর্থ শক্ত ও পেঁচানো চুল। আসলে পুরাপুরি জাআদ জাতীয় চুল ছিলো না বরং তাঁর চুল মোবারক ছিলো নরোম, লম্বা ও থোকা বাঁধা। سبط قطط 'সাবত' ও 'কাতিত' শব্দদ্বয়ের মুকাবিলায় জাআদ শব্দের ব্যবহার জায়েয হয় না। আবার কোনো কোনো হাদীছে জাআদ রহিত করা হয়েছে। কেননা জাআদ কঠিন ও কুঁকড়ানো চুলকে বলা হয়। হুজুর আকরম (সঃ) এর চুল সাবত জাতীয় ছিলো। কাতিত জাতীয় নয়। বরং দু'এর মাঝামাঝি চুল ছিলো। যাকে رجل 'রাজিল' বা নরোম মোলায়েম চুল বলা হয়। তাঁর মাথার চুল কানের মধ্যখান পর্যন্ত লম্বা ছিলো। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় কান পর্যন্ত—অন্য আরেক বর্ণনানুসারে দু'কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিলো। তাছাড়া কাঁধ পর্যন্ত বা প্রায় কাঁধ পর্যন্ত—এরূপ বর্ণনাও আছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্যের বিধান হচ্ছে এই যে—হুজুর পাক (সঃ) কখনও কখনও চুলে তেল ব্যবহার করতেন বা চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াতেন, তখন চুল লম্বা হয়ে যেতো। আর অন্য সময় তার বিপরীত থাকতো। অথবা চুল যখন লম্বা হয়ে যেতো তখন কাঁধ পর্যন্ত থাকতো আবার যখন চুল ছোটো করে ফেলতেন তখন খাটো হয়ে যেতো।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে আছে, হুজুর (সঃ) যখন দীর্ঘদিন ধরে চুল ছাঁটতেন না, তখন চুল লম্বা হয়ে যেতো। আবার যখন ছেঁটে ফেলতেন তখন চুল ছোটো হয়ে যেতো। মাজমাউল বিহার কিতাবেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা দ্বারা আরেকটি ব্যাপারে জানা গেলো যে, হুজুর (সঃ) স্বীয় চুল কর্তন করতেন। মস্তক মুণ্ডন করতেন না। আর মস্তক মুন্ডন করার ব্যাপারে তিনি স্বয়ং এরশাদ করেছেন যে, তিনি হজ ও ওমরা ব্যতীত মস্তক মুন্ডন করতেন না। আল্লাহতায়ালাই এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

হজরত উম্মেহানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরম (সঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুয়ায্যামায় তশরীফ আনলেন তখন তাঁর মাথা মুবারকে চুলের চার খানা খোটোন ছিলো। মাথার চুল লম্বা রাখা সুন্নত। তবে উপরোক্ত প্রচলন বহু প্রাচীন কাল থেকেই আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তবে এক্ষেত্রে চুলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তেল ও চিরুনী ব্যবহারের মাধ্যমে চুলের প্রতি যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। হুজুর আকরম (সঃ) স্বীয় কেশরাজিতে অধিক চিরুনী ব্যবহার করতেন। কারও মাথার চুল আলু থালু ও অবিন্যস্ত দেখলে তিনি তা পছন্দ করতেন না। তাকে লক্ষ্য করে এরূপ বলতেন 'তুমি কি কখনও তাকে (শয়তানকে) দেখেছো?' তদ্রূপ তিনি অতিমাত্রায় পরিপাটি করা লম্বা চুলও অপছন্দ করতেন। ভারসাম্যকৃত মধ্যম প্রকারের চুলকেই বেশী পছন্দ করতেন। চুলে তেল চিরুনী ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তির জন্য খাটো করে চুল রাখাই উত্তম।

আমীরুল মু'মেনীন হজরত আলী (কাঃ) বলতেন, আমি মাথার চুলকে ঐ সময় থেকে দুশমন মনে করতাম যেদিন থেকে রসূল পাক (সঃ) কে একথা বলতে শুনেছি, প্রত্যেক চুলের ফাঁকেই নাপাকী থাকে। পরবর্তী সময়ের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ করে মাশায়েখ, দরবেশ ও আবেদ বান্দাগণের ভিতর চুল খাটো করে রাখার যে রীতি—তার কারণ সম্ভবত এটাই। তাঁরা চুলে তেল চিরুনী ব্যবহার করতে অক্ষম ছিলেন অথবা একাজের জন্য তাঁদের ফুরসতই মিলত না।

ফায়দা

চুল রাখার ব্যাপারে সুন্নত তরীকা ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। সাইয়েদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) চুলে 'সদল' (স্বাভাবিকভাবে চুলকে ছেড়ে দেয়া) করতেন। আহলে কিতাবরাও চুলে সদল করতো। মুশরেকরা কিন্তু চুলে ফরক (সিঁথি) করতো। সদলের অর্থ হচ্ছে চুলকে কপালের দিক থেকে নিয়ে

স্বাভাবিকভাবে পিছনের দিকে ছেড়ে দেয়া। আর ফরকের অর্থ হচ্ছে চুল সমূহকে পরস্পরে পৃথক করে এমন ভাবে মাথা আচঁড়ানো যাতে মধ্যবর্তী স্থানে সিঁথি তৈরী হয়ে যায়। হুজুর পাক (সঃ) যে চুলে সদল করতেন তার কারণ হচ্ছে, যেসমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে স্পষ্ট কোনো বিধান তখনো আসে নাই, সেসমস্ত ব্যাপারে তিনি আহ্লে কিতাবদের আনুরূপ্য পছন্দ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি চুলে সিঁথি করতে শুরু করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরাম বলেন, চুলে সিঁথি করা সুন্নত। কেননা হুজুর (সঃ) সদল পরিহার করে পরবর্তীতে ফরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে তাঁকে এরকমই হুকুম দেয়া হয়েছিলো। কাজেই সদল করার নিয়মটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আবার এ-ও হতে পারে যে, ফ্রক করার নিয়মটি হুজুর (সঃ) এর এজতেহাদের ভিত্তিতে ছিলো। কারণ, ফরক করায় আহ্লে কিতাবদের বিরোধিতা করা হয়। আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে আদেশ করা হয় নি এমন কাজের ব্যাপারে তিনি আহ্লে কিতাবদের অনুরূপ ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁকে আহ্লে কিতাবদের থেকে অমুখাপেক্ষীতা দান করলেন তখন তাদের আনুরূপ্যকেও বর্জন করলেন। মোট্ কথা হচ্ছে, সদল এবং ফরক উভয়ই জায়েয। তবে ফরক করাটা অধিকতর পছন্দনীয় এবং উত্তম। আলেমগণ এরূপ মত পোষণ করেন। তবে অধিকতর উত্তম মতটি হলো, চুল আচঁড়ানোর সময় যদি এমনিই সিঁথি বেরিয়ে আসে তবে সিঁথি করে নিবে। নতুবা চুলকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে।

খেযাব সম্পর্কিত মাসআলার আলোচনা

দাড়ি বা চুলে খেযাব (কলপ) ব্যবহার করা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে বিশেষ করে মুহাদ্দিছগণের মতে এটা মাকরুহ্। কেননা, হুজুর পাক (সঃ) এতো বার্ধক্যে উপনীত হননি যাতে খেযাব ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। ইনতিকালের সময় তাঁর কেশরাজিতে এবং দাড়ি মুবারকে সতের বা আঠারখানা চুল সাদা হয়েছিলো। তাও আবার যখন তিনি চুলে তেল ব্যবহার করে আঁচড়াতেন তখন সেগুলি ঢাকা পড়ে যেতো। হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মাথা ও দাড়ি মুবারকে মাত্র গুটিকতেক চুল সাদা হয়েছিলো, আমি ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারতাম। তিনি আরও বলেন, হুজুর পাক (সঃ) খেযাব ব্যবহার করেননি। হুজুর পাক (সঃ) এর ঝরে পড়া চুল মোবারক যা হজরত

আনাস (রাঃ) এর নিকট রক্ষিত ছিলো, তা খেযাবকৃত ছিলো বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, চুলগুলি আসলে খেযাবকৃত ছিলোনা। বরং কোনোপ্রকারের খুশবু দিয়ে সেগুলিকে সুগন্ধিযুক্ত করা হয়েছিলো। বাহ্যিকভাবে দেখা যেতো, যেনো খেযাব লাগানো হয়েছে। অথবা এও হতে পারে যে, পরবর্তীতে হজরত আনাস (রাঃ) সে কেশ মোবারকগুলি খেযাব করে রেখে দিয়েছিলেন। হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের বেলায়ও উক্ত সমাধানটি প্রযোজ্য। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে হজরত ইবন ওমর (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হুজুর পাক (সঃ) কে জরদ রঙ ব্যবহার করা অবস্থায় দেখেছেন। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, জরদ রঙ বলতে এখানে যাফরানকে বুঝানো হয়েছে যা সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করতেন। (লেখক বলেন) আমি হজরত শায়েখ আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাফী (রঃ) থেকে এরূপ শুনেছি যে, উক্ত জরদ রঙটি খেযাব ছিলো না। কেননা হুজুর পাক (সঃ) এর কেশরাজীতো কৃষ্ণবর্ণই ছিলো। আর চুলের কৃষ্ণতা তো অন্য কোনো রঙকে ধারণ করেনা। কাজেই তিনি যে জরদ বর্ণ ব্যবহার করেছেন তা ছিলো যাফরান, যা দিয়ে চুলকে অধিক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করাই উদ্দেশ্য ছিলো। অর্থাৎ তিনি যাফরান দিয়ে চুল ধৌত করে পরিষ্কার করেছেন। তবে যে কখানা দাড়ি সাদা ছিলো তা অবশ্যই কৃষ্ণ বর্ণকে ধারণ করে নিয়েছে আর হুজুর পাক (সঃ) খেযাব ব্যবহার বার্ধক্য কালে করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আর তিনি (আবদুল ওয়াহাব মুত্তাফী) ইমাম নববী থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর পাক (সঃ) কখনও কখনও খেযাব ব্যবহার করতেন। তবে অধিকাংশ সময়ই চুল বা দাড়িকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। কাজেই বর্ণনাকারীগণ তাঁকে যখন যে অবস্থায় দেখেছেন সেরূপই বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের বর্ণনাই সঠিক। তিনি আরও বলেছেন যে, এর ভাবার্থ নির্দিষ্ট। কেননা ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীছ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উক্ত হয়েছে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তার কোনো রূপক ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। যে কালে রমণীগণ তাদের অধিকাংশ চুল সাদা হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করে হুজুর পাক (সঃ) এর বয়স ঐ সীমা পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম এরূপ বলে থাকেন, কেউ যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর কোনোকিছুকে অপছন্দ করে সে কাফের।

হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বার্ধক্যের নিন্দাবাদ করেছেন। তিনি এরূপ বলেছেন আল্লাহতায়ালা হুজুর পাক (সঃ)

কে বার্ধক্য প্রদান করেননি। উলামায়ে কেরাম হজরত আনাস (রাঃ) এর এই বর্ণনা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, হাদীছ শরীফে বর্ণনা এসেছে, "বার্ধক্য সম্মান ও নূরের প্রতীক।" বার্ধক্যের প্রশংসা স্বয়ং নবীজীর যবান মোবারক থেকেই পাওয়া যায়। এসম্পর্কে উলামা কেরাম বলেন হজরত আনাস (রাঃ) হুজুর পাক (সঃ) এর খেযাব ব্যবহারের ফলে তাঁর বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তনে আধিক্য অবলোকন করলেন। হজরত আবু বকর (রাঃ) এর পিতা হজরত আবু কুহাফা (রাঃ) এর মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গেলে রসূল (সঃ) তা দেখে অপছন্দ করলেন এবং বললেন, বার্ধক্যকে যৌবনে রূপান্তরিত করে নাও অর্থাৎ চুলগুলোকে কালো বানিয়ে নাও। হজরত আনাস (রাঃ) যখন বার্ধক্যকে অপছন্দ করা হয়েছে বলে জানালেন, তখন সম্ভবত তিনি এ সম্পর্কিত ভিন্ন মতের হাদীছ আর শ্রবণ করেননি অথবা এধারণাও করে থাকতে পারেন, ঐ হাদীছ এ হাদীছ দ্বারা মনসুখ হয়ে গিয়েছে। আর তাই, এর উপরই হুকুম আরোপ করেছেন। এরূপ উক্তি রয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে।

হজরত শায়েখ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুজুর আকরম (সঃ) শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে পুরাপুরি যৌবন, শক্তি, ক্ষমতা ও আতঙ্কের অধিকারী ছিলেন। কেননা দ্বীনের দৃঢ়তা অর্জনের জন্য এবং ইসলামের শান শওকত প্রকাশ করণার্থে উক্ত গুণাবলীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে নবুওয়াতের যামানায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহতায়ালা হুজুর পাক (সঃ) কে বার্ধক্য থেকে সংরক্ষিত করেছেন। কেননা বার্ধক্য হচ্ছে দুর্বলতা ও অক্ষমতার নিদর্শন। আর হুজুর পাক (সঃ) যে সাহাবাগণকে খেযাব ব্যবহার করে নওজোয়ানদের সাথে সাদৃশ্য রাখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, তার কারণও এটাই ছিলো। নবী করীম (সঃ) এর জীবনে বার্ধক্যের আবির্ভাব ও বহিঃপ্রকাশ যা ঘটেছিলো তা মূলতঃ কয়েকখানা চুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আর এ-ও হয়েছিলো খওফে খোদা ও খাশিয়াতে ইলাহীর কারণে।

এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং এরশাদ করেছেন, হুদ, আলওয়াকিয়াহ, আলমুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন ও ইযাশ্শামসু কুইয়িরাত সূরা সমূহ আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আর তাঁর বার্ধক্য আবার এমনও ছিলো না যে, যৌবনের আকৃতিতে ত্রুটির সৃষ্টি করে। বরং যৌবনের লাবণ্যের সাথে সাথে বার্ধক্যের মর্যাদা ও নূরও বিদ্যমান ছিলো। যেমন হজরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) ও তদীয় পুত্র হজরত ইসহাক (আঃ) এর মধ্যে বয়সের

পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ্তায়ালা পিতার চুলে শুভ্রতা এনে দিলেন। এ দেখে তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক এটা কি? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, এটা হচ্ছে মর্যাদার প্রতীক। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু আমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দাও।

পবিত্র শ্মশ্রু

হুজুর আকরম (সঃ) এর শ্মশ্রু মুবারক এর চুল সম্পর্কে হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) বর্ণনা করেন; হুজুর আকরম (সঃ) এর দাড়ি মুবারকের চুল খুব অধিক ছিলো। অভিধানে كث 'কিছছুন' শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঘন। হালকার বিপরীত। আরবী ভাষায় এরূপ বলা হয় رجل كث اللحية 'রাজুলুন কিছছুল লেহ্ইয়াতে'—লোকটি ঘন দাড়িওয়ালা। কাযী আয়ায (রঃ) তাঁর শিফা নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, হুজুর (সঃ) এর দাড়ি মুবারক এতো ঘন ছিলো যে, তাঁর পবিত্র বক্ষ আচ্ছাদিত হয়ে যেতো। দাড়ির দৈর্ঘ সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিমাপ কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। অবশ্য ওয়াযায়েবুন্নবী নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হুজুর (সঃ) এর পবিত্র দাড়ি স্বাভাবিকভাবে চার আঙ্গুল ছিলো— তার কম নয়। তবে এ বর্ণনার স্বপক্ষে কোনো সনদ পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক যে, দীর্ঘ দাড়ি সৌন্দর্যের প্রতীক। বিশেষ করে দাড়ি যখন ঘন হয়।

ওয়াযায়েবুন্নবী এর উদ্ধৃতি শিফা কিতাবের উদ্ধৃতির খেলাফ বলে মনে হয়। আবার তিরমিযী শরীফের বর্ণনারও পরিপন্থী দেখা যায়। তিরমিযী শরীফে এসেছে, 'হুজুর আকরম (সঃ) দাড়ি মুবারকের চুল মুঠি দিয়ে ধরতেন এবং গোঁফ কর্তন করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি মোছ কর্তন করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এমর্মে উক্ত হয়েছে যে, তোমরা মুশরিকদের আকৃতির বিপরীত করো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, মজুসী অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো এবং খুব বেশী বিরুদ্ধাচরণ করো। দাড়িকে লম্বা করো আর মোছ খাট করো এবং এই কর্তন অতিরিক্ত করো। গোঁফ কর্তন করার ব্যাপারে ইমামগণের মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন। তবে কর্তনের ব্যাপারে কমপক্ষে এতটুকু করতে হবে যেন ঠোঁটের কিনারা দেখা যায়। কারও মতে মোছ সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলা বেদাত। আবার কারও মতে সুন্নত। তবে, অহনাফের নিকট এহ্ফা করা অর্থাৎ মূল থেকে তুলে ফেলা সুন্নত। তবে হাদীছ শরীফে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় গোঁফ মুবারককে মেসওয়াক দিয়ে উঠিয়ে ধরতেন, এটাতো বাহ্যত উপরোক্ত মতের

পরিপন্থী। এটা সম্ভবতঃ বিশেষ সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। নতুবা অধিকাংশ সময় তিনি এহ্ফাই করে থাকতেন। আমাদের যুগের হানাফী আলেমগণের মত হচ্ছে, চোখের ভ্রু পরিমাণ রেখে দেয়া। তবে মুজাহিদ-গণের বেলায় এর বিধান স্বতন্ত্র। তাঁদের জন্য মোস্তাহাব হচ্ছে মোছকে (দু'পার্শে) লম্বা করে রাখা যা দেখে দুশমনদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তবে মোছকে লম্বা করতে যেয়ে এতটুকু করা যাবে না যে, ঠোঁটের প্রান্ত আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে মাতালেবুল মু'মিনীন কিতাবে। মোছের দু'পাশের চুলকে লম্বা করে রাখাতে কোনো দোষ নেই। উলামায়ে কেরাম বলেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও তৎসহ আরও বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম মোছের দু'পাশের চুলকে লম্বা করে রাখতেন। আর এরূপ লম্বা করার কারণে মোছ দিয়ে মুখ ঢেকে যেতোনা এবং আহারের সময় আহার্য বস্তুও স্পর্শ হতো না। নীচের ঠোঁট সংলগ্ন যে দাড়ি, যাকে عنفقه 'আনফাকা' বলা হয় তা রাখা বা কামিয়ে ফেলা সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তম নীতি হচ্ছে তাকে রেখে দেয়া। তবে 'আনফাকা' এর দু পা[illegible]শ কামানোতে কোনো দোষ নেই। দাড়ি লম্বা রাখার পরিসীমা সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মযহাব অনুসারে চার আঙ্গুল লম্বা রাখতে হবে। তবে তার অর্থ হচ্ছে, এর চেয়ে কম যেনো না হয় (এর চেয়ে বড় হলে ক্ষতি নেই)। কিন্তু অন্য এক বর্ণনা অনুসারে চার আঙ্গুলের অধিক হলে তা কর্তন করা ওয়াজিব। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, উলামা ও মাশায়েখগণ যদি এর চেয়ে বেশী লম্বা রাখেন, রাখতে পারেন। দুরস্ত হবে। এই পরিমাপের অধিক দাড়ি লম্বা রাখা বা কর্তন করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত দুখানি হাদীছ দলীল স্বরূপ উল্লেখযোগ্য যা বুখারী শরীফের কিতাবুল্লেবাসের শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—সাইয়েদুনা হজরত ইবন ওমর (রাঃ) তাঁর দাড়িকে মুষ্টি দিয়ে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।

হজরত ইবন ওমর (রাঃ) যখন হজ বা ওমরা করতেন, তখন তাঁর দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং তার অতিরিক্ত যে চুল থাকতো তা কর্তন করে ফেলতেন। আবার হজরত নাফে (রাঃ) হজরত ইবন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মোছকে অতিমাত্রায় কর্তন করো এবং দাড়িকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাতে হস্তক্ষেপ করো না। এখন প্রশ্ন জাগে যে, দাড়িকে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তাহলে হজরত ইবন ওমর (রাঃ) মুষ্টির অতিরিক্তটুক কর্তন করতেন কেনো। অথচ তিনিই উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী। হাদীছ ব্যাখ্যাকারগণ তার

জবাব দেন এ ভাবে—হজরত ইবন ওমর (রাঃ) যে দাড়ি কর্তন করতেন তা হজ ও ওমরার সময়ের জন্য খাছ ছিলো। অন্য সময় দাড়ি লম্বা রাখতেন। এ ব্যাপারে অনারবদের ন্যায় (দাড়ি কর্তন করা) আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনগণের বিভিন্ন আমল ছিলো। বর্ণনা করা হয় যে, হজরত আলী (রাঃ) এর বুক ভরা দাড়ি ছিলো। সাইয়্যেদুনা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও হজরত উছমান (রাঃ) সম্পর্কে এরকমই বর্ণিত আছে। হজরত সাইয়্যেদুনা গাউছুল আজম মুহীউদ্দীন শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর দাড়িও দীর্ঘ এবং চওড়া ছিলো।

আনা শরীফ

আনা বা নাভীর নিম্নাংগের পশম পরিষ্কার করার ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীছে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) তা কামিয়ে ফেলতেন। অপর কোনো কোনো হাদীছে এসেছে, তাতে তিনি চিমটা ব্যবহার করতেন। উভয়পক্ষের হাদীছই দুর্বল। কেননা হুজুর আকরম (সঃ) কখনও হাম্মাম-খানায় যাননি, বা কখনও তা দেখেনওনি। হাম্মামখানার আবিষ্কার তো তাঁর ওফাতের পর অনারব দেশসমূহ বিজিত হওয়ার সময়ে হয়েছিলো। তবে হুজুর (সঃ) খবর দিয়ে গিয়েছিলেন, এককালে মানুষ হাম্মামখানা ব্যবহার করবে এবং সাথে সাথে মেয়েদেরকে হাম্মামখানায় যেতে নিষেধও করে গিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ কোনো প্রয়োজন সাপেক্ষে ঋতুস্রাব বা চিকিৎসাজনিত বা এ জাতীয় কোনো অপরিহার্য কারণে যেতে পারবে। হুজুর (সঃ) শুক্রবারে অথবা কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে বৃহস্পতিবারে মোছ এবং নখ মুবারক কর্তন করতেন। নখ কাটার নিয়ম সম্পর্কে তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এন্তেখাবাত কিতাবে এতটুকু পাওয়া যায়, ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সমাপ্ত করতেন। মেসওয়াক ও চিরুনী কখনও হুজুর পাক (সঃ) থেকে পৃথক হতো না। যখন তেল ব্যবহার করতেন, তখন দাড়ি মুবারকে চিরুনী করতেন এবং স্বীয় চেহারা মুবারকের কমনীয়তা আয়নাতে অবলোকন করতেন। প্রকৃতপক্ষে আয়নায় চেহারা দেখা তো তাঁর জন্যই মানায়। কেননা তাঁর রূপলাবণ্য তো নূরের অলংকার, নূরে এলাহীর উদয়স্থল ও সীমাহীন রহস্যের প্রকাশস্থল। যেমন কবির ভাষায়

زائنه حسن یراجدائی نیست

عرض تجلی حسن است ذرد ضائی نیست

গর্দান শরীফ

হুজুর আকরম (সঃ) এর গর্দান শরীফের বর্ণনায় ইবন আবী হালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর গর্দান মুবারক চান্দির মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও পুতুলের মত সুন্দর ছিলো। دمية 'দুমইয়াতুন' শব্দটির দাল অক্ষরে পেশ ও মীমের মাঝে সাকিন দিয়ে পড়তে হবে।যার অর্থ হচ্ছে ঐ পুতুল যা হাতীর দাঁত কেটে তৈয়ার করা হয়। নেহায়া কিতাবে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। আর কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাদা হাড় থেকে তৈরীকৃত পুতুল হচ্ছে دميه 'দুমইয়া'। নবী করীম (সঃ) কে কোনো পুতুল বা মূর্তির সাথে তুলনা করাটা বাহ্যত আদবের খেলাফ বলে মনে হয়। কিন্তু মূর্তির মধ্যে যে চরম নিপুনতা ও শৈল্পিক দিক ফুটে উঠে, সে দিকে লক্ষ্য করেই এ তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নেহায়া কিতাবে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। শামায়েলে তিরমিযীর হাশিয়াতে বর্ণনা এসেছে الدمية الغزال 'আদ্দুমাইয়াতু আলগাযাল'। 'দুমাইয়া' হরিণকে বলা হয়। অন্য বর্ণনা অনুসারে 'দুমাইয়া' হরিণের বাচ্চাকে বলা হয়। তবে অভিধানের গ্রন্থসমূহে এরকম উল্লেখ নেই। আল্লাহ্পাক এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদীছ শরীফে ব্যবহৃত فى صفاء الفضة 'ফীসেফায়িল ফিদ্দাতে' বাক্যটি দ্বারা গর্দান মুবারকের গুণাবলী প্রকাশ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার অন্য এক বর্ণনায় উক্ত হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলল্লাহ্ (সঃ) এর গর্দান মুবারক এমন শুভ্র ছিলো যেনো রূপা দিয়ে তৈরী। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হুজুর আকরম (সঃ) এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটি ছিলো একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

মুবারক স্কন্ধদ্বয়

منكب 'মানকাব' শব্দের মীম বর্ণে যবর ও কাফ বর্ণে যের হবে। অর্থ হচ্ছে বাজু ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থান যাকে কাঁধ বলা হয়। হুজুর পাক (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের বর্ণনায় এসেছে بعيدا ما بين المنكبين 'বায়িদান মাবাইনাল মানকাবাইনে'। অর্থাৎ তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিলো। আবার এ بعيد বাঈদ শব্দটিকে بعيد বাইদুন তসগীর (ক্ষুদ্র অর্থবোধক বিশেষ্য) হিসাবেও পড়া হয় অর্থাৎ অল্প দূরত্ব ছিলো। কেউ কেউ আবার উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা করেছেন—প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী। বস্তুতঃ বক্ষের প্রশস্ততা, সে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যার বর্ণনা এরকম এসেছে—বক্ষ প্রশস্ত ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব। এ দুটি বৈশিষ্ট্যই

একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু এ দুটি বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন দুখানি অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই তার বর্ণনা আলাদাভাবে পেশ করা হয়েছে।

পবিত্র বক্ষ

হুজুর আকরম (সঃ) এর বক্ষ মুবারক প্রশস্ত এবং দর্শনীয় ছিলো। এই যে বর্ণনা—এটা হুজুর আকরম (সঃ) এর বাহ্যিক দৈহিক কাঠামোর বর্ণনার অন্তর্ভূত। তাই এরূপ বর্ণনা এসেছে। অন্যথায় তাঁর অভ্যন্তরীণ যে হৃদয় তার বর্ণনা তো পবিত্র কালামে এরকম প্রদান করা হয়েছে—আলামনাশ্রাহ্লাকা ছাদরাকা—হে আমার বন্ধু! আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করিনি। —তাঁর মাকাম যে অনেক উর্ধ্বে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে এই আয়াতে কারীমায়। কেননা এহেন উচ্চ মাকামের পূর্ণতা কেবল তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য নির্ধারিত।

পূতপবিত্র কলব

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র কলবের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। যেহেতু কলব হচ্ছে একটি বাতেনী অঙ্গ। আর এখানে তাঁর যাহেরী সূরত নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। তাই গবেষণা ও চিন্তার মাধ্যমে তা বুঝতে হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় কলব সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা এসেছে عظيم مشاش المنكبين والكتد 'আযীমু' মুশাশিল মানকাবাইনে ওয়াল কাতিদ। 'কাতিদ' শব্দটির কাফ বর্ণে যবর ও তা বর্ণে যের দিয়ে পড়লে অথবা তা বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে তার অর্থ হয়—ঐ স্থান যেখানে স্কন্ধদ্বয় এসে মিলিত হয়েছে। আর 'মুশাশ' শব্দটির মীম বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে তার অর্থ হবে ঘাড়ের হাড় যা মাথার সঙ্গে মিলিত। তখন বর্ণনার অর্থ দাঁড়ায়, হুজুর পাক (সঃ) বিশাল স্কন্ধের অধিকারী ছিলেন।

পূতপবিত্র উদর

এ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর পেট ও বক্ষ উভয়ই সমান ছিলো। অর্থাৎ বক্ষ পেটের চেয়ে উঁচু ছিলো না, আবার পেটও বক্ষ থেকে স্ফীত ছিলো না, উভয় অঙ্গই সমান সমান, স্বাভাবিক ছিলো। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে যে বর্ণনা এসেছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রশস্ত উদর। আর এ বৈশিষ্ট্যটি (চওড়া বক্ষ) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে কোনো কোনো হজরত উদর ও বক্ষ সমান হিসাবে ব্যাখ্যা

করেন। হুজুর আকরম (সঃ) এর পেট মুবারকের বর্ণনায় হজরত ইবন উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর পেট মুবারক দর্শন করেছি। তাঁর পেট মুবারক ছিলো স্তরে স্তরে ভাঁজ করে রাখা কাগজের মত। অর্থাৎ খুব মসৃণ ও সুন্দর।

পবিত্র বক্ষকেশ

হুজুর আকরম (সঃ) এর সীনার পশম মুবারকের বর্ণনায় হজরত আলী মুর্তজা (কাঃ) বলেন, তাঁর বুকের পশম ছিলো ذومسربه 'যু মুসারতিবা'। হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) এর বর্ণনায় دقيق مسرتب 'দাকীক মুসারাতিবা' ঐ পশম রাজিকে বলা হয় যা সীনার উপর থেকে নাভী পর্যন্ত লম্বিত থাকে। হুজুর আকরম (সঃ) এর উক্ত পশমরাজি সরু ছিলো বিধায় তাকে خيط 'খাইত' বা ডোরা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাররাহ্ কিতাবে مسروبه 'মাসরুবাহ্' র বর্ণে পেশ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ বক্ষ ও নাভীর মধ্যবর্তী স্থানের পশম। 'মুসারিতিবা' শব্দটি বাহ্যত سرب 'সারবুন' থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে রাস্তা। বক্ষের নিম্নাংশ, যেখান থেকে পেট আরম্ভ সে স্থান ছিলো লোমমুক্ত। এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণনা এসেছে, তাঁর বক্ষের দু'প্রান্ত এবং পেট মুবারকে سرنبه 'সারনুবাহ্' নামক পশম ব্যতীত আর কোনো পশম ছিলো না। শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পশম ছিলো, যার বর্ণনা হাদীছ শরীফে এরূপ এসেছে—হুজুর পাক (সঃ) এর বাহুদ্বয়, বাজুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, সীনা মুবারকের ঊর্ধ্বাংশ ও টাখনু পর্যন্ত দু' পেত্তলী পশম ছিলো। হুজুর পাক (সঃ) এর শরীর মুবারকের পশম সংক্রান্ত বর্ণনায় যে 'পশমহীন হওয়া' এর বর্ণনা পাওয়া যায়, তা বস্তুত পশমাবৃত দেহ না হওয়াকে বুঝানোর জন্য এসেছে।

পবিত্র বগল

হুজুর আকরম (সঃ) এর বগল শরীফ তাঁর সমগ্র দেহ মুবারকের ন্যায় শুভ্র ছিলো। আল্লামা তিবরী (রঃ) বলেন, এ বৈশিষ্ট্যটি কেবল হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্য নির্ধারিত। তিনি ব্যতীত অন্য সকল মানুষের বগলের বর্ণ ভিন্ন যার মধ্যে কালো বর্ণ বিদ্যমান। আল্লামা কুরতুবী (রঃ) এর বর্ণনায় এর চেয়েও একটু আলাদা অবস্থা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এর বগল মুবারক পশমহীন ছিলো। তবে এ সম্পর্কে কেউ কেউ আবার ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এটার কোনো প্রমাণ নেই। কেননা ত্বকের

শুভ্রতায় এটা প্রমাণিত হয় না যে, সেখানে পশম থাকবে না। আবার কোনো কোনো হাদীছে এরূপ বর্ণনা এসেছে, তিনি বগল মুবারকের পশম তুলে ফেলতেন। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে عفرابطيه 'আফারুইবতাইহে'। 'আফার' বলা হয় শুভ্র বর্ণকে। হারভীও এরকম বলেছেন। সাররাহ্ নামক কিতাবে 'আফার' এর অর্থ করা হয়েছে اعفر আ'ফার। অর্থাৎ লাল ও সাদা বর্ণের মিশ্রণ যাতে রক্তিমাভার প্রাধান্য থাকে।

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একদা হুজুর পাক (সঃ) আমাকে বগলের সাথে মিশিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তখন আমি অনুভব করলাম যে, তাঁর বগল মুবারক থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বের হচ্ছে।

পিঠ মুবারক

হুজুর পাক (সঃ) এর পৃষ্ঠদেশ বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় ছিলো। অর্থাৎ পাক, সাফ, শুভ্র ও সমান ছিলো।

মহরে নবুওয়াত

হুজুর আকরম (সঃ) এর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মহরে নবুওয়াত ছিলো, তিনি নবুওয়াতের ধারা সমাপ্তকারী ছিলেন। মহরে নবুওয়াত ছিলো ইষৎ উঁচু মাংশবিশেষ, যা শরীরের বর্ণের মতোই ছিলো স্বচ্ছ ও নূরানী। উক্ত মাংশপিণ্ডকেই মহরে নবুওয়াত বা খতেমুন নবুওয়াত বলা হয়। خاتم 'খতেম' শব্দটির তা বর্ণে যের দিয়ে فاعل 'ফায়েল' বা কর্তৃকারক পদ হয়, তার অর্থ হচ্ছে, কোনোকিছুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে তার পূর্ণতা সাধনকারী। আর যদি খতেম শব্দটির তা বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়, তখন অর্থ হবে মহর বা আংটি। সার্বিক ভাবে خاتم النبين 'খতেমুন্নাবিয়্যীন' এর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। সর্বশেষ নবী যে তিনি, তার প্রমাণ হচ্ছে মহরে নবুওয়াত। খতেমুন্নাবিয়্যীন হিসাবে তাঁকে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, পূর্ববর্তী বিভিন্ন আসমানী কিতাবে তাঁর পরিচিতি এভাবেই প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মহরে নবুওয়াতখানি একটি নিদর্শন, যা দেখে মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, তিনিই ঐ আখেরী যমানার নবী যে সম্পর্কে পূর্বে শুভসংবাদ প্রদান করা হয়েছিলো। মহরে নবুওয়াত আল্লাহ্‌তায়ালার মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম নিদর্শন যা দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) কে বিশেষিত করা হয়েছে। আল্লামা হাকিম (রঃ) স্বীয় মুস্তাদরেক কিতাবে হজরত ওহাব ইবন মুনাববাহ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, জগতে

যতো নবী রসূল আবির্ভূত হয়েছেন সকলেরই ডান হাতে আলামতে নবুওয়াত বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু আমাদের নবী (সঃ) এর আলামতে নবুওয়াত তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানে ছিলো। এ সম্পর্কে জনৈক কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন

نبوت راتوان نامه درمشت

که ازتعظیم دارد مہربر پشت

হজরত শায়খ ইবন হাজার মক্কী (রঃ) শরহে মিশকাতে বলেছেন, নবী করীম (সঃ) এর মহরে নবুওয়াতের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিলো

الله وحده لا شريك له

توجه حيث كنت فانك منصور

অর্থাৎ আল্লাহ্ অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, আপনি যে ভাবেই থাকুন না কেনো তাওয়াজ্জুহ করুন। আপনি অবশ্যই বিজয়ী। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, মহরে নবুওয়াত নূরানী ছিলো যা ঝকমক করতো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ওফাতের পর উক্ত মহরে নবুওয়াত গুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এই আলামত থেকেই বুঝা গিয়েছিলো যে, তাঁর ওফাত হয়েছে। যেহেতু নবী করীম (সঃ) এর ওফাতের পর মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সন্দেহ এবং মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো যে, আসলেই তাঁর ওফাত হয়েছে কিনা। মহরে নবুওয়াত অদৃশ্য হওয়া ছিলো ওফাতের প্রমাণ। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এ মতটি শুদ্ধ বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর ওফাতের পরেও তো তাঁর নবুওয়াতের বিধান বিদ্যমান ছিলো। ওফাতের মাধ্যমে নবীর নবুওয়াত ও রেসালত সমাপ্ত হয় না। বরং বিদ্যমান থাকে। মহরে নবুওয়াত গায়েব হওয়ার মধ্যে আল্লাহতায়ালার কি খাছ ভেদ নিহিত রয়েছে, তা কেবল আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মহরে নবুওয়াত ছিলো। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে মহরে নবুওয়াত ছিলো বাম কাঁধের নরোম মাংশপিণ্ডের কাছে।

আল্লামা তাওরিশী (রঃ) বলেন, দু রকম বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা দু' কাঁধের মধ্যে কথাটির অর্থ এই নয় যে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। বাম কাঁধের দিক হলেও তা দু' কাঁধের মধ্যেই ধরতে হবে। যে বর্ণনায় ডান কাঁধের পাশে আছে বলে উল্লেখ আছে, সেখানেও এরূপ সমাধানই প্রযোজ্য হবে। ওয়াল্লাহু আ'লীম।

বর্ণনাকারীগণ মহরে নবুওয়াতের আকার আকৃতির বর্ণনাও করেছেন। অপরকে বুঝানোর জন্য এর উপমা উদাহরণও পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা কবুতরের ডিমের ন্যায় সাদা ছিলো। আবার কেউ বলেছেন, রক্তিম মাংশপিণ্ডের ন্যায় ছিলো। সাররাহ্ কিতাবে غدة 'গুদ্দাহ্' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'গুদ্দাহ্' শব্দের বহুবচন হচ্ছে غدود 'গুদূদ' যার অর্থ হচ্ছে গোশ্তের শক্ত গ্রন্থি। হুজুর পাক (সঃ) এর মহরে নবুওয়াত 'গুদ্দাহ' এর ন্যায় ছিলো—এর অর্থ হচ্ছে তাতে লাল বর্ণের প্রাধান্য ছিলো। সুতরাং হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াত তাঁর দেহের বর্ণের মতো ছিলো বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে এই বক্তব্যটি তার পরিপন্থী নয়। কারণ এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা বলে মহরে নবুওয়াতের রং কালো বা নীল ছিলো তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা। যেমন ইবন হাজার মক্কী স্বীয় পুস্তক শরহে শামায়েলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে মহরে নবুওয়াত ছিলো زرحجله 'যার্রেহাজালাহ্' (ঝালরের গুণ্ডি) এর ন্যায়।

زر 'যার' শব্দের অর্থ হচ্ছে গুন্ডি, আর 'হাজালাহ্' এর অর্থ ঐ স্থান যেখানে ঝালর দিয়ে সাজিয়ে নববিবাহিতা বধূকে বসানো হয়। 'হাজালাহ্' শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'হেজাল'। অধিকাংশ এ রকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ 'হাজালাহ্' এর অর্থ করেছেন, এক প্রকারের পাখি। আর 'যার' এর অর্থ পাখির ডিম। অর্থাৎ তাদের মতে মহরে নবুওয়াত ছিলো 'হাজালা' নামক পাখির ডিমের ন্যায়। যে হাদীছে বলা হয়েছে —মহরে নবুওয়াত ছিলো কবুতরের ডিমের ন্যায়-এই মতটি উক্ত হাদীছের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। কিন্তু زر 'যার' শব্দের অর্থ অভিধানে ডিম লিখা হয় নাই। কোনো কোনো বর্ণনায় رزايت 'রাযাইয়াত' অর্থাৎ প্রথমে র এবং পরে যা বর্ণ। এরকম যদি হয় তবে তার অর্থ হবে ডিম। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, মহরে নবুওয়াত ছিলো একখানা মাংশপিণ্ড। আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে مشت 'মুশত' এক মুষ্ঠির ন্যায়। যার মধ্যে ثاليل 'ছাআলীল' এর ন্যায় তিলক বিদ্যমান ছিলো। 'ছাআলীল' বলা হয় ঐ সমস্ত গোটাকে যা চানার দানার মরা চামড়ার নীচে সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সবকিছুই মহরে নবুওয়াতের বাহ্যিক আকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত। তবে এর অন্তরালে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার মহান কুদরতের এক অবর্ণনীয় লীলারহস্য—যা কেবল হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্যই নির্ধারিত ছিলো। অন্য কোনো নবীর জন্য এরকম ছিলোনা। ওয়াল্লাহু আ'লীম।

পবিত্র বাহুদ্বয়

হুজুর আকরম (সঃ) এর হস্ত মুবারকের বর্ণনায় শামায়েলে তিরমিযীতে এসেছে, পাঞ্জাদ্বয় লম্বা ছিলো। زند 'যানদুন' যা বর্ণে যবর ও নূনে ছাকিন দিয়ে—তার অর্থ হচ্ছে পাঞ্জা। আবার অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে এরকম — الزند هو موصل الزراع والكف وهمازندان 'আয্যান্দুহুয়া' মুসিলযযেরায়ে ওয়াল কাফ্ফে ওয়াহুমা যান্দানে'। অর্থাৎ زند 'যান্দ' হচ্ছে কবজি ও হাতের মিলনস্থল। এর দ্বিবচন হচ্ছে زندان 'যান্দানে'। হাতের পাঞ্জার দৈর্ঘ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নাই, যদিও তাঁর পাঞ্জা মুবারক লম্বা ছিলো। এটা সম্ভবও। অপর এক বর্ণনায় এসেছে عبل الزرا عين 'আবলুয্যেরাআইনে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে عبل العضدين 'আব্লুলআয দাইনে'। এ দুটি বর্ণনারই অর্থ হচ্ছে তাঁর বাহু ও কবজী মুবারক মোটা ছিলো। সাররাহ্ নামক পুস্তকে زرائع 'যারায়ে' এর অর্থ করা হয়েছে হাতের তালু মাংশল ছিলো। এক বিবরণে এসেছে, হাতের তালু প্রশস্ত ছিলো। এ সকল বর্ণনার সারকথা হচ্ছে, হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবারক ভরপুর ও পূর্ণাঙ্গ ছিলো—সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিলো। আর এটি رجب الراحة 'রাজ্বুররাহাত' এর বর্ণনার অনুকূল। সাররাহ্ নামক পুস্তকে بسط 'বিসতুন' শব্দটির বা বর্ণে যের যোগে—অর্থ হচ্ছে হাতের প্রশস্ততা। এক বর্ণনায় এসেছে, بسط 'বাসতুন' এর পরিবর্তে সীন বর্ণকে আগে নিয়ে سبط الكفين 'সাবতুল কাফ্ফাইনে'। তার অর্থ হচ্ছে হাতের তালু নরোম ছিলো। এই سبط 'সাবতুন' শব্দটি আবার হুজুর পাক (সঃ) এর চুলের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ ছিলো ঝুলন্ত নরোম চুল। যা جعد 'জাআদ' 'রুক্ষ চুল' এর বিপরীত। ঐ অর্থ হিসাবেই এখানে সাবতুল কাফ্ফাইন '(হাতের তালু নরোম)' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়—মসৃণ ও সুন্দর শরীর। অভিধান গ্রন্থে سبط 'সাবতুন' শব্দের অর্থ করা হয়েছে প্রশস্ত। যেমন বলা হয় প্রশস্ত হাতবিশিষ্ট লোক, অর্থাৎ দানশীল। কেননা দানশীল ব্যক্তি প্রশস্ত হাতের অধিকারীই হয়ে থাকে। হাতের তালুর ব্যাখ্যায় আবার ششن الكفين 'শাশনুল কাফ্ফাইনে' ও বলা হয়েছে। ششن 'শাশনুন' শব্দের অর্থ হাতের দৃঢ়তা, যা ধারণকালে অনুভব করা যায়। হস্ত মুবারকের বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীছে যে

শব্দ এসেছে তা সীন দ্বারা, তার অর্থ হয় নরোম ও মুলায়েম। তিবরাণী মুস্তাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর হাত মুবারক সম্পর্কে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আমি একদা রসূলে খোদা (সঃ) এর কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁর সাথে মুসাফেহা করি। আমার মনে হলো হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবারক রেশমের চেয়ে নরোম এবং বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। বুখারী শরীফে হজরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমি রসূলে খোদা (সঃ)এর হস্ত মুবারকের চেয়ে নরোম রেশমকেও পাইনি। রেশমী কাপড় অন্যান্য সমস্ত কাপড়ের চেয়ে নরোম ও মোলায়েম হয়ে থাকে। এখানে রুক্ষতা ও কাঠিন্যের সমন্বয় কেমন করে হতে পারে? হাঁ, কোমলতা ও স্থুলতার সাথে সমন্বয় ঘটতে পারে। যেমন, তাঁর সমস্ত দেহ মুবারক নরোম, কোমল, মসৃণ, মাংশল ও সুদৃঢ় ছিলো। ঠিক তেমনিই হাতের তালু মুবারকও নরোম ও মাংশল ছিলো।

অবশ্য কোনো কোনো হজরত এরকম বলে থাকেন, হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবারকের নরোম বা শক্ত হওয়াটার বর্ণনার সময় ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিলো। সুতরাং তিনি স্বীয় গৃহে বা যুদ্ধক্ষেত্রে যখন হাতে অস্ত্র তুলে নিতেন, বা কোনো কাজকর্মে নিয়োজিত হতেন তখন হাত শক্ত হয়ে যেতো। আবার যখন তা ছেড়ে দিতেন তখন পূর্বের ন্যায় হাতে মৌলিক কোমলতা ও স্বাভাবিক নম্রতা ফিরে আসতো।

কথিত আছে, আসমায়ী—যিনি আরবী ভাষার ইমাম ছিলেন, তিনি যখন হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবারকের سبط الكفين 'সাবতুল কাফ্‌ফাইন' এর ব্যাখ্যা করলেন شثن الكفين 'শাশনুন কাফ্‌ফাইন' অর্থাৎ হাত শক্ত ছিলো। তখন তাঁকে বলা হলো, হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবারক তো নরোম ও মোলায়েম ছিলো বলে বর্ণনা এসেছে—আপনি তাকে কঠিন ও রুক্ষ বলে ব্যাখ্যা করলেন কেমন করে? একথা শুনে তিনি অঙ্গীকার করলেন, পরিপূর্ণ সাবধানতা ও সতর্কতা ব্যতীত তিনি আর হাদীছের ব্যাখ্যাই করবেন না। আসমায়ী একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর শানে তিনি পরিপূর্ণ আদব ও ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি খেয়াল রাখতেন। একদা লোকেরা তাঁকে "আমার অন্তরে কোনো কোনো সময় পর্দা পড়ে" এই হাদীছের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা প্রশ্ন করলেন, পর্দা পড়া কি? এর হাকীকত কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর মহাপবিত্র কলবের পর্দা সম্পর্কে প্রশ্ন না করে অন্য কারও কলবের পর্দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে, তা হলে আমি

বলতে পারতাম। এ মুহূর্তে আমার যা এলেম আছে, তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর হাকিকত আল্লামাহুল গুয়ুব ছাড়া কারও জানা নেই।

হজরত আবু উবায়দা (রাঃ) যে ব্যাখ্যা করেছেন তা নির্ভুল নয়। তিনি তাঁর ব্যাখ্যা স্থূলতা ও সংকীর্ণতার সঙ্গে করেছেন।

শেফা গ্রন্থের প্রণেতা কাজী আয়ায (রঃ) বলেন, উক্ত ব্যাখ্যাটি পুরুষদের জন্য প্রশংসনীয় বটে। তবে নারীদের জন্য নয়। হাতের কঠোরতা বা রুক্ষতা পুরুষ শ্রেণীর বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু নারীদের বেলায় এরূপ নয়। আর সে রুক্ষতা শব্দ নিয়ে হুজুর পাক (সঃ) এর হাতের বর্ণনা দেওয়া সমীচীন হতে পারে না। তাই তাকে তিনি খন্ডন করেছেন। একথাটি سائل الاطراف 'সায়েলুল আতরাফ' (আঙ্গুলের অগ্রভাগ লম্বা) বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। অর্থ হচ্ছে হুজুর পাক (সঃ) এর হাতের আঙ্গুলসমূহ লম্বা ও প্রবহমান ছিলো। শেফা গ্রন্থে এসেছে, আঙ্গুলসমূহ লম্বা ছিলো। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, شائل الاطراف 'শায়েল আতরাফ' শীন বর্ণ যোগে। এটি شول 'শাউল' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে পাথর টানা, যমীন থেকে বোঝা উঠানো এবং উষ্ট্রীর ক্ষমতা অনুসারে বহন করা ইত্যাদি। আবার আরেক বর্ণনায় এসেছে, شاين الاطراف 'শায়েনুল আতরাফ'—লাম বর্ণকে নূন দ্বারা পরিবর্তন করে। যেমন জিব্রীলকে জিবরীন পড়া। এই বর্ণনাটি প্রদান করেছেন ইবনুল আম্বারী। আঙ্গুল সম্পর্কে এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা আঙ্গুলের খর্বতার পরিপন্থী। ششن 'শাশনুন' এর অর্থ পুরু ও মাংশল যার মধ্যে খর্বতা ও কাঠিন্য নেই। যদিও অভিধান গ্রন্থের মাধ্যমে এর অর্থ রুক্ষতা বা কাঠিন্য পাওয়া যায়। তাঁর হস্ত মুবারকের গুণাবলী, নিদর্শন, বরকত ও মোজেজা সমূহের আধিক্য বর্ণনা করা লিখনীর ক্ষমতা বহির্ভূত। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, একদা হুজুর পাক (সঃ) হজরত জাবির ইবন সামুরাহ (রাঃ) এর গণ্ডদেশে তাঁর পবিত্র হস্ত সঞ্চালন করলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত মুবারক থেকে এমন শীতলতা ও সুবাস অনুভব করলেন যেনো হুজুর এই মাত্র আতর বিক্রেতার কৌটা থেকে তাঁর হস্ত মুবারক বের করে এনেছেন। বায়হাকী ও তিবরাণী শরীফে হজরত ওয়ায়েল ইবন হাজর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, আমি যখনই হুজুর আকরম (সঃ) এর সাথে মুসাফেহা করেছি তখন তাঁর হস্ত মুবারক স্পর্শ করার কারণে আমার হাত এতো সুরভিত হয়ে যেতো যে, সমস্ত দিন ভর আমার হাত থেকে ঘ্রাণ নিতে থাকতাম। হাত থেকে মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক ঘ্রাণ বের হতো।

হজরত ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ বর্ণনা করেন, একদা হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় হস্ত মুবারক আমার হাতের মধ্যে রাখলেন। তখন আমি তাঁর হাতকে বরফের চেয়ে অধিক শীতল ও মেশকের চেয়ে অধিক সুবাসিত পেলাম। হজরত সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমার অসুস্থতায় হুজুর পাক (সঃ) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি স্বীয় হাতখানা আমার কপালের উপর রাখলেন। এরপর আমার চেহারা, বক্ষ ও পেটের উপর স্বীয় পবিত্র হস্তখানা বুলিয়ে দিলেন। এতে আমার অনুভব হলো, এখন পর্যন্ত তাঁর হাতের শীতলতা আমার কলিজা পর্যন্ত বিরাজ করছে। কাজেই হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র দেহে যে সুগন্ধি ছিলো, তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর ঘাম ও পেশাব মুবারকের খোশবু সম্পর্কে বর্ণনা সামনে করা হবে।

এখন আসা যাক হুজুর পাক (সঃ) এর হস্ত মুবাকের শীতলতা অনুভব করার মর্মার্থ কি—এ প্রসঙ্গে। তাঁর শরীর মুবারক তো স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণ ও ভারসাম্যময় ছিলো। তাহলে উক্ত শীতলতার মানে কি? উক্ত শীতলতা থেকে ঐ শীতলতা উদ্দেশ্য নয় যা মেজাজ ও তবীয়তের শীতলতার কারণে হয়ে থাকে। যাতে দেহ থেকে শীতল ঘর্ম নির্গত হয় এবং তাকে স্পর্শ করতে মানুষ অপছন্দ করে থাকে। বরং উক্ত শীতলতার অর্থ হচ্ছে মেজাজের ভারসাম্যতা এবং তীব্র উত্তাপ দেহের মধ্যে বিরাজ না করা। কেননা তাঁর হস্ত মুবারক স্পর্শ করাতে এক প্রকার আস্বাদ ও প্রশান্তি অর্জিত হতো। যেমন হজরত সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছ দ্বারা জানা গেছে। (অতএব বুঝে নাও এবং সঠিক বুঝের জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে তাওফীক চাও)।

পবিত্র পদযুগল

হুজুর আকরম (সঃ) এর কদম মুবারকের বর্ণনায় এসেছে, উভয় কদম মুবারক বড় ও মাংশল ছিলো। যেমন হাত মুবারকের বর্ণনায় এসেছে, দুহাতের পাঞ্জা নরোম ও মাংশল ছিলো। মাওয়াহেব গ্রন্থে এসেছে غلظ الاصابع 'গেলাযুল আসবে' (পায়ের আঙ্গুল সমূহ পুরু ছিলো)। মাশারেক গ্রন্থে غلظ ششن শাশন ও গেলায উভয় শব্দের অর্থ করা হয়েছে মোটা এবং মাংশল। এক বর্ণনায় خمصان الا خمصين 'খেমসানুল আখমাসাইন' এসেছে। 'খাম্স' পায়ের তলার ঐ অংশকে বলা হয় যা পদচারণার সময় মাটির সঙ্গে মিলিত হয়। সাররাহ গ্রন্থে অর্থ করা হয়েছে পায়ের তলার চিকন দিক। حمصان খেমসান শব্দটির خ 'খ'

বর্ণে পেশ সহযোগে এটা خمص 'খুমস' শব্দের দ্বিবচন। যার পা যমীন থেকে অনেক উচুঁতে থাকে তাকে اخمص 'আখমাস' বলা হয়। হুজুর পাক (সঃ) এর কদম মুবারকের ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষণ অবশ্য আধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। অর্থাৎ পা হালকা ও পাতলা না বুঝানোর জন্য। ইবনুল আছীর থেকে এরূপ সংকলিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উভয় কদম মুবারক সমান্তরাল ছিলো। এতে বাহুল্য বা ভঙ্গুরতা কিছুই ছিলোনা। পা দুখানা মসৃণ ও পবিত্র হওয়ার কারণে তাতে পানি ঢেলে দিলে তরিৎ গতিতে প্রবাহিত হয়ে পড়ে যেতো। ইবন আলী (রাঃ) এর হাদীছেও এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি যখন যমীনে পা রেখে চলতেন তখন সমস্ত পা ফেলেই চলতেন, পায়ের কোনো স্থান স্ফীত ছিলোনা। বায়হাকী শরীফে হজরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর কদম মুবারক স্ফীত ছিলোনা, তিনি যখন হাটতেন তখন পুরা পা ফেলে হাঁটতেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইবন আসাফের। مسيح القدمين 'মাসিহুল কাদামাইন' এর অর্থও এটাই। কথিত আছে যে, হজরত ঈসা (আঃ) কে একারণে মসীহ বলা হতো। যেহেতু তাঁর পায়েও কোনোরূপ স্ফীতি ছিলোনা। আল্লাহ্তায়ালা সর্বাধিক জ্ঞাত। তাঁর মতে, '(দুপা দিয়ে পানি তরিৎগতিতে প্রবাহিত হয়ে পড়ে যেতো)'—এ বিশেষণটি অন্যতম। এটি মাসিহুল কাদামাইন এর বিশেষণের অন্তভুর্ক্ত নয়। এই বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়। তবে আসল কথা সেটাই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দুটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অবশ্য সম্ভব। এবং তা এই ভাবে, আখমাস এর অর্থ দাঁড়ায় পরিমাণমত স্ফীত ছিলো। পায়ের নীচের অংশ সমান্তরাল ছিলো না, আবার খুব উচুঁও ছিলোনা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) পায়ের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পায়ের গোড়ালী সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে,.তাঁর গোড়ালীতে গোশত কম ছিলো। منهوس 'মানহুস' শব্দটিকে কেউ বর্ণনা করেছেন সীন বর্ণ দিয়ে। 'বাহ্রাইন' ও 'ইবনুল আছীর' এর গ্রন্থকার একে সীন ও শীন উভয় বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। 'শারেক', গ্রন্থেও এরূপ উভয়প্রকার বর্ণনা রয়েছে। তবে কেউ কেউ আবার একে শীন বর্ণ দিয়ে মানহুস বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ স্ফীত গোড়ালী। সাররাহ্ গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে—কম গোশতবিশিষ্ট। এই

কিতাবের লিখক শায়খ মুহাক্কেক শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহ্‌লভী (রঃ) বলেন, আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ মুসা পাক শহীদ মুলতানী জীলানী (রঃ) এর পায়ের গোড়ালী এতো পরিষ্কার ও মসৃণ ছিলো যে, কোনো সুন্দর গন্ডদেশও এরকম হতে পারেনা। হুজুর পাক (সঃ) সৌন্দর্যের সাথে অনেকটা সাদৃশ্য এতে পাওয়া যায়।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে সাইয়েদা মায়মুনা বিনতি ফারযাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, আমি রসূলে খোদা (সঃ) কে দেখেছি। আমি তাঁর কদম মুবারকের তর্জনী আঙ্গুলের লম্বতা কখনও ভুলতে পারিনা। তাঁর পায়ের তর্জনী আঙ্গুল পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা ছিলো। আহ্‌মদ ও তিরমিযী এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর পায়ের তর্জনী আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের তুলনায় দৃশ্যমান ছিলো। মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) এর হাতের শাহাদাত আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের তুলনায় লম্বা ছিলো। উক্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে হজরত ইবন হাজার মক্কী (রঃ) বলেন, এ ধরনের কথা যদি কেউ বলে তাহলে তা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য পায়ের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে তর্জনী আঙ্গুল অধিকতর লম্বা ছিলো। 'মাকাসেদে হাসানা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হজরত মায়মুনা বিনতি ফারযাম (রাঃ) এর নিছক বর্ণনার উপর যদি কেউ চিন্তা ভাবনা ব্যতীত নির্ভর করে বসে, তাহলে ভুল হবে। তবে তর্জনী আঙ্গুল লম্বা হওয়া পায়ের বেলায় সীমাবদ্ধ বলে 'মসনদে ইমাম আহমদ' এ বর্ণনা করা হয়েছে। বায়হাকীর বর্ণনাও এরকমই।

এই কিতাবের লিখক শায়খ আবদুল হক মুহদ্দিছে দেহ্‌লভী (রঃ) বলেন, হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে—হুজুর পাক (সঃ) একদা শাহাদাত ও মধ্যমাঙ্গুলী মিলিত করে বললেন, আমার আবির্ভাব ও কিয়ামত এই দুই আঙ্গুলের ন্যায়। অর্থাৎ খুব কাছাকাছি সময়। তিনি কিয়ামতের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারটা এভাবে বুঝালেন যেমন উক্ত দু আঙ্গুলের মধ্যে ব্যবধান। আবার কেউ কেউ এই হাদীছের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, তাঁর আবির্ভাব ও কিয়ামত এ দুটি যে খুব লাগালাগি তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নতুবা দু আঙ্গুল মুবারক একত্রিত করার প্রয়োজন কি? এর উত্তর হচ্ছে এইযে, দু আঙ্গুলকে মিলিত করা দ্বারা অগ্রপশ্চাত হওয়ার ব্যবধান প্রকাশ পায়। কেউ বলেন, শাহাদাত ও মধ্যমাঙ্গুলী সমান সমান ছিলো।

আবার একদল এরূপ বলেন, দুটি লাগালাগি থাকা ও তার আধিক্য প্রকাশার্থে ঐ সময় হুজুর পাক (সঃ) এর উক্ত দুই আঙ্গুল মুবারক মোজেজা স্বরূপ সমান সমান হয়ে গিয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আলীম।

পায়ের গোছা মুবারক

হুজুর আকরম (সঃ) এর পায়ের গোছা মুবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার পায়ের গোছা দু'খানি সরু ও মসৃণ ছিলো। খুব মাংশল ছিলোনা। এক হাদীছে আছে, আমি তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি করলে দেখতে পেলাম যেমন খোরমা বৃক্ষ। জীম বর্ণে পেশ ও মীমে তাশদীদ দিলে তার অর্থ হয় খোরমা বৃক্ষ। যাকে বলা হয় شحم النخل 'শাহমুন্নাখল'। আর উক্ত গাছটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমান, পরিষ্কার, মসৃণ ও শুভ্র হওয়া। ضخم الكراديس 'যাখিমুল কারাদীস' অর্থাৎ অঙ্গের জোড়াসমূহ মাংশল ছিলো। দুই হাড়ের সংযোগকে كردوس 'কারদূস' বলা হয়। এই বর্ণনা দ্বারা জোড়া মাংশল এবং অঙ্গের দৃঢ়তাকে বুঝানো হয়েছে। 'সাররাহ' কিতাবে 'কারদূস' এর অর্থ করা হয়েছে জোড়া সমূহের হাড় যুগল। যেমন দু'কান, দু বাহু, দু'রান ইত্যাদি।

পবিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব

হুজুর আকরম (সঃ) এর অঙ্গসৌষ্ঠব ছিলো পবিত্র বাগান ও আকর্ষণীয় বাগিচার বৃক্ষের শাখা সদৃশ। অর্থাৎ মসৃণ, সঠিক ও আঁটসাট ছিলো। খর্বাকৃতিও না আবার অধিক লম্বাও না। তবে দীর্ঘতার দিকেই টান টান ছিলো। সুতারাং হাদীছে এসেছে, কওমের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির দেহবিশিষ্ট। ربع 'রাবউ' শব্দের 'র' বর্ণে যবর 'বা' সাকীন যোগে অর্থ হচ্ছে মধ্যমাকৃতির দেহ। অন্য এক হাদীছে এসেছে, বেঁটে দেহের চেয়ে লম্বা আবার লম্বা দেহের চেয়ে খাটো। এর অর্থ হচ্ছে বেঁটে হওয়ার চাইতে কিছুটা লম্বা। অর্থাৎ দীর্ঘতার দিকে ইষৎ টানটান ছিলো তাঁর দেহ মুবারক। مشذب 'মুশাযযাব' শব্দটির মীম বর্ণে পেশ, শীনে যবর ও যাল বর্ণে তাশদীদ সহকারে—যার অর্থ অনেক লম্বা যা দর্শনে ভীতি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে আছে, তাঁর দেহ মাত্রায় দীর্ঘ ছিলোনা। ممغط 'মুমাগ্‌গেৎ' শব্দটি প্রথম মীম বর্ণে পেশ, দ্বিতীয় মীমে যবর ও গাইন বর্ণে তাশদীদ সহকারে যের। আবার পরে তাফয়ীলের ক্রমে মাফউল হিসাবে গাইন বর্ণে তাশদীদ যবর দিয়েও পড়া যায়। অর্থ এমন দেহ যা শেষ সীমার লম্বা। আবার কুজোঁ ব্যক্তির ন্যায়

খাটও নয়। متردد 'মুতারদেদ' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দেহের কিয়দাংশ বেরিয়ে আসে। যেমন কুঁজো ব্যক্তি। কেউ কেউ আবার এই বৈশিষ্ট্যটি দ্বারা তিনি যে খাটো ছিলেন তাই সাব্যস্ত করে থাকেন। তবে সেটা খুব বেশী নয়। অবশ্যই মধ্যমাকৃতি ও ভারসাম্যময় দীর্ঘ। আবার কোনো কোনো হাদীছে এসেছে, তাঁর দেহ মুবারক অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের লম্বা ছিলোনা। হজরত আলী মুর্তযা (রাঃ) এর হাদীছে আছে, তিনি খুব বেশী লম্বা দেহের অধিকারী ছিলেন না। তবে লম্বার দিকে টানটান হওয়ার কারণে বেঁটে অবস্থার চাইতে উঁচু ছিলেন। তিনি যখন কোনো সম্প্রদায়ের লোকের কাছে যেতেন তখন তাদের মধ্যে যারা বেঁটে তারা তাঁর নীচে পড়ে থাকতো।

উম্মুল মুমেনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে আছে, রসূল (সঃ) যখন কোথাও একা একা থাকতেন তখন তাঁকে মধ্যমাকৃতির দেখা যেতো। আর যখন অন্যান্য লোকদের সঙ্গে থাকতেন তখন লম্বাকৃতির মনে হতো। উক্ত অবস্থায় যে লম্বা দেখা যেতো বলেই তিনি লম্বা ছিলেন—এ কথা বলা হয়েছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন উভয়ের তুলনায় তাঁকেই লম্বা দেখা যেতো। আবার যখন সে দুটি লোক থেকে ভিন্ন হতেন তখন তাঁকে দেখা যেতো মধ্যমাকৃতির। তিনি যখন কোনো মজলিশে দন্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর স্কন্ধদ্বয় উঁচু থেকে উঁচুতর দেখা যেতো।

ছায়াহীনতা

হুজুর পাক (সঃ) এর দেহ মুবারকের কোনো ছায়া ছিলোনা। সূর্যের আলোতেও না, চাঁদের কিরণেও না। হাকীমে তিরমিযী নাওয়ারেদুল উসুল কিতাবে হজরত যাকওয়ান (রাঃ) থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। তবে উক্ত বুযুর্গগণের কথায় তাজ্জব হতে হয় এই ভেবে যে, তাঁরা প্রদীপের আলোর কথা উল্লেখ করেননি। 'নূর'—হুজুর পাক (সঃ) এর নাম মুবারক সমূহের অন্যতম নাম। নূরের কোনো ছায়া হয়না। মাওলানা জামী (রঃ) এ সম্পর্কে কতোই না সুন্দর বলেছেন:-

امی ودقیقه دان علم
بےسایه وسائبان عالم

পবিত্র শরীরের রঙ

হুজুর পাক (সঃ) এর দেহ মুবারকের বর্ণ ছিলো উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়। সাহাবা সমাজের একতাবদ্ধ মত এই যে, তাঁর দেহের বর্ণে শুভ্রতার আধিক্য ছিলো। সাহাবাগণ শুভ্রতা দ্বারাই তাঁর প্রশংসা ও বর্ণনা পেশ করেছেন। কেউ কেউ এরকম বলেছেন كان ابيض مليحا 'কানাআবইয়াদু মালীহান'—লাবণ্যময় শুভ্র ছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, চেহারা মুবারকে লাবণ্যময় শুভ্রতা ছিলো। এ জাতীয় বর্ণনা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর দেহ মুবারক শুভ্র এবং লাবণ্যময় ছিলো। বস্তুতঃ তাঁর রূপসৌন্দর্য প্রকাশার্থে দীদারের উদগ্র বাসনায় উন্মুখজনের চিত্তাকর্ষণের জন্য চরম ও পরম আস্বাদ প্রদানের বর্ণনা প্রকাশার্থে লাবণ্য তাঁর দেহ মুবারকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথবা নিরেট শুভ্রতা যাকে 'আবহাক' বলা হয়, তা না বুঝানোর জন্য লাব্যণ্যের বিশেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। 'আবহাক' এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটা এমন শুভ্রতা যার মধ্যে লাল, হলুদ বা বাদামী রং কোনোটিরই সংমিশ্রণ নেই। এ জাতীয় শুভ্রতার সাদৃশ্য দেখা যায় শ্বেতী বা ধবল রোগীর চেহারার মধ্যে।

অন্য আর এক বিবরণে আছে, তাঁর চেহারা আনওয়ার খুব শুভ্র ছিলো। আর শ্মশ্রু মুবারক ছিলো গাঢ় কৃষ্ণ। আবু তালেব নবী করীম (সঃ) এর প্রশংসায় বলেছেন, 'তাঁর চেহারা মুবারকের শুভ্রতার কাছে বর্ষণকারী শুভ্র মেঘমালাও ভিক্ষা তালাশ করে। তিনি এতীম ও বিধবাদের প্রতিপালনকারী।' হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর বর্ণ সাদা মাশরাবী সদৃশ। আর মাশরাব ঐ শরাবকে বলা হয়, যার এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের মিশ্রণ ঘটে। যেমন নাকি এক রঙের শরাব পান করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বর্ণের শরাবও পান করানো হয়েছে। এখানে মাশরাব এর অর্থ করা হয়েছে লাল বর্ণ। অন্য বর্ণনায় মাশরাবের ব্যাখ্যাও এসেছে। যেমন তাঁর বর্ণ সাদা মাশরাবের মতো যাতে লাল রঙও মিশ্রিত। আবার কোনো কোনো হাদীছে ازهر اللون 'আযহারুল্লাউন' বর্ণনা এসেছে। যেমন হজরত আনাস (রাঃ) এর হাদীছ। এর ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায়। বস্তুতঃ বর্ণনাসমূহ দ্বারা তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবের চাকচিক্য ও দ্যুতিময়তাকে বুঝানো হয়েছে।

নাসায়ী শরীফে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হুজুর আকরম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামগণের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এক বেদুইন ব্যক্তি দূত হয়ে এলো। সে সরলতা, মহব্বত ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো, আব্দুল মুত্তালীবের বেটা কোথায়? আর তোমাদের মধ্যে তিনি কোন ব্যক্তি? অর্থাৎ ঐ সুমহান ব্যক্তিত্ব যার রূপ ও

সৌন্দর্যের সুখ্যাতি পৃথিবীকে বেষ্টন করে নিয়েছে, যার শান শওকতের কলতান সারা পৃথিবীতে গুঞ্জরিত হচ্ছে—তিনি কোথায়? সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, সাদা ও লাল বর্ণের ঐ লোকটি যিনি স্বীয় কনুইয়ে ভর করে বসে আছেন। অভিধান গ্রন্থে امغر 'আমগার' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাঁর চেহারায় লাল ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত আভা পরিলক্ষিত হয়। مرفق 'মুরাফফেক' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় কনুইয়ে ভর করে বসে। বুখারী শরীফে হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি শ্বেতী রোগীর ন্যায় সাদা ছিলেন না। অভিধানের ভাষায় ابهق 'আবহাক' এর অর্থ নিছক সাদা বর্ণ যাতে লাল বর্ণের কোনোরূপ মিশ্রণ নেই এবং তাতে রঙের কোনোরূপ দ্যুতিও নেই। এ ছাড়াও তাঁর দেহের বর্ণের বর্ণনায় اسمر 'আসমার' শব্দও এসেছে। 'সামুরাহ্' সাদা ও কালো বর্ণের মাঝামাঝি এক প্রকার রঙকে বলা হয়। 'সামরা' বলা হয় বাদামী রঙকে। তবে 'সাররাহ্' গ্রন্থে 'সামুরাহ' বলা হয়েছে বাদামী রঙকে। বলা হয়েছে এ 'সামরা' বর্ণটি মাশরাবী শুভ্রতার সাথে মিলে। আরববাসীরা আবার উক্ত রঙ বুঝানোর জন্য 'সামরা' শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অন্য এক হাদীছে এসেছে ابيض 'আবইয়াদ' মানে مائل بسمره 'মায়েল বসামুরাহ্'—সাদা বর্ণ যা বাদামীর দিকে যায়। বলা হয় مشرب 'মুশাররাব' বর্ণ যখন مبشع 'মুবাশশা' এর সঙ্গে মিলিত হয় তখন তাতে اسمر 'আসমার' বর্ণের সাদৃশ্য হয়। তবে হুজুর পাক (সঃ) এর দেহের বর্ণে ادمه 'উদমাহ' কে রহিত করা হয়েছে। 'উদমাহ' বলা হয় মিশমিশে কাল বর্ণকে। সুতরাং এখানে তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে তাঁর দেহের বর্ণ শ্বেতীর মতো সাদাও ছিলো না আবার সম্পূর্ণ কালোও ছিলোনা। সারারাহ্ নামক অভিধান গ্রন্থে 'উদমাহ' এর 'সামুরাহ' এবং ادم 'আদম' অর্থ 'আসমার' করা হয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে لا بالادم 'লাবিল আদম' এর অর্থ 'উদমাহ'। অর্থাৎ খুব কালো ছিলো না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'সামুরার' এর সাথে মিশ্রিত সাদা বর্ণ এবং ঐ সাদা বর্ণ যার মধ্যে রক্তিমতার মিশ্রণ থাকে। নিছক সাদা বর্ণ যা কে ابهق 'আবহাক' বা مبروص 'মাবরুস' (শ্বেতী রোগীর ন্যায় সাদা বর্ণ) বলা হয়, তা না বুঝানোই এর উদ্দেশ্য। এই বর্ণনা দ্বারা আল্লামা ইবন জাওযীর বক্তব্য রহিত হয়ে যায়। হাদীছের ব্যাখ্যায় যেখানে তিনি বলেছেন كان اسمر 'কানা আসমার'—এটি ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, এ

বক্তব্যটি হাদীছের বর্ণনার বিরোধী। যেহেতু হাদীছ শরীফে সুস্পষ্ট ভাবে 'রক্তিম শুভ্রতা' এবং 'কাল নয়' বর্ণনা রয়েছে। উক্ত 'আদম' শব্দটির অর্থ হবে 'আসমার' অর্থাৎ বাদামী রঙ। ইবন জাওযী যা বলেছেন, তা সাদা ও বাদামী রঙের মিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হুজুর আকরম (সঃ) দেহের যে অংশে রোদের প্রতিক্রিয়া পড়তো, সে অংশ 'বাদামী' দেখা যেতো। আর যে অংশ কাপড়ের নীচে থাকতো তা সাদা দেখা যেতো। কিন্তু আলেমগণ এতেও একমত হননি। কেননা সূর্যের কিরণ ও বায়ুর তাছীর তাঁর দেহ মুবারকের বর্ণে কোনোরূপ পরিবর্তন আনতে পারতোনা। যেমন 'আনওয়ারুল মুতাজাররাদ' এ ইবন আবী হালা (রাঃ) থেকে হাদীছ এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র বদনের যে অংশ পোশাকের বাইরে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকতো, সে অংশ সাধারণ মানুষের মতো ছিলো না। বরং তার বিপরীত ছিলো। উজ্জল ও শুভ্র ছিলো। হাকীকত হচ্ছে এই যে, মহব্বত ও ভালোবাসা সেতো তাঁর দরজার নগণ্য এক খাদেম তুল্য। নতুবা কেউ কি নবী করীম (সঃ) এর শানে এমন বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারে—যা তাঁর মধ্যে ছিলোনা। কেউ কেউ আবার এরকম বলেছেন, জীবনের শেষভাগে তাঁর দেহের বর্ণ গাঢ় হয়ে গিয়েছিলো। সে সময়ই বাদামীর দিকে টানটান লাল বর্ণ পরিলক্ষিত হতো।

পবিত্র পদবিক্ষেপ

হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র পদবিক্ষেপ সম্পর্কে হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছ এরকম—নবী করীম (সঃ) যখন হাঁটতেন তখন ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেনো তিনি উপর থেকে নীচের দিকে নামছেন। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা, যেমন ফুলবিশিষ্ট বোঁটা ফুলের ভারে ঝুঁকে পড়ে। কদম মুবারক নেহায়েত নিপুণতা, দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে উঠাতেন। বাযযার হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) হাঁটার সময় যমীনে পুরা কদম ফেলে হাঁটতেন। অন্য এক হাদীছে এসেছে, তাঁর চলার গতি ছিলো শক্তিতে ভরপুর যাতে কোনোরূপ শৈথিল্য, আলস্য, বা স্থবিরতা ছিলো না। হজরত আলী মূর্তজা (রাঃ) থেকে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, তিনি যখন হাঁটতেন তখন যমীন থেকে পা মুবারক পুরাপুরি উঠাতেন এবং পা বেশ ফাঁক রাখতেন, এরপর সহজভাবে কিন্তু দ্রুততার সাথে কোনোরূপ নড়াচড়া বা স্পন্দন ব্যতীত পা ফেলতেন। তিনি বলেছেন, যেনো উঁচুস্থান থেকে নীচুস্থানের দিকে অবতরণ করছেন।

صبب ‘সবৃব’ বা صبوب ‘সবুব’ নীচু যমীনকে বলা হয়। ينحط من صبب ‘ইয়ানহাত্তু মিন সাবাবিন’ এর অর্থ হচ্ছে উঁচু যমীন থেকে নীচু যমীনের দিকে অবতরণ করা। কদম মুবারক উঠানোর দৃঢ়তাকে বুঝানোর জন্য এ উপমাটি পেশ করা হয়েছে। হাঁটার সময় যে হরকত বা স্পন্দন হয় তা বুঝানোর জন্য নয়।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাস্তায় রসূল করীম (সঃ) এর চাইতে অধিকতর দ্রুত চলতে কাউকে আর দেখিনি। মনে হতো তাঁর কদম মুবারকের নীচে যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে গেলে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম এবং শ্রান্তি অনুভব করতাম। তাঁর সঙ্গে হাঁটতে যেয়ে আমাদেরকে রীতিমতো দৌড় দিতে হতো এবং আমাদের নিঃশ্বাস ফুলে উঠতো। কিন্তু তাঁর কাছে কোনো কষ্ট অনুভূত হতো না। তিনি স্বাভাবিক অভ্যাসমতোই কোনোরূপ কৃত্রিমতা ছাড়াই হেঁটে চলে যেতেন। কোনোরূপ দোদুল্যমানতা বা কম্পন পরিলক্ষিত হতো না। এ ধরনের চলন প্রত্যয়, সৎ সাহস এবং বীরত্বের নিদর্শন। এ ধরনের হাঁটার মধ্যে গতি, দৃঢ়তা এবং ভারসাম্যতা বিদ্যমান থাকে, যার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রশান্তি ও আরাম পাওয়া যায়। তিনি কখনও জুতা মুবারক পরিধান করে হাঁটতেন। আবার কখনও খালি পায়ে হাঁটতেন। কখনও পদব্রজে হাঁটতেন আবার কখনও বাহনে করে চলতেন। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে। যেমন কবির ভাষায়ঃ

سروپیا ده خوش اندر چمن نباز - انسي
من پیاده خوش است وسؤا رخوش

তিনি যখন সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতেন তখন সাহাবীগণকে আগে রাখতেন এবং তিনি পিছনে পিছনে হাঁটতেন। ঐ সময় তিনি এরশাদ করতেন, আমার পিঠকে (পশ্চাত দিককে) ফেরেশতাগণের জন্য মুক্ত রাখো। হাদীছ শরীফে এরকম বর্ণনা এসেছে, হাঁটার সময় তিনি সাহাবীগণকে আগে রাখতেন। سوق ‘সওক’ শব্দের অর্থ আরোহনের প্রাণীকে পিছনের দিক থেকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর قود ‘কাউদ’ শব্দের অর্থ প্রাণীকে সামনের দিক থেকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া। কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নবী করীম (সঃ) সমস্ত সাহাবীগণকে

পাঠিয়ে দেয়ার পর নিজে রওয়ানা হতেন। চলার পথে দুর্বল ও কমজোর লোকদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আর যারা যেতে অক্ষম হতো তাদেরকে তিনি নিজের সঙ্গে সওয়ারীতে আরোহন করিয়ে নিয়ে যেতেন। তাদেরকে নিজের পিছনে বসাতেন।

হাঁটার প্রকারভেদ

হাঁটার প্রকার দশটি, (১) তাহাদাত—নির্জীব ও শীর্ণ শুকনো কাঠি সদৃশ লোকের শ্লথগতি সম্পন্ন হাঁটা। (২) এযআজ —রাগের বশবর্তী হয়ে দ্রুতগতিতে বিরক্তিকর ও পেরেশানীর হাঁটা। এ দু'ধরনের হাঁটাই নিন্দনীয়, যা মৃত অন্তরবিশিষ্ট হওয়ার আলামত। (৩) হাউন—এটা হচ্ছে পূর্ণ পদচারণা এবং গতিময় পদক্ষেপ। এটাই ছিলো হুজুর আকরম (সঃ) এর স্বভাবজাত হাঁটা—যা প্রশান্তিময়, মর্যাদাসম্পন্ন ও নিরহংকারী হওয়ার পরিচায়ক। (৪) সায়ী—দৌড়ের ন্যায় দ্রুতগতি সম্পন্ন হাঁটা। (৫) রমল—তাড়াতাড়ি পা উঠিয়ে স্কন্ধ দুলিয়ে পালোয়ানদের ন্যায় দৌড়ে চলা (৬) নসলান—দৌড় দেওয়া। এটা সায়ীর চেয়েও বেশী গতিসম্পন্ন। (৭) খাওরইয়া—হাতের পাঞ্জায় ভর করে চলা। (৮) কাহ্কারী—পিছনের দিকে উলটোভাবে হাঁটা। (৯) জামরী—লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বলে উটকে জাম্মারা বলা হয়। (১০) তাবাখ্তার—ধীরে ধীরে মনোহর ভঙ্গিতে টলায়মান অবস্থায় আত্মভরিতার সঙ্গে হাঁটা। উক্ত দশ প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ ও উত্তম হাঁটা 'হাউন'। কুরআনে কারীমেও উক্ত হাঁটা সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালার ঐ সমস্ত বান্দারা যারা যমীনের উপরে হাঁটে তারা হাউন (বিনয়) এর সাথে হাঁটে।

পবিত্র স্বেদ ও দেহবর্জ্য সমূহের সুঘ্রাণ

হুজুর আকরম (সঃ) এর বিস্ময়কর গুণাবলীর মধ্যে দেহ মুবারক থেকে নির্গত পবিত্র সুরভি অন্যতম। এহেন গুণটি তাঁর সত্তাগত ছিলো। তিনি দেহ মুবারকে কোনোরূপ সুগন্ধি ব্যবহার না করলেও দেহ থেকে যে সুঘ্রাণ বের হতো, পৃথিবীর কোনো সুগন্ধি তার সমতুল্য হতে পারতোনা। সায়্যিদুনা হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যতো প্রকারের সৌরভ আছে চাই তা মেশক হোক বা আম্বর, আমি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু নবীকরীম (সঃ) এর পবিত্রতম দেহের সৌরভের সমতুল্য কিছুই হতে পারে না। উতবা ইবন ফারকাজ সালমী (রাঃ) এর স্ত্রী হজরত উম্মে আসেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা চার মহিলা উতবার স্ত্রী ছিলাম। আর আমরা চার

সতীন প্রত্যেকেই চেষ্টা করতাম কে কার চেয়ে বেশী খোশবু ব্যবহার করে উতবার নিকটে যেতে পারি। এহেন প্রয়াসে আমরা প্রত্যেকেই খোশবু খুব বেশী ব্যবহার করতাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমাদের সকলের খোশবুই উতবার দেহের খোশবুর কাছে ম্লান হয়ে যেতো। আর উতবা (রাঃ) এর খোশবু ব্যবহারের অভ্যাস এরকম ছিলো যে,তিনি হাতে স্বাভাবিকভাবে একটু তেল মালিশ করে দাড়িতে মেখে নিতেন এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু তবুও দেখা যেতো, তাঁর খোশবুই আমাদের সকলের খোশবুর উপর প্রবল হয়ে গেছে। এদিকে হজরত উতবা (রাঃ) যখন বাইরে যেতেন, তখন লোকেরা বলাবলি করতো, আমরাও তো সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু উতবার সুগন্ধির তুলনায় আমাদের খোশবু তেমন তেজস্কর নয়। হজরত উম্মে আসেম (রাঃ) বলেন, আমি একদিন আমার স্বামী উতবাকে বললাম, আমরাতো সকলেই সুগন্ধী ব্যবহার করে তার সুঘ্রাণ ছড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের খোশবু তো আপনার সুবাসের ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে না। এর কারণ কি? তখন তিনি বললেন, রসূলে খোদা (সঃ) এর জীবদ্দশায় আমার সমস্ত শরীরে একবার অত্যধিক গরমের কারণে ফোস্‌কা পড়ে গিয়েছিলো। (এর কারণে মনে হতো সমস্ত শরীরে যেনো আগুন লেগে গেছে)। এতে অস্থির হয়ে আমি হুজুর আকরম (সঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে আমার অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি এর চিকিৎসা করে দিলেন। বললেন, “তোমার শরীরের কাপড় খুলে ফেলো।” আমি কাপড় খুলে তাঁর সামনে বসে গেলাম। হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় হস্ত মুবারক আমার গায়ের উপর বুলিয়ে দিলেন। পেট ও পিঠেও হাত বুলিয়ে দিলেন। সে সময় থেকেই আমার শরীরে এ সৌগন্ধের সৃষ্টি। এই ঘটনা ইমাম তিবরানী ‘মু’জামায়ে সগীর’ নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

একব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় সুগন্ধি খোঁজাখুজি করছিলেন। কিন্তু কোনোখানে জোগাড় করতে পারছিলেন না। অবশেষে লোকটি হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে সমস্যার কথা বর্ণনা করলেন। তখন হুজুর (সঃ) তাকে খোশবুর ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু নবী করীম(সঃ) এর নিকট তখন কোনো খোশবু ছিলো না। তিনি লোকটিকে বললেন, “একটি শিশি নিয়ে এসো।” লোকটি শিশি নিয়ে এলে তিনি নিজের শরীর মুবারক থেকে নির্গত ঘাম দিয়ে শিশি পুরে দিয়ে বললেন, এই ঘাম তোমার মেয়ের গায়ে মেখে দিও। —ঐ শিশি থেকে নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র ঘাম নিয়ে যখন কন্যাটির গায়ে মেখে দেয়া হলো,

8—

তখন সমস্ত মদীনা মুনাওয়ারা তার সুরভিতে সুরভিত হয়ে গেলো। এর পর থেকে সে বাড়িটির নাম রাখা হয়েছিলো 'বাইতুলমুতিযীন' বা আতর ভবন।

হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হুজুর আকরম (সঃ) আমার বাড়িতে তশরীফ নিয়ে এলেন। দুপুর বেলায় তিনি কায়লুলা করছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় হুজুর আকরম (সঃ) এর দেহ মুবারক থেকে খুব ঘাম নির্গত হচ্ছিলো। আমার আম্মাজান উম্মে সুলায়াম একখানা শিশিতে ঘাম মুবারক জমা করতে লাগলেন। হুজুর পাক (সঃ) এর ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, ওহে উম্মে সুলায়াম! তুমি কি করছো? তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার স্বেদ মুবারক জমা করছি। আমি এগুলো খোশবু হিসাবে ব্যবহার করবো। কেননা আপনার পবিত্র স্বেদের খোশবু তো সবচেয়ে উত্তম খোশবু। হাদীছখানা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আনাস (রাঃ) থেকে এও বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ হুজুর পাক (সঃ) এর দর্শনের প্রত্যাশী হয়ে এসে তাঁকে না পেলে রাস্তায় নেমে খোশবু শুঁকতে থাকতেন। তাঁর অতিক্রমণের ফলে রাস্তায় যে সুবাস ছড়িয়ে পড়তো, তার অনুসরণ করতেন। মদীনা মুনাওয়ারার যে অলি গলিতে সে খোশবু অনুভব করতেন, সেদিকেই তাঁরা ছুটে যেতেন।

এখন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার দেয়ালে দেয়ালে তাঁর মনোহর সুরভির আঘ্রাণ অনুভূত হয়। যার সুবাস আশেক মজনুদেরকে উতলা করে। যেনো সেই খোশবুর মৃদু সমীরণ ফকীর দরবেশ, প্রেমিক মোসাফিরগণকে এখনো স্বর্গীয় তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। মদীনা তাইয়্যেবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আবু আবদুল্লাহ্ আত্তার কেমন প্রাণের আকুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে

بطيب رسول الله فطاب نسيمها

فما المشك والكافو المندل الرطب

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর খোশবুতে মদীনা তাইয়্যেবার পরিবেশ সুরভিত। মেশক ও কাফুরের সুগন্ধি কোন্ ছার? সেরকম সুগন্ধিতো সেখানকার খেজুরের ভিতরেও বিদ্যমান।

জাগ্রত অনুভূতিসম্পন্ন আলেম হজরত শোবাইলী (রঃ) বলেন, মদীনা তাইয়্যেবার পবিত্র মৃত্তিকায় এক বিশেষ ধরনের সুঘ্রাণ নিহিত আছে। যার

উপস্থিতি মেশক আম্বরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। মদীনা তাইয়্যেবার ম্যাটিতে এরকম খোশবু সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবু নঈম হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) এর নূরানী চেহারার উপর নির্গত স্বেদবিন্দু মোতির দানার মতো চকচক করতো। আর তার খোশবু মেশকের চেয়েও বেশী ছিলো।

পবিত্র হস্তের সুঘ্রাণ

নবী করীম (সঃ) এর হস্ত মুবারকের বর্ণনায় হজরত জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) এর হাদীছে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, একদা নবী করীম (সঃ) আমার গণ্ডদেশে স্বীয় হস্ত মুবারক সঞ্চালন করলেন। তাতে আমি এতো শীতলতা এবং সৌগন্ধ অনুভব করলাম যেনো হুজুর তাঁর হাতখানা এই মাত্র আতরের শিশি থেকে বের করে এনেছেন। এ অবস্থায় যদি কেউ তাঁর সাথে মুসাফেহা করতো তাহলে সমস্ত দিন হাতের মধ্যে সেই সুবাস লেগে থাকতো। তিনি কখনও কোনো শিশুর মাথায় যদি স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতেন, তাহলে ঐ শিশুটি অন্যান্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যেতো।

কোনো কোনো হাদীছে বর্ণনা এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র স্বেদ থেকে গোলাপ ফুলের জন্ম হয়েছে। আরেক জায়গায় এরকম বর্ণনা এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমার ঘাম থেকে শবে মেরাজে সাদা ফুল অর্থ্যাৎ চামেলী এবং লাল ফুল অর্থাৎ গোলাপের জন্ম হয়েছে। জিব্রাইল (আঃ) এর ঘাম থেকে জন্ম হয়েছে জরদ রঙের ফুল অর্থাৎ চাঁপা ফুল। এতোদ্ভিন্ন এ সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, মেরাজের ভ্রমণ শেষে আমি যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করি, তখন আমার ঘামের একটি ফোঁটা মাটিতে পড়ে গোলাপের সৃষ্টি হয়। কেউ যদি আমার দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে চায়, তবে সে যেনো গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ করে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি এরশাদ করেন, আমার ঘামের একটি ফোঁটা যখন মাটিতে পড়লো, তখন মৃত্তিকা মাতাল হয়ে উঠলো এবং গোলাপ ফুল জন্ম দিলো। তবে উপরোক্ত হাদীছ সমূহ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ স্ব স্ব পরিভাষায় দস্তুর মতো বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রেখেছেন।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া নামক গ্রন্থে আবুল ফারাহ্ নাহ্রওয়ানী থেকে বর্ণিত আছে, উপরোক্ত হাদীছ সমূহে যা যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা নবী মুখতার (সঃ) এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সাগর থেকে এক বিন্দু মাত্র। পরওয়ারদিগারে আলম তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ) কে যে সীমাহীন বৈশিষ্ট্য

দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন তার তুলনায় উপরোক্ত বর্ণনা নিতান্তই অপ্রতুল। অই সমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ যা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তা তাঁদের তৈরী পরিভাষার আলোকে সনদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই আলোচনা করেন নি যে, নবী করীম (সঃ) থেকে এরূপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বা সুদূর পরাহত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় মৃত্তিকা বিদীর্ণ হওয়া

হুজুর আকরম (সঃ) যখন কাযায়ে হাজত করার অর্থাৎ পায়খানা ফরমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন মাটিতে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে যেতো। যখন তিনি পায়খানা বা পেশাব ফরমাতেন যমীন তা নিজের ভিতরে লুকিয়ে নিতো এবং সেস্থানে কেবল একটি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তো। তাঁর পায়খানা মুবারক কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) এস্তেঞ্জা সেরে যখন বায়তুলখালা থেকে বের হতেন, তখন আমি সেখানে প্রবেশ করে পায়খানার কোনোরূপ আলামত দেখতে পেতাম না। হুজুর পাক (সঃ) তখন বলতেন, হে আয়েশা! তুমি জানোনা, আম্বিয়া কেরামের পবিত্র পেট থেকে যা কিছু বের হয় যমীন তা শোষণ করে নেয়। কাজেই তা দেখতে পাওয়া যায় না।

জনৈক সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমি এক সফরে হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কাযায়ে হাজতের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি কাজ শেষ করে যখন সেস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। কিন্তু পায়খানা বা পেশাবের কোনো আলামতই আমি দেখতে পেলাম না। তবে কয়েকখানা ঢিলা শুধু পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি ঢিলাগুলো হাতে উঠিয়ে নিলাম। অনুভব করলাম সেগুলো থেকে পূতপবিত্র এক প্রকারের অপার্থিব সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে।

কাযী আয়ায মালেকী (রঃ) 'শেফা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলেম সম্প্রদায় অবশ্য হুজুর পাক (সঃ) এর পায়খানা পেশাবের পর অজুর প্রয়োজন আছে—একথাটির পক্ষপাতি। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং তাঁর কোনো কোনো অনুসারীর মত এরকম।

পবিত্র প্রস্রাব

এখন আলোচনায় আসা যাক হুজুর পাক (সঃ) এর পেশাব মুবারকের অবস্থা সম্পর্কে। তাঁর পবিত্র প্রস্রাব অনেক সাহাবীই অবলোকন করেছেন।

হজরত উম্মে আয়মান (রাঃ) যিনি হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন, তিনি তা পানও করেছিলেন। এমর্মে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পাক (সঃ) রাত্রিবেলায় যে খাটে শয়ন করতেন, তার নীচে একখানা পেয়ালা রেখে দেয়া হতো। যেনো প্রয়োজনে তিনি তাতে পেশাব করতে পারেন। এক রাত্রিতে নবী করীম (সঃ) উক্ত পেয়ালার মধ্যে পেশাব করলেন। সকাল হলে তিনি হজরত উম্মে আয়মান (রাঃ) কে বললেন, খাটের নীচে একটি প্রস্রাবভর্তি পেয়ালা আছে ওগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।

হজরত উম্মে আয়মান (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, রাতে আমার পিপাসা পেয়েছিলো তাই আমি তা পান করে ফেলেছি। একথা শুনে হুজুর পাক (সঃ) মৃদু হাসলেন। তবে তাঁকে মুখ ধৌত করে নেয়ার কোনো হুকুমও করেন নি বা ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করতে মানাও করেন নি। বরং বললেন, এখন থেকে তোমার আর কোনো পেটের অসুখ হবেনা। কতোইনা সৌভাগ্য! কতোইনা খোশ নসীব।

এক মহিলা তাঁর নাম ছিলো বারাকাহ্ (রাঃ)। তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে থাকতেন। তিনিও একদা হুজুর পাক (সঃ) এর পেশাব মুবারক পান করে ফেলেছিলেন। হুজুর তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে উম্মে ইউসুফ তুমি চিরসুস্থ হয়ে গেলে। তোমার কখনও কোনো অসুখ হবে না। এরপর দেখা গিয়েছিলো যে, উক্ত মহিলা মরণব্যাধি ছাড়া জীবনে আর কোনো রোগেই আক্রান্ত হননি। কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) এর পেশাব মুবারক পান করেছিলেন। এর ফলে তার সমস্ত শরীর থেকে সারা জীবন সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকতো। এমন কি তার বংশধরদের ভিতরেও কয়েক পুরুষ পর্যন্ত উক্ত সুঘ্রাণ পাওয়া যেতো। তবে মাওয়াহেব ও শেফা গ্রন্থদ্বয়ে শেষোক্ত বর্ণনা দুটি পাওয়া যায় না।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর আকরম (সঃ) এর পেশাব মুবারক ও রক্তকে বরকতময় মনে করতেন। রক্ত পান করার ঘটনা তো একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। ঐ হাজ্জাম, যে হুজুর পাক (সঃ) এর দেহে সিঙ্গা লাগাতেন। তিনিতো সিঙ্গা দিয়ে টানা রক্ত মুবারক বের করে এনে অবলীলাক্রমে তা গলাধঃকরণ করে নিতেন। হুজুর (সঃ) একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রক্ত কি করেছো? লোকটি বললেন, আমি রক্ত বের করে আমার পেটের মধ্যেই রেখে দিয়েছি। আমি এটা কামনা করি না যে হুজুরের দেহ্ মুবারকের রক্ত মাটিতে পড়ুক। একথা শুনে হুজুর (সঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি আপন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছো এবং নিজেকে

সুরক্ষিত করে নিয়েছো। অর্থাৎ এ ওসীলায় তুমি রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে।

উহুদের যুদ্ধের দিন হুজুর আকরম (সঃ) আহ্‌ত হয়ে গেলেন, তখন হজরত আবু সাঈদ (রাঃ) এর পিতা হজরত মালেক ইবন সিনান (রাঃ) নিজের জিহ্বা দিয়ে হুজুরের যখম থেকে রক্ত চুষে চেটে যখমকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। লোকেরা বললো, মুখ থেকে রক্ত বাইরে ফেলে দাও। তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালার কসম, হুজুর পাক (সঃ) এর রক্ত মুবারক আমি যমীনে পড়তে দেবোনা। তিনি রক্ত গিলে ফেললেন। তখন হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, কেউ যদি এ মুহূর্তে কোনো জান্নাতী লোককে দেখতে চায়, সে যেনো এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) একদিন সিঙ্গা লাগালেন এবং তাঁর পবিত্র রক্ত আমাকে দিয়ে বললেন, এ রক্ত এমন একস্থানে মিশিয়ে দাও যেখানে মানুষের দৃষ্টি পড়েনা। আমি পবিত্র রক্ত গ্রহণ করলাম এবং পান করে নিলাম। কারণ আমি ভাবলাম, এর চেয়ে গোপন স্থান আর কিছু হতে পারে না। এতে নবী করিম (সঃ) খুশী হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! লোকেরা তোমা থেকে আর তুমি লোকদের থেকে (উপকৃত হবে)। হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাক্যখানিতে রূপক ভঙ্গিতে এটাই ব্যক্ত হচ্ছিলো যে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের (রাঃ) ভবিষ্যতে একদিন বীরত্ব ও বাহাদুরীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হবেন—যা তাঁর পবিত্র রক্ত পান করার বরকতে হাসিল হবে। তিনিই তো ঐ আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের যিনি কুখ্যাত ইয়াযীদের বায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মক্কা মুকাররমায় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর সমাবেশে হেযায, ইয়ামন, ইরাক ও খুরাসান থেকে দলে দলে লোকজন এসে সমবেত হয়েছিলো। অবশ্য পরে আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের রাজত্বকালে হাজ্জায ইবন ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে দিয়েছিলো। এক বর্ণনায় এরকম পাওয়া যায়, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের হুজুর পাক (সঃ) এর খুন মুবারক পান করার পর তিনি তাঁকে বলেছিলেন, দোযখের অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করবে না, যদি কসম করা থেকে বেঁচে থাকো।

এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, হুজুর আকরম (সঃ) এর পেশাব ও রক্ত পূতপবিত্র ছিলো। এর আলোকেই বিধান সূচিত হবে তাঁর অন্যান্য দেহবর্জ্য সম্পর্কেও। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রঃ) বলেন, উপরোক্ত মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা(রঃ) এর

মযহাবও একমত। শায়খ ইবন হাজার মক্কী (রঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর দেহবর্জ্য যে পবিত্র, এ সম্পর্কে বহু উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ রয়েছে। আমাদের আয়েম্মায়ে কেরাম—এ সকলকে হুজুর আকরম (সঃ) এর বিশেষত্ব হিসাবে গণনা করেন।

দাম্পত্য জীবন

এখন আলোচনায় আসা যাক হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর পূতপবিত্র স্ত্রীগণের সঙ্গে কি রকম আচরণ করতেন, এই প্রসংগে। যদিও এ বিষয়টির আলোচনা বাহ্যতঃ পেট পিঠ ও বক্ষ মুবারকের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। আমার নিকট কিন্তু এস্থানটিই এই বিষয়ে আলোচনার প্রকৃত স্থান হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিবাহে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উপকার হলো প্রজনন সংরক্ষণ বা বংশধারা রক্ষা করা। এছাড়াও আনন্দ উপভোগ করা, আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করা ইত্যাদি অনেক উপকারিতা রয়েছে। প্রজননের মূল পদার্থ বীর্য দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দেহের ভিতরে সংরক্ষিত করে রাখা এবং সহবাস না করার কারণে কঠিন ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। শারীরিক শক্তির মধ্যে স্থবিরতা আসে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। স্ত্রীগণকে মহব্বত করা এবং (শর্ত ও ক্ষমতা অনুসারে) একাধিক বিবাহ করাও এক প্রকারের পূর্ণতা। এ গুণটি এমন এক মাকামের ব্যাপার যার কামালিয়াতের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হতে অক্ষম লোকদের জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এহেন অজ্ঞ মূর্খরা স্ত্রীগণের সঙ্গে সহবাস ও মেলামেশা করাটাকে অপরিণামদর্শীতা, ক্ষতি, দোষ ও নিছক আমোদ স্ফুর্তির অন্তর্ভূত কাজ বলে মনে করে থাকে। জ্ঞানের অভাব, বুদ্ধির স্বল্পতা এবং বৈরাগ্যের দিকে কারও রুচি আকর্ষিত থাকলে এরকম মন্তব্য করা সম্ভব। এ সৃষ্টি জগতের হাকীকত, এর যাবতীয় বস্তুর একিভূতি, সৃষ্টিকরা, সৃষ্টি হওয়া, প্রতিক্রিয়া করা, প্রতিক্রিয়া হওয়া, তথা সৃষ্টজগতের বহিঃপ্রকাশ হওয়া—এসব কিছুরই চূড়ান্ত কারণ যতটুকু তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে অন্য কারও মধ্যে তা নেই। হুজুর আকরম (সঃ) এর পরিচ্ছন্ন কাজ ও আমল এজগতের কার্যাবলীর বিশুদ্ধতার জন্য প্রত্যায়ন এবং প্রমাণ। এ কিতাবের শেষাংশে 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত' শিরোনামে এ প্রসংগের অবশিষ্ট আলোচনা করা হবে ইন্‌শা আল্লাহতায়ালা।

সাইয়্যেদুনা হজরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, হুজুর আনওয়ার (সঃ) এক রাত্রিতে তাঁর এগারজন স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হজরত আনাস (রাঃ) কে সবিস্ময়ে প্রশ্ন

করলাম, হুজুর কি এতই শক্তি রাখতেন? তখন হজরত আনাস (রাঃ) বললেন, আমরা পরস্পরে বলাবলি করতাম, হুজুর (সঃ) কে আল্লাহ্‌তায়ালা তিরিশ জন পুরুষের শক্তি প্রদান করেছেন। হাদীছখানা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় হুজুর (সঃ) এর জান্নাতী চল্লিশজন পুরুষের শক্তি ছিলো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট বর্ণনা এরকম এসেছে যে, জান্নাতী একজন পুরুষ দুনিয়ার একশ' পুরুষের সমান শক্তির অধিকারী হবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেন একদা জিব্রাইল (আঃ) খাবারভর্তি একটি ডেগ আমার কাছে নিয়ে এলেন। আমি তা থেকে কিছু খাবার গ্রহণ করলাম। তাতে আমার ভিতরে চল্লিশজন পুরুষের সমান পুরুষত্বশক্তি এসে গেলো।

কাযী আয়ায (রঃ) 'শেফা' নামক গ্রন্থে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে খোদা (সঃ) এর লজ্জাস্থান কখনও দর্শন করিনি। অন্য আরেক বিবরণে আছে, হুজুর (সঃ) কখনও হজরত আয়েশা (রাঃ) এর লজ্জাস্থান দেখেননি এবং হজরত আয়েশা (রাঃ) ও হুজুর (সঃ) এর লজ্জাস্থান দেখেননি। হুজুর আকরম (সঃ) হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) কে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, (আমার ওফাতের পর) তুমি ব্যতীত অন্য কেউ যেনো আমাকে গোছল না দেয় এবং কারও নযর যেনো আমার লজ্জাস্থানের দিকে না পড়ে। কেননা আমার লজ্জাস্থানের দিকে যদি কারও নযর পড়ে তবে তার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটি ছিলো তাঁর শারীরিক পূর্ণতার প্রমাণ। আর তাঁর রূহানী শক্তিতো এমন ছিলো যে নভোমন্ডলের গতিকেও তিনি থামিয়ে দিতে পারতেন। বরং নভোমন্ডল তার নিজস্ব গতির অনুকূলে কখনও কখনও চলতে পারতোনা। অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দেয়ার ঘটনাতো তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ—যার বর্ণনা হাদীছ শরীফে এসেছে। এটা সম্মান অর্জন করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করার মাকাম। কেননা হুজুর পাক (সঃ) এর জীবন যাপন ও পানাহারের অবস্থা এরকম ছিলো যে, কখনও তিনি উদরপূর্তি করে পরিতৃপ্তির সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন নি। শুধুমাত্র যবের রুটিই যথেষ্ট মনে করতেন। পানাহারের অবস্থা এরকম হওয়া সত্বেও হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র দৈহিক শক্তি ও সামর্থের উপরোক্ত অবস্থাবলী মোজেজার ভিতরে গণ্য হয়ে থাকে।

স্বপ্নদোষ থেকে নিরাপদ থাকা

হুজুর আকরম (সঃ) এহতেলাম বা স্বপ্নদোষ থেকে নিরাপদ ছিলেন। সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো

নবীর কখনও স্বপ্নদোষ হয় নাই। কেননা স্বপ্নদোষ শয়তানের আছর থেকে হয়ে থাকে। হাদীছখানা তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর আকরম (সঃ) রমজান মাসে ফজরের সময় (অর্থাৎ সুবেহ সাদেকের পূর্বে) এহতেলাম ব্যতীত জুনুবী হতেন। (স্ত্রী সহবাসের পর গোছল ওয়াজেব হলে সেই ব্যক্তিকে জুনুবী বলা হয়)। অতঃপর তিনি গোছল করে রোজা রাখতেন। হাদীছ শরীফে 'এহতেলাম ব্যতীত' কথাটির উল্লেখ থেকে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, হুজুর পাক (সঃ) এর শানে এহতেলাম হওয়ার সম্পর্ক লাগানো 'বৈধ'। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা হওয়া সম্ভব। নয়তো 'এস্তেসনা' করার অর্থ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এস্তেসনার ভিত্তিটা জায়েয না হওয়ার উপর। আর যে 'কয়েদ' করা হয়েছে এটি হচ্ছে 'কয়েদে এত্তেফাকী'। অর্থাৎ এতেহলাম হওয়াটা সম্ভব এটা বুঝাচ্ছে। আর বর্ণনাটি হচ্ছে বাস্তবতার নিরিখে। অর্থাৎ হুজুর আকরম (সঃ) এর গোছল ছিলো সহবাসের কারণে। এহতেলামের কারণে নয়। কেননা এহতেলাম তো তাঁর শানে প্রযোজ্যই নয়। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা যদি এরূপ না হয়, তবে তো হাদীছের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম, এহতেলামের সাথে যদি সহবাস জনিত জানাবাত হয় তবে গোছল ফরজ হবে না। বস্তুতঃ এটি হচ্ছে একটি ভ্রান্ত ধারণা। আল্লামা কুরতুবী (রঃ) বলেন, বিশুদ্ধ কথা এইযে, এহতেলাম হওয়া তাঁর সম্মানে বৈধই নয়। যেহেতু স্বপ্নদোষ হলো শয়তানের কাজ। হুজুর আনওয়ার (সঃ) তাথেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। রোজা সংক্রান্ত হাদীছে যে, 'এহতেলাম ব্যতীত' কথাটির উল্লেখ হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে স্বপ্নে কিছু দেখা ব্যতীত নির্গত হওয়া। (তাও তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয় নি)। কেননা স্বপ্নদোষকালে যা দেখানো হয়, তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাযী আয়ায (রঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় একথা বলেন, হুজুর (সঃ) যে গোছল করেছিলেন তা সহবাসের পর কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছিলো।

এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হচ্ছে সুদীর্ঘ একটি হাদীছ দ্বারা, যা আহলে বাইতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছখানা সাইয়্যেদুনা ইমাম হাসান (রাঃ) ও সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসায়ন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এতে হুজুর আকরম (সঃ) এর হুলিয়া মুবারক, তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস সমূহের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, আমি একদা আমার ফুফু হজরত হিন্দ বিনতি আবী হালা (রাঃ) এর নিকট হুজুর আকরম (সঃ) এর হুলিয়া মুবারক সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আর মনে মনে আমি এটাও কামনা করছিলাম যে, আমার সাথে যা সম্পৃক্ত সে সকল কথাগুলিও এই বর্ণনার মাধ্যমে এসে

যাক। অর্থাৎ আমি মনে করলাম, হুজুর পাক (সঃ) এর হুলিয়া মুবারকের আকৃতিগত মিল হয়তো আমার মধ্যেও আছে। কেননা ইমাম হাসান (রাঃ) এর আকৃতি হুজুর পাক (সঃ) এর হুলিয়া মুবারকের সাথে এতো বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো যে, তখন এমন একটি প্রচলন ছিলো, কেউ যদি স্বপ্নযোগে হুজুর (সঃ) কে দেখতো তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, হুজুরকে কি রকম আকৃতিতে দেখেছো। সে যদি বলতো ইমাম হাসান (রাঃ) এর মতো, তখন বলা হতো, সে ঠিকই দেখেছে। ইমাম হাসান (রাঃ) এর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দ বিনতি আবী হালা (রাঃ) বললেন, হুজুর পাক (সঃ) আযীম, বুযুর্গী ও শান শওকতময় দেহের অধিকারী ছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের কিরণের ন্যায় তাঁর চেহারা মুবারক জ্যোতির্ময় ছিলো। হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, এরপর আমি আবার হিন্দ বিনতি আবী হালা (রাঃ) কে বললাম, হুজুর পাক (সঃ) এর কথা বলার ভঙ্গিমা কিরকম ছিলো, কথা শেষে কিভাবে চুপ থাকতেন ও কীরকম বলিষ্ঠ ছিলো তাঁর বাক্যাবলী এ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, হুজুর পাক (সঃ) সর্বদাই ধ্যানমগ্ন এবং চিন্তাযুক্ত থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কোনো কথা বলতেন না। নীরবতা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকতো। বাক্যের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি মুখগহ্বরের কোণ থেকে হতো। অর্থাৎ পরিপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে মুখের ভিতর থেকে শব্দ বের করে আনতেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও অপূর্ণ কথা তিনি কখনও বলতেন না। তাঁর বাক্যের বৈশিষ্ট্য ছিলো 'জামেউল কালাম'। ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত কথা। এমর্মে হাদীছ শরীফে এরকম উক্ত হয়েছে, আমাকে 'জামেউল কালাম' প্রদান করা হয়েছে এবং বাক্যকে আমার জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন ও ঝরঝরে কথা বলতেন হজরত। তাঁর কথার মধ্যে কোনো কিছুর কমতিও থাকতো না আবার অতিরিক্ত কিছু থাকতো না। তিনি নরোম স্বভাবের ও প্রফুল্ল মেযাজের ছিলেন। কর্কশ ও বদমেযাজী ছিলেন না। নেয়ামত সে যতো অল্পই হোক না কেনো তার সম্মান করতেন। কোনো জিনিসের দোষ বর্ণনা করতেন না। খানা যে ধরনের হোকনা কেনো গ্রহণ করতেন। কারও বা কোনোকিছুর দোষ বর্ণনা করতেন না। মন্দ হলে তার প্রশংসাও করতেন না, যেমন চাটুকার লোকদের অভ্যাস। তাঁর রাগত অবস্থার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেতোনা। যখন কেউ কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে ফেলতো তখন তিনি রাগান্বিত হতেন। কারও হক বা অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপার হয়ে থাকলে তার বদলা তিনি নিয়েই ছাড়তেন। তবে তিনি নিজের হকের ব্যাপারে কখনও কারও প্রতি রাগ করতেন না এবং

প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না—যদি সেটা দুনিয়াবী ব্যাপারে হয়ে থাকতো। হুজুর পাক (সঃ) কোনোকিছুর প্রতি ইশারা করলে পুরা হাত দিয়েই করতেন। শুধুমাত্র হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন না। বিস্ময় প্রকাশকালে হুজুর (সঃ) স্বীয় হাত মুবারককে ঐ রকম আকৃতি করে বের করতেন, মানব সন্তান ভূমিষ্ঠকালে হাত যেরকম আকৃতির থাকে। কথাবার্তা বলার সময় ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতের তালুর উপর স্থাপন করতেন। হুজুর আকরম (সঃ) এর এ সমুদয় অভ্যাসসমূহ্ আল্লাহ্তায়ালার নিকট বড়ই পছন্দনীয় ছিলো। এ সমস্ত সম্মানিত স্বভাবগুলির ভিতরে নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো সূক্ষ্ম হেকমত নিহিত, যার ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি অক্ষম হতে বাধ্য। আল্লাহ্পাকই ভাল জানেন।

তিনি যখন রাগান্বিত হতেন তখন চেহারা মুবারক ও পার্শ্ব সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিতেন। আনন্দ ও উৎফুল্লতার সময় এবং যখন কোনো কাম্য জিনিস পেয়ে যেতেন, তখন মুবারক চক্ষুদ্বয়কে বন্ধ করে দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি যখন হাসতেন তখন তাবাসসুম (মুচকি) হাসতেন। মুচকি হাসির সময় হুজুর (সঃ) এর স্বচ্ছ পরিষ্কার পবিত্র দন্তরাজি শ্বেতশুভ্র তুষারখন্ডের মতো ঝকমক করতো।

সাইয়্যেদুনা ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, আমি উপরোক্ত হাদীছখানা হিন্দ বিনতি আবী হালা (রাঃ) থেকে শোনার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তা আমার ভাই ইমাম হোসেন (রাঃ) থেকে গোপন রাখি। পরবর্তীতে তা যখন আমার ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে তিনি এ হাদীছ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আমার পিতা সাইয়্যেদুনা আলী (কাঃ) এর কাছে এই হাদীছ সম্পর্কে বহুবার জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলেন। হুজুর আকরম (সঃ) এর গমনাগমন, আকৃতি প্রকৃতি উঠাবসা—সবকিছুই তিনি জেনে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হজরত ইমাম হোসাইন বর্ণনা করেন, আমি আমার সম্মানিত পিতা আলী (রাঃ) কে হুজুর আকরম (সঃ) এর ঘরে প্রবেশ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, হুজুর আকরম (সঃ) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি কি করতেন? তিনি (হজরত আলী (রাঃ) বললেন, হুজুর (সঃ) যখন তাঁর পবিত্র গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর সময়কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতেন। একভাগ আল্লাহ্র জন্য অর্থাৎ এক ভাগে ইবাদত করতেন। যদিও সর্বদা তিনি ইবাদতেই মশগুল থাকতেন। এখানে এ ইবাদতের অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। এই সময়ের মধ্যে পরিবার পরিজনের, নিজের এবং অন্য কারো হক অন্তর্ভূত থাকতো না। দ্বিতীয় অংশ

পরিবার পরিজনের জন্য রাখতেন। অর্থাৎ এসময় তাঁদের হক আদায় করতেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, কোনো অভাব অভিযোগ থাকলে তা পূরণ করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সহঅবস্থান করতেন। তাঁদেরকে সঙ্গ প্রদান করতেন। আর তৃতীয় অংশ নিজের জন্য রাখতেন। এ সময়ে তিনি নিজের পবিত্র শরীরের হক আদায় করতেন। অর্থাৎ বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। নিদ্রা যেতেন বা এজাতীয় কাজ করতেন। অতঃপর এ অংশকেও দুভাগে ভাগ করতেন। একভাগ নিজের জন্য আরেকভাগ অন্যান্য মানুষের জন্য। এ অংশে তিনি অন্য লোকদেরকেও শরীক করে নিতেন। এ বন্টনের প্রকৃতিটি ছিলো এরকম—হুজুর (সঃ) তাঁর খাছ খাছ সাহাবীগণকে সময় দিতেন। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদির কথা শুনতেন এবং তার বিধিব্যবস্থা করে দিতেন। খাছ খাছ সাহাবীগণকে তাঁর মুবারক মজলিশের ফায়দা প্রদান করতেন। যাতে তাঁদের মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হতে পারে। মোটকথা, প্রথমে একবার খাছ সাহাবীগণকে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি ফায়দা প্রদান করতেন। এরপর সাধারণ লোকদেরকে উপলক্ষ্য করে পুনর্বার তাঁদেরকে ফায়দা প্রদান করতেন। এহেন ফায়দা প্রদান ও নসীহত করার ক্ষেত্রে হুজুর (সঃ) কৃপণতা বশতঃ ঐ সমস্ত লোকদের থেকে কিছুই অবশিষ্ট রেখে দিতেন না, অবারিত ধারায় ফায়দা প্রদান করে যেতেন। লোকদের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে তিনি তাঁদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করতেন।

হুজুর আকরম (সঃ) এর পূতপবিত্র জীবন ও মহিমান্বিত স্বভাবের মধ্যে যে সমস্ত মহানজন নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তাঁদের বেলায় এবং আলেম ফাযেল ও পরিশোধিত ও সোহবতধন্য ব্যক্তিবর্গের বেলায় হুজুর (সঃ) এর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি ছিলো। উপরোক্ত গুণের অধিকারীগণের বেলায় হুজুর (সঃ) তাঁর পবিত্র মজলিশে যোগদান করার ব্যাপারে বিশেষত্ব প্রদান করতেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা অনুসারে দ্বীনী কাজে তাঁদেরকে দায়িত্ব প্রদান করতেন। মোটকথা এই, যে ব্যক্তি হুজুর (সঃ) এর মজলিশে বা দ্বীনদারীতে যতো বেশী বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতেন, তিনি ঐ পরিমাণে হুজুর আকরম (সঃ) এর দান এবং অনুগ্রহের অধিকতর উপযোগী হতেন। তিনি মানুষের অভাব পূরণ করা ও আসহাবগণের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন এবং তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমাদের মধ্যে যাঁরা এ পবিত্র মজলিশে উপস্থিত আছো তাদের উপর কর্তব্য যাঁরা উপস্থিত নেই তাঁদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়া। তিনি তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে আরও বলতেন, যাঁরা আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে আপন আপন প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে পারে না, তাদের পক্ষ থেকে সে

সমস্ত প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরজ।

হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে যদি কেউ নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে না পারে তখন অপর কেউ যদি অক্ষম ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে তাঁর প্রয়োজনের কথাটি পৌঁছিয়ে দেয়, তাহ্লে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক সেই ব্যক্তিকে কদমের দৃঢ়তা দান করবেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর আকরম (সঃ) ব্যক্তিগত প্রয়োজন পেশ করার কথা উল্লেখ করেননি। হুজুর আকরম (সঃ) এর দরবারে এমন হাজত পেশ করা হতো দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়েই যার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া তাঁর পবিত্র মজলিশে অন্য কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা হতো না। বিশেষ করে অনর্থক কথাবার্তা হতোনা। মানুষ তাঁর দরবারের এলেম, খায়ের ও বরকত থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে অন্য লোকদের কাছে যেতেন এবং তাঁদের পথপ্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত হতেন।

সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) তাঁর ওয়ালেদ সাহেব হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) এর কাছে হুজুর আকরম (সঃ) এর বাইরে তশরীফ নেয়া এবং সাহাবাগণের সঙ্গে উপবেশনের ধরন কি রকম ছিলো, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। হজরত আলী (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বীয় জিহ্বা মুবারককে বন্ধ রাখতেন এবং তার হেফাযত করতেন। তবে যে সমস্ত কথায় মানুষের উপকার হতো তা তিনি ব্যক্ত করতেন। يخزن শব্দটি خزن থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ ভাণ্ডারে মাল সংরক্ষণ করা। এ কথাটি অই দিকই ইঙ্গিত করছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র হৃদয় যা হাকীকত ও মারেফতে পরিপূর্ণ ছিলো, তার কুঞ্জি ছিলো তাঁর পবিত্র রসনা। উম্মতের জন্য যা উপকারী ও কল্যাণকর সে সমস্ত বিষয়ে তিনি জবান মুবারক খুলতেন। অন্যথায় মুখ বন্ধ রাখতেন। তিনি উম্মতের মনোরঞ্জন করতেন এবং নিজের সাহচর্য থেকে যাতে দূরে সরে না যায় তা থেকে উম্মতকে রক্ষা করতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ মহৎ কাজটি আল্লাহতায়ালার কাজ। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এতই মেহেরবান যে, তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি দুর্বল ইমানদার লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করতেন। এ শ্রেণীর লোকদেরকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' বলা হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি সম্মান করতেন। এ জাতীয় লোককে সেখানকার জনসাধারণের জন্য হাকিম বা সরদার হিসাবে

নিয়োজিত করতেন। এভাবে তাদেরকে সামনে রেখে হুজুর (সঃ) জনসাধারণ থেকে কিছুটা পরোক্ষে থাকতেন। ইসলামের দুশমন যারা তাদের সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকতেন এবং তাদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। মুসলমানদের যাতে কোনোরূপ ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তিনি সদাসচেতন দৃষ্টি রাখতেন। এটা অবশ্য তিনি করতেন 'আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে মানুষ থেকে হেফাযত করবেন' আয়াতখানা নাযিল হওয়ার পূর্বে। অথবা সর্তক দৃষ্টি রাখার মধ্যে এলেম ও হেকমত রয়েছে। এতে উম্মতকে শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য।

সাধারণ লোকদের থেকে যে হুজুর (সঃ) পরোক্ষে থাকতেন, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে হুজুরের আত্মমর্যাদা ও শানশওকত প্রতিষ্ঠিত রাখার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যাতে করে তারা ভয়ভীতিহীন ও উন্নাসিক হতে না পারে। এই যে তিনি সতর্কতার সাথে চলতেন, মানুষের মেলামেশা থেকে নিজকে কিঞ্চিত দূরেত্ব রাখতেন, এ স্বত্বেও আত্মার প্রশস্ততা এবং সদাচরণের যে স্বভাবগত অভ্যাস তাঁর ছিলো, তা তিনি কখনও বর্জন করতেন না। তিনি স্বীয় সাহাবী বা সাথীগণকে তাঁদের হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন, তাঁদের মনকে খুশী রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। মানুষদের কাছ থেকে পারস্পরিক হালঅবস্থা জেনে নিতেন, যাতে করে কারও কোনো সমস্যা না থাকে। সকলেই ভালো অবস্থায় দিনযাপন করতে পারে এবং একে অপরের প্রতি সদাচরণ করে। হুজুর (সঃ) ভালো কাজের জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহ দিতেন, শক্তি যোগাতেন এবং প্রয়োজনমতো সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতেন। আর কাজ যদি যথাযথ না হতো তবে তা সংশোধন করে দিতেন এবং মন্দ কাজের নিন্দা করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতেন। তাঁর মহিমান্বিত স্বভাবই ছিলো এরূপ যে, তিনি ভালো কিছু দেখলে তার প্রশংসা করতেন এবং মন্দের নিন্দা করতেন। মন্দ কাজ যে কেউ করুক, তাকে তিনি র্ভৎসনা করতেন। এতে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে এরকম মনে রেখে করতেন না। যে যতো বড়ো শক্তিধর এবং বাহ্যিক মর্যাদার অধিকারী লোক হোক না কেনো তাকে বিন্দু পরিমাণ ভয় করতেন না।

হুজুর আকরম (সঃ) যে একজন থেকে অন্যজনের সংবাদ সংগ্রহ করতেন, তা কিন্তু গুপ্তচরমূলক প্রবণতার অন্তর্ভুত ছিলোনা। কেননা গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে কারও গোপন দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয়া। হুজুর আকরম (সঃ) যে একজনের দ্বারা অপরজনের অবস্থা জেনে নিতেন, তা ছিলো প্রকাশ্য অবস্থা। কারও গোপন কোনো দোষ নয়। তাও

তিনি প্রতিপালন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে করতেন। তিনি সবক্ষেত্রেই ভারসাম্য রক্ষাকারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় মহান কর্মধারা, সম্মানিত গুণাবলী—এ সবকিছু ভারসাম্যময় ও স্বাতন্ত্র্যশোভিত ছিলো। তাঁর কাজের মধ্যে কখনও নিম্নগতি আবার কখনও উর্ধ্বগতি হতো না। কাজের অবস্থার বিভিন্নতায় কখনও অতিরিক্ততা আবার কখনও স্বল্পতা ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হতো না। তিনি কখনও উম্মতের সৌজন্য, শালীনতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিতে উদাসীন হতেন না। সর্বদাই তাদেরকে পরিচালনা, পথপ্রদর্শন ও যত্ন নেয়ার ব্যাপারে মশগুল থাকতেন। তারা উত্তম আমল থেকে কখনও গাফেল হয়ে যায় কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যায় কিনা এ আশংকায় কঠিন কোনো ইবাদত চাপিয়ে দিতেন না অথবা সর্বদাই করার জন্য বলতেন না। হুজুর (সঃ) সর্বাবস্থায় সব কাজের জন্য প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমন সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধের আসবাবপত্র প্রস্তুত রাখতে উৎসাহ দিতেন। শুধু তাই নয়, এগুলির সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতেন। হক বা অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য করতেন না এবং এসব ব্যাপারে অতিরঞ্জিত কিছু করতেন না। সর্বদাই হক প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার মধ্যে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এবং সোহবতগ্রহণকারী হজরতগণ সকলেই ছিলেন সৎকর্মশীল। এ মহান দরবারে অধিকতর মর্যাদাবান এবং নৈকট্য লাভকারী তাঁরাই হতেন, যাঁরা ছিলেন আপামর মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণকামী।

সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তযা (রাঃ) কে হুজুর আকরম (সঃ) এর দরবারের নিয়ম কানুন ও আদব সম্মান কি রকম ছিলো, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গে তাঁর সাহচর্য কি রকম ছিলো এ সম্পর্কেও আমি আমার ওয়ালেদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, হুজুর আকরম (সঃ) উঠতে বসতে এমনকি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার জিকিরে রত থাকতেন। যখন কোনো মজলিশে যোগদান করতেন, যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। কোনো উঁচু আসন বা বিশেষ কোনো স্থানে বসার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। নিজের বসার জন্য বিশেষ কোনো জায়গা নির্ধারিত করে রাখতেন না। তিনি উম্মতকেও এরূপ শিক্ষা প্রদান করতেন। উঁচু আসন বা বিশেষ স্থানের আকাংখা করতে নিষেধ করতেন। হুজুর আকরম (সঃ) স্বীয় অনুগ্রহ, আত্মিক মনযোগ ও লক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে মজলিশের সকলকে ধন্য করতেন। কেউ এরকম মনে করার অবকাশ পেতো যে, অমুক ব্যক্তি হয়তো

তুলনামূলকভাবে রসূল (সঃ) এর নিকট অধিকতর সম্মানিত, অধিকতর নৈকট্যপ্রাপ্ত বা তাঁর সাহচর্যে অধিকতর ধন্য। তিনি মানুষ যোগ্যতা ও অবস্থা অনুসারে গুরত্ব প্রদান করতেন। কোনো লোক যে কোনো প্রয়োজনে হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে আসার পর প্রয়োজন মিটে গেলেও চলে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন না বরং স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। এমন কি তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদেরকে রেখে কোথাও বেরও হতেন না। কেউ যদি তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইতে বা কোনো প্রয়োজন নিয়ে উপস্থিত হতো, তিনি তাঁদেরকে মানা করতেন না বা ফিরিয়ে দিতেন না। বরং প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। আর ঐ সময় প্রয়োজন মিটানোর মতো কোনো কিছু যদি না থাকতো, তাহলে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তার মন জয় করার পর মিষ্টিকথা বলে তাঁকে বিদায় করতেন। এরকম মহিমান্বিত স্বভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে হুজুর আকরম (সঃ) এর আখলাক অধ্যায়ের দানশীলতা ও মহানুভবতা অধ্যায়ে। তিনি সমগ্র মানুষের জন্য পিতৃতুল্য ছিলেন। অধিকারের দিক দিয়ে সকলেই তাঁর নিকট সমান ছিলো। তাঁর মজলিশ ছিলো বিদ্যা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মজলিশ। উক্ত মহতী মজলিশে উচ্চস্বরে কোনো আওয়াজ হতোনা। অবৈধ ও অশালীন কোনো কথাবার্তাও হতো না। মজলিশে অংশগ্রহণকারীগণের ভিতরে কখনও কারও দ্বারা কোনো অশোভন তৎপরতা ঘটে গেলে তিনি তা প্রকাশ করতেন না। মোটকথা, মানবীয় স্বভাবপ্রসূত কোনোরূপ অশোভন কাজ যদি কারও দ্বারা সম্পাদিত হয়েই যেতো তাহলে সে ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখা হতো। মজলিশের সকল সদস্য পরস্পরে মুওয়াফেক ও সমান ছিলেন। বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল থাকতেন। আর বড়দেরকে ছোটরা সম্মান করতেন। দরিদ্র অভাবীদের প্রতি সকলেই আত্মত্যাগী ছিলেন। অসহায় ও মোসাফিরদের প্রতি সকলেই ছিলেন যত্নবান।

صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالى عنهم

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুজুর আকরম (সঃ) এর মহান চরিত্র ও মহিমান্বিত গুণাবলী

আখলাক শব্দটি 'খুলুকুন' এর বহুবচন। খুলুকুন خُلُق এর 'খ' বর্ণ পেশ যোগে পড়লে অর্থ হবে অভ্যন্তরীণ চরিত্র। আর খালকুন خَلْق এর 'খ' বর্ণে যবর দিলে অর্থ হবে বাহ্যিক আকৃতি। অভিধান গ্রন্থে খুলুকুন এর 'খ' বর্ণে পেশ, লাম বর্ণে পেশ বা ছাকিন—এর অর্থ হচ্ছে স্বভাব, তবিয়ত। 'সাররাহ' নামক গ্রন্থে খুলুকুন এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যেমন সুন্দর আচরণ, বীরত্ব, আনন্দদায়ক ব্যবহার, ভালো ব্যবহার ইত্যাদি। তবে হুজুর আকরম (সঃ)এর শানে যে আখলাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ এর চেয়েও অধিক, ব্যাপক ও প্রশস্ত। তাঁর আখলাকে শরীফা উপরোক্ত অর্থ সমূহের মিলিত অবস্থারও উর্ধে ছিলো। তিনি যেখানে মুসলমানদের প্রতি ছিলেন দয়াময়, স্নেহময়, ঠিক সেখানে হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, প্রমাণ স্থাপনের ক্ষেত্রে কাফেরদের প্রতি ছিলেন কঠোর।

জ্ঞানীগণের নিকট 'খুলুক' এর অর্থ এমন যোগ্যতা যার মধ্যে সহজ ও অবলীলাক্রমে কর্মের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 'খুলুক' শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এতে মতানৈক্য আছে যে, 'খুলুক' বা চারিত্রিকগুণ মানুষের স্বভাবজাত, প্রকৃতিগত, জন্মগত স্বভাবের অন্তর্ভূত নাকি এটা একটি অর্জনযোগ্য বিষয় যা বান্দা রিয়াযত মুজাহাদা, অর্জন ও প্রজ্ঞার দ্বারা লাভ করে নেয়। এটা যে একটি জন্মগতগুণ, তার প্রমান হচ্ছে হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) এর এই হাদীছ, নবী করীম (সঃ) এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের আখলাককে তোমাদের মধ্যে এরকম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যে রকম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমাদের রিযিক (বুখারী)। তিনি আরও এরশাদ ফরমান, 'তোমাদের কাছে যদি এ সংবাদ আসে যে পাহাড় তার স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, তাহলে তা তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু যদি এ সংবাদ পাও যে অমুক ব্যক্তি

তার স্বভাবও পরিবর্তন করে ফেলেছে— তাহলে এ সংবাদ গ্রহণ করোনা। হাঁ, এর পরও আল্লাহ্তায়ালার এখতিয়ারে সবকিছুই।

এটা স্থিরিকৃত যে, বিভিন্ন মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কিছু লোক তো এমন আছে, যাদের কতিপয় আখলাক এত সুদৃঢ় ও মযবুত যে, তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়াটা কষ্টসাধ্য। সেগুলো বর্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। কঠিন রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে যদি ঐ সমস্ত অবস্থাকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয় এবং তাকে প্রশংসনীয় অবস্থায় নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে, তবে হয়তো পরিবর্তন করা সম্ভব হতেও পারে। কতিপয় আখলাক তুলনামূলক ভাবে দুর্বল ও কমজোর হয়ে থাকে, যা চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়ে যায়। আবার কতিপয় থাকে শক্তিশালী যা চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে দুর্বল হয়না। আখলাক সুন্দর করার জন্য শরীয়তে তাগিদ করা হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে মানুষের আখলাক সুসজ্জিত করার জন্য এবং তাদেরকে হেদায়েত দেয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। আখলাক পরিবর্তন করা যদি সম্ভব না হতো তাহলে মানুষকে উত্তম রূপে গঠন করা এবং নবী প্রেরণ করার সার্থকতা কোথায়? দোয়া মাছুরায় বর্ণিত হয়েছে, হে আল্লাহ্! তুমি যেরকম আমার গঠনকে সুন্দর করেছো সেরকম আমার আখলাক বা চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও। অন্য এক হাদীছে এসেছে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম আখলাকের সন্ধান দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ তো উত্তম আখলাকের সন্ধান দিতে পারে না। আর বদ আখলাক আমা থেকে ফিরিয়ে নাও। বস্তুত, তুমি ভিন্ন আর কেউ তো বদ আখলাক অপসারিত করতে পারে না। —এসমস্ত হাদীছ উম্মতের তালীম ও তালকীনের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

শায়খ আব্দুল কায়সের বর্ণিত হাদীছে আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করলেন, হে আব্দুল কায়স। তোমার দু'টি স্বভাব আল্লাহ্তায়ালার নিকট বড়ই প্রিয়। একটি হচ্ছে সহিষ্ণুতা আর অপরটি আত্মমর্যাদা। একথা শুনে তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ স্বভাব দুটি আমার মধ্যে আগে থেকেই আছে? নাকি নতুন সৃষ্টি হলো? হুজুর (সঃ) বললেন, আগে থেকেই আছে। একথা শুনে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি, তিনি আমার মধ্যে প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে এমন স্বভাবদ্বয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তিনি নিজেই পছন্দ করেন।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের কতিপয় আখলাক প্রাকৃতিক এবং জন্মগত। আবার এমন কতিপয় আখলাকও আছে যা মানুষের সংকল্প সাপেক্ষ এবং অর্জনযোগ্য।

আখলাক সম্পর্কিত এরকম বৈপরীত্যের সমাধান এভাবে করা যায় যে, যে সমস্ত আখলাক, সাহচর্য ও অভ্যাসের কারণে অর্জিত হয় সেগুলির পরিবর্তন ও রূপান্তর সহজসাধ্য। কিন্তু যে সকল আখলাক প্রাকৃতিক, স্বভাবগত এবং স্থায়ী, সেগুলির পরিবর্তন সাধন করা দুরূহ ব্যাপার। তবে সম্ভাব্যতার সীমানার বাইরে—এমনটি বলা যায় না। আল্লাহ্‌পাক ভাল জানেন।

এরূপ আকিদাবিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীন আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম এর আকৃতি ও প্রকৃতিতে সুন্দর চরিত্র, প্রশংসনীয় গুণাবলী, যাবতীয় পূর্ণতা ও মর্যাদা এবং সার্বিক সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিলো। এ কারণে তাঁরা সমগ্র মানবজাতি তথা প্রতিটি মানবসন্তানের উপর অগ্রগণ্য ও বিশেষত্ব লাভ করেছিলেন। সম্মানের দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন সকলের ঊর্ধে। মর্যাদায়ও তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ঐ মহান হজরতগণের মর্যাদা ও মাকাম কতোই না ঊর্ধে হতে পারে যাঁদেরকে হক সুবহানাহুতায়ালা স্বয়ং পছন্দ করে, বাছাই করে, মনোনীত করে তাঁর কিতাব কুরআনে পাকে তাঁদের ফযীলত ও প্রশংসার কথা উল্লেখ করেছেন। সালাতুল্লাহে ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাঈন।

আকায়েদ শাস্ত্রের সুসাব্যস্ত মাসআলা এই যে, কোনো ওলী কোনো নবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। শায়খ ইমাম হাফিযুদ্দীন নসফী (রঃ) তফসীরে মাদারেকে উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো লোক ওলীকে নবীর উপর মর্যাদা দেয়ার কারণে পদস্খলিত হয়ে গিয়েছে। এটা প্রকাশ্য কুফুরী—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হাঁ, আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্য নবী রসূলগণকে একে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মর্মে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, 'ঐ রসূলগণকে আমি একে অপরের উপর মর্যাদা প্রদান করেছি।'

কাযী আয়ায মালেকী (রঃ) স্বীয় কিতাব "আশ্‌শেফা" তে উল্লেখ করেছেন, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম এর আখলাকে কারীমা ছিলো প্রকৃতিগত ও জন্মগত। কোনোটিই অর্জিত ছিলো না। সেগুলি তাঁরা আমলের মাধ্যমে অর্জন করেননি। বরং প্রথম সৃষ্টি ও মৌলিক স্বভাবের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো। কোনোরূপ রিয়াযত ও মেহনতের দ্বারা তা অর্জন করেননি। ঐ আখলাকসমূহ সবই ওজুদে এলাহীর মনোনয়ন ও তাঁর অসীম ফযল ও অনুগ্রহের ফয়েয থেকে আগত। যেমন জনৈক কবির ভাষায়, আল্লাহ্‌তায়ালা বুযুর্গ ও বরকতময়। কোনো নবীর ওহীই অর্জনীয় নয় এবং কোনো নবীকেই গায়েবের সংবাদ প্রদান করার ব্যাপারে অপবাদ দেয়া যায় না।

এই কবিতাংশে যে ওহীর উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ নবুওয়াত ও রেসালাত। যা ওহী এলকা করার এবং হেকমতের উৎস ও প্রস্রবন স্বরূপ।

কতিপয় নবী (আঃ) এর বাল্যকালীন অবস্থা

কোনো কোনো নবীর আখলাকে কারীমার বহিঃপ্রকাশ বাল্যবেলাতেই ঘটেছিলো। তাঁরা যে নবুওয়োতর পদবীতে ভূষিত হবেন তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো বাল্যকাল থেকেই। যেমন হজরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আমি তাকে বাল্যকালেই হেকমতসমূহ প্রদান করেছি।' হজরত ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে এরকম বর্ণিত আছে যে, তাঁর বয়স যখন দুই বা তিন বৎসর, তখন সমবয়সী ছেলেরা তাঁকে বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে খেলাধূলায় অংশগহ্ণ করেন না কেনো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালাতো আমাকে খেলাধূলা করার জন্য সৃষ্টি করেননি। আয়াতে কারীমার তফসীরে একথা বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) এ সম্পর্কে তাসদীক (সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া) করেছিলেন, যখন তার বয়স ছিলো তিন বৎসর। তিনি তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন যে, তিনি (ঈসা আঃ) আল্লাহ্র কালেমা এবং রূহ। হজরত ঈসা (আঃ) দোলনায় থাকা অবস্থায় বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র বান্দা, আমাকে আল্লাহ্তায়ালা কিতাব দান করেছেন এবং নবুওয়াত প্রদান করেছেন।' হজরত সুলায়মান (আঃ) অন্যান্য শিশুদের মতো যখন শৈশবকাল অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি ফতওয়া প্রদান করতেন। আল্লামা তিবরী (রঃ) বলেন, উন্নান রাজত্ব যখন তিনি পরিচালনা করতেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র বারো বৎসর। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কেও কুরআনে মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, 'নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম (আঃ) কে প্রথম থেকেই রুশদ অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির সঠিকতা প্রদান করেছিলাম।' এ আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, আমি তাকে বাল্যকালেই হেদায়েত প্রদান করেছিলাম। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর সময় ফেরেশতাগণকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে একথাটি জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—'অন্তর দিয়ে আমার পরিচয় অর্জন করো এবং জিহ্বা দিয়ে আমার জিকির করো।' তদুত্তরে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, মনপ্রাণ দিয়ে আমি কবুল করলাম। নমরুদ যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো, তখন তাঁর বয়স ছিলো ষোল বৎসর। হজরত মুসা (আঃ) যে ফেরাউনের দাড়ি ধরে টান দিয়েছিলেন, তাও এরকম বয়সেই হয়েছিলো। হজরত ইউসুফ (আঃ) কে যখন তাঁর ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করেছিলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর

কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলেন, তাও এ বয়সেই। আমাদের প্রিয় আকায়ে নামদার হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) তাঁর জন্মের সময় দুখানা হাত ও মাথা মুবারক আকাশের দিকে উত্তোলন করে রেখেছিলেন। এটি তো একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, জাহেলী যুগের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি জীবনে আমি দু'বারের বেশী আকর্ষণ বোধ করিনি। কিন্তু সে সময়েও আল্লাহ্তায়ালা আমাকে রক্ষা করেছেন। প্রথম জীবন থেকেই আমার অন্তরে মূর্তি পূজা এবং (অশ্লীল) কবিতা আবৃত্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো।

বাল্যবেলা থেকে আম্বিয়া কেরামকে আখলাকে হাসানার বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। এরপর রেসালত ও নবুওয়াতের কার্যাবলী দিয়ে তাঁদেরকে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছে এবং অনবরত প্রভুর তরফ থেকে পবিত্র সুবাস এসে তাঁদেরকে সুবাসিত করেছে। এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নত মর্যাদা এবং কামালিয়াতের শেষ স্তর লাভ করে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন। এসবই তাঁরা লাভ করেছিলেন মেহনত, রিয়াযত ও কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'যখন আকল পূর্ণতায় পৌঁছে দৃঢ়তা অর্জন করলো, তখন আমি এলেম ও হেকমত দান করলাম।'

নবী রসূলগণের উপরোক্ত গুণাবলীর অংশবিশেষ কোনো কোনো ওলীরও হাসিল হয়ে থাকে। তবে তাঁদের সমস্ত গুণাবলী অর্জন করা ওলীগণের পক্ষে সম্ভব নয়। আর ইসমত (গোনাহ্ থেকে নিরাপত্তা) তো কেবল নবী রসূলগণের জন্যই খাছ।

বিভিন্ন গুণাবলীতে যাবতীয় আখলাক ও খাসলত, সিফাতে জামালী ও জালালী ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব এতো উন্নত, উত্তম, পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর, সুদর্শনীয়, উজ্জ্বল ও সদৃঢ় ছিলো যে, তা ছিলো সীমার অতীত, সংখ্যার ঊর্ধে ও ধারণক্ষমতার বাইরে। পরিপূর্ণতার কুদরতের ভাণ্ডার ও সম্ভাব্যতার স্তর বলতে যা অনুমিত হয়, ঐ সমুদয়েরও উপস্থিতি তাঁর মধ্যে ছিলো। সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীন ছিলেন চন্দ্রতুল্য আর তিনি ছিলেন সেই চন্দ্রের উপর কিরণ সঞ্চারণকারী সূর্য। তাঁরা সকলেই ছিলেন হুজুর আকরম (সঃ) এর নূরে জামালের প্রতিবিম্বের আধার।বস্তুত আল্লাহ্তায়ালার জন্যই সমস্ত সৌন্দর্য। ইমাম বুসিরী (রঃ) কি সুন্দর বলেছেনঃ

সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীন যে সকল মোজেযা সহকারে দুনিয়াতে এসেছেন এসব কিছুই তাঁদের কাছে এসেছে হুজুর আকরম (সঃ) এর নূরে জামাল থেকে। বস্তুতঃ তাঁরা সকলেই ছিলেন হুজুর আকরম (সঃ) এর নূরে

জামালের প্রতিবিম্বস্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনিই হলেন ফযীলতের সূর্য। আর অন্যান্য নবীগণ হলেন নক্ষত্রতুল্য। আর নক্ষত্রের আলোর বহিঃপ্রকাশ তো ঘটে তখনই যখন সূর্য থাকে অনুপস্থিত। হুজুর পাক (সঃ) সাগর তুল্য। সাগরের সীমাহীন জলরাশি থেকে অন্যেরা যেনো অঞ্জলি পেতে কিছু আহরণ করে নিচ্ছেন। অথবা তিনি হলেন মুষলধারার বৃষ্টি যা থেকে কেউ এক চুমুক গ্রহণ করে কণ্ঠনালী সিক্ত করে নিচ্ছে।

হুজুর আকরম (সঃ) এর সত্তায় আল্লাহ্তায়ালা যে মর্যাদাময় আখলাক ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটিয়েছেন, তার আধিক্য, দৃঢ়তা ও মহত্বের প্রশংসা কুরআনে কারীমে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আপনার উপর আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ সুমহান।' হুজুর পাক (সঃ) স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'উত্তম আমলের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।' আয়াতে কারীমা ও হাদীছের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র সত্তায় সকল সৌন্দর্য ও উত্তম আখলাক সন্নিবেশিত ছিলো। আর কেনোই বা এরকম হবেনা? তাঁর শিক্ষক যে ছিলেন স্বয়ং রব্বুল ইয্য্ত, যিনি সমস্ত এলেমের উৎস।

পবিত্র স্বভাবের এক ঝলক

সাইয়্যেদাতুনা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা তাঁকে হুজুর পাক (সঃ) এর আখলাকে কারীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর আখলাক ছিলো পবিত্র কুরআন। হাদীছখানার বাহ্যিক অর্থ এইরূপ—কুরআনে কারীমে যতো উত্তম আখলাক এবং প্রশংসনীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সে সমস্ত গুণে ভূষিত ছিলেন। কাযী আয়ায (রঃ) 'আশশেফা' গ্রন্থে এর অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন, কুরআনের পছন্দই ছিলো তাঁর পছন্দ আর কুরআনের অসন্তুষ্টিই ছিলো তাঁর অসন্তুষ্টি। মোট কথা, হুজুর পাক (সঃ) এর সন্তুষ্টি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে, আর তাঁর অসন্তুষ্টি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায়। উপরোক্ত হাদীছের মর্মার্থ এরকমই যা উল্লেখ করা হয়েছে।

'আওয়ারেফুল মাআরেফ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর উক্ত হাদীছের মর্মার্থ ছিলো এইরূপ—কুরআনে কারীম ছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর মার্জিত চরিত্র। 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' এর গ্রন্থকার হজরত শায়েখ এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার

সারকথা এইরূপ—হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে শয়তানের হিস্সাকে নিষ্ক্রান্ত করার পর তাকে ধৌত করে পবিত্র করা হয়েছে। এরপর তাঁর পবিত্র প্রবৃত্তিকে মানবীয় বৈশিষ্ট্যময় প্রবৃত্তির পরিসীমায় এনে স্থির করা হয়েছে। তারপর উক্ত প্রবৃত্তির মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এই পরিমাণ অবশিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে, যা কুরআন নাযিলের উপযোগী হয়। কেননা নবীতো ঐ মহামানবই হতে পারেন, যাঁর মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। পূর্ণ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীত যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো তা বের করে দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত গুণাবলী আদব ও শালীনতাময় তথা নবুওয়াতের শানের উপযোগী তা অবশিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে মাখলুকাতের উপর রহমত বর্ষণ ও উম্মতের আখলাখ-চরিত্রকে মার্জিত করার মাধ্যম হয়। মর্মার্থ এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর মধ্যে কতিপয় মানবীয় গুণাবলী এজন্য অবশিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ তাঁকে তাদের নিজের আকৃতি ও স্ব-শ্রেণীভুক্ত দেখতে পায় যাতে তাঁর প্রতি তাদের মহব্বত ও আকর্ষণ জন্মে।

হুজুর (সঃ) যদি নিরেট ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হতেন, তা হলে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যেতো এবং নবীর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হতোনা। ফলে মানুষ দূরে সরে যেতো। কাজেই রসূল (সঃ) এর মধ্যে মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য মাখলুকাতের জন্য রহমত ও উম্মতের আখলাক মার্জিত হওয়ার কারণ বটে। একারণেই মানবীয় প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে মানবীয় গুণাবলীর মূল প্রবিষ্ট করণের মাধ্যমে অধিক যুলমত ও ঘনত্ব প্রদান করা হয়েছে। এবং ইমান ও ইসলামের মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করে দিয়ে ইমানকে কলবে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, তোমার অন্তরকে এ কুরআনের এর মাধ্যমে প্রশান্ত করে দেয়ার জন্য আমি তা নাযিল করেছি। আর কলবে প্রশান্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় এযতেরাব বা চাঞ্চল্যকর অবস্থার পর। কেননা প্রবৃত্তির তৎপরতা তার গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যই কলব ও নফসের মধ্যে একটি সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে।

যেমন হুজুর আকরম (সঃ) এর সম্মানিত ব্যক্তিত্বে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিলো তখন, যখন তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ করা হয়েছিলো এবং নূরানী চেহারা রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছিলো। ঐ সময় তিনি মনের খেদ এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তারা সংশোধিত হতে পারে কীভাবে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তরঞ্জিত করে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে

তাদের প্রভুর দিকেই আহ্বান করছেন। ঐ সময় আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পবিত্র কলবকে 'ছাবেতা' অবস্থা প্রদানের উদ্দেশ্যে নাযিল করলেন, 'বন্ধু হে! একাজের ব্যাপারে আপনার উপর কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে, সকলকেই আপনি সংশোধন করে ফেলবেন।' এরপর নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র হৃদয় ছবরের পরিচ্ছদ পরিধান করলো। এযতেরাব (চাঞ্চল্য) এর হাল থেকে সকুনত (প্রশান্তি) এর হালে উপনিত হলো। এরকম বিভিন্ন অবস্থা ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হতে থাকলো এবং তাঁর পবিত্র কলবকে অধিকতর পরিমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন করা হতে লাগলো। এমনকি কুরআনুল কারীম তাঁর আখলাকে রূপান্তরিত হলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বাণীর (কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র) মর্মার্থ এটাই। তবে প্রকৃত অবস্থা এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর মাকামের হাকীকত এবং মহান অবস্থার নিগুঢ় রহস্য পর্যন্ত পৌছতে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁর মহান মর্যাদার নিগুঢ়ত্ব কেবল আল্লাহ্পাকই জানেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালার যাতে পাকের রহস্য সম্পর্কে হুজুর আকরম (সঃ) এর মতো আর কেউ অবগত হতে পারেননি। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, উহার তাবীল আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না।

কবির ভাষায় ঃ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রকৃত কদর ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। যেমন, হুজুর আকরম (সঃ) ছাড়া আল্লাহ্তায়ালাকে কেউ চিনতে পারেনা। তার মাকাম বা মর্যাদা যেহেতু সর্বাধিক উন্নত, কাজেই সে সম্পর্কে অবহিতি লাভ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির উর্ধে।

কবির ভাষায় ঃ

'তিনি যেরকম, হুবহু সেরকম কি কোথাও কোনো চক্ষু দেখতে সক্ষম হবে? প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধি ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে বুঝার জন্য চেষ্টা করে থাকে।'

হাদীছের মর্মার্থ আলোচনায় অনেককিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তাঁর শান ও মর্যাদা অনুধাবন পরিসীমার বাইরে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাঁকে অনুভব করা যায় অর্থাৎ বাহ্যিক দেহ মুবারককে চর্মচক্ষু দ্বারা অবলোকন করা সম্ভব, তবে দৃষ্টিশক্তির ধারণ ক্ষমতার উর্ধে এটা নিশ্চিত। যেমন, একটি বিশাল পর্বত দৃষ্টি সীমার

বেষ্টনীতে আসে না। যদি বলা হয় তিনি বোধগম্য অর্থাৎ আকলের মাধ্যমে তাঁকে বুঝা যায়। তবে এটা নিশ্চিত আকল কিন্তু তাঁকে পূর্ণভাবে লাভ করতে অক্ষম। যেমন আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। আল্লাহ্তায়ালা যেখানে তাঁর আখলাকের বিশেষণে আমীন (মহান) শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর জন্য যে মর্যাদা নিরূপণ করেছেন, সেখানেও আমীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তাঁর মহত্বের নিগুঢ়তা সম্পর্কে ধারণা করতে অভিজ্ঞান অক্ষম হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এতে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রশংসনীয় আখলাখ ও সুন্দর গুণাবলী সবই সৃষ্টিগত; মৌলিক ও প্রাকৃতিক। তাঁদের এ মহান আখলাক অর্জন করার ব্যাপারে কোনোরূপ চেষ্টা সাধনা বা রিয়াযতের কোনোরূপ ভূমিকা নেই। এর কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। বিশেষ করে সাইয়্যেদুনা জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর ব্যাপারে তো এর কোনো প্রশ্নই আসেনা। যেহেতু তিনি সুমহান আখলাক ও প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত ও মার্জিত হয়েই দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। যেমন কবি বলেছেন-

'তাঁকে তালীম ও আদব শিক্ষা দেয়ার কিইবা প্রয়োজন? যেহেতু তিনি নিজেই শিক্ষক হয়ে তাশরীফ এনেছেন।'

তাঁর মর্যাদার পর্দায় কোনোরূপ রূপান্তর ও পরিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই। তাঁর এমন কিছু কিছু আহ্কাম ও কীর্তি রয়েছে, যাতে সৃষ্টিগত মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় না। সেগুলিও বিশেষ স্থান ও অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত। মাহাত্ম অনুধাবন করার ব্যাপারে মানুষের অনুমান সে পর্যন্ত ভ্রমণ করতে অক্ষম। তাঁর হাকীকত সম্পর্কে রাব্বুল ইয্যতই অবহিত আছেন। যেমন কবির ভাষায় 'ধারণার গণ্ডিতে আনয়ন করা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে।'

এ প্রসঙ্গে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যখন হুজুর আকরম (সঃ) এর দান্দান মুবারক শহীদ হলো। মাথা মুবারক যখম হয়ে নূরানী মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরামের নিকট এ দৃশ্য বড়োই হৃদয়বিদারক ছিলো। তাঁরা নিবেদন করতে লাগলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ) আপনি এদেরকে বদ দোয়া করুন যাতে এরা কৃতকর্মের যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করে। করুণার সিন্ধু মহান রসূল এরশাদ করলেন, আমাকে তো বদ দোয়া ও অভিসম্পাতকারী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি। বরং আল্লাহ্র মাখলুককে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক করে দিতে এবং তাদেরকে দয়া ও ভালোবাসা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তখন তিনি

তাদের উদ্দেশ্যে এ দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্। আমার কাওমকে তুমি হেদায়েত দান করো, তাদেরতো জ্ঞান নেই।' এক্ষেত্রে মহান রসূল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। কোথায় চিন্তা? কোথায় ক্লেশ? বিচলিত হওয়ার বিন্দুমাত্র চিহ্ন তাঁর মধ্যে নেই।

শায়েখ সাহেব 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' গ্রন্থে যে উল্লেখ করেছেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর মহান সত্তায় প্রথমে হরকত, বিচলিত অবস্থা এবং অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিলো। অতঃপর আয়াতে কারীমা অবতরণের মাধ্যমে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচ্ছদ পরিধান করানো হয়েছে। ফলে, তাঁর অভ্যন্তরে প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার আবির্ভাব ঘটেছে। এই মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করতে ভীত সন্ত্রস্ত। যদিও এগুলি এলমী নীতিমালার কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, তবুও হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি আদব প্রদর্শনের শানের পরিপন্থী। উপরোক্ত বক্তব্যের কাছাকাছি তিনি আরও বলেছেন যে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর كان خلقه القران হাদীছ খানা এক গভীর রহস্যের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর চরিত্র আখলাকে রব্বানীর বাহ্যিক রূপায়ণ। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আল্লাহ্তায়ালার আযমত বা মহত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি এরূপ বলতে চেয়েছেন যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর মহান আখলাক আখলাকে এলাহীরই প্রকাশস্থল। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মহান আল্লাহ্তায়ালার জালালাতে শানের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন যে, তিনি (সঃ) আল্লাহ্তায়ালার আখলাকে রঞ্জিত হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। কাজেই তিনি উক্ত বক্তব্যটির ভাব এভাবে ব্যক্ত করেছেন, কুরআন ছিলো তাঁর চরিত্র। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রতি লজ্জাশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রকৃত অবস্থাকে সূক্ষ্ম রূপকতার মাধ্যমে গোপন রেখে এভাবে বলেছেন। এটা তাঁর আকলের পূর্ণাঙ্গতা ও আদবের পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। অপরপক্ষে, উক্ত বর্ণনাখানি হুজুর আকরম (সঃ) যে সুমহান ও সীমাহীন সুন্দর আখলাকের অধিকারী ছিলেন সেদিকেও ইঙ্গিত করছে।

কোনো কোনো উলামা এরূপ বলেন, কুরআন পাকের অর্থ ও তাৎপর্য যেমন সীমাহীন, হুজুর আনওয়ার (সঃ) এর নূর, কীর্তি, আখলাকে হাসানা ও আওমাকে জামীলা এসবও ঠিক তদ্রূপ সীমাহীন। তাঁর মহৎ আখলাক ও তাঁর সৌন্দর্যাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিটি হালেই সজীবতা ও নবতর ভঙ্গিতে

আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যে এলেম ও মারেফত তাঁকে প্রদান করেছেন, তার প্রকৃত পরিচয় আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর কোনো আংশিক গুণাবলীকেও জ্ঞানের আওতায় বেষ্টন করার মানসে অগ্রসর হওয়া কোনো দুর্লভ বস্তুকে অর্জন করার ব্যর্থ প্রয়াস তুল্য। ওয়াল্লাহু আ'লামু।

হুজুর পাক (সঃ) এর এরশাদ (আমার কলব কখনও কখনও তমসাচ্ছন্ন হয়) এর তাৎপর্য সম্পর্কে জনৈক আরেফকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর এ অবস্থাটির হাকীকত কি? তিনি এর জবাবে বলেছিলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর কলবে আতহার এবং তার তমসা সম্পর্কে প্রশ্ন না করে যদি অন্য কারও সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, তাহলে আমি এর যথাযথ উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হতাম। কিন্তু এখানে যে তমসার কথা বলা হয়েছে, তার হাকীকত উদঘাটনে আমি অক্ষম। এ হাদীছখানার ব্যাখ্যা 'মারাজাল বাহরাইন' নামক পুস্তিকাতে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কুদরতের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নবী করীম (সঃ) এর মধ্যে আন্দোলন ও তাজাল্লির সৃষ্টি করতো। আন্দোলন ও তাজাল্লী তাঁকে এক হাল থেকে অন্য হালে নিয়ে যেতো। শরীয়তের বিধানের মধ্যে নাসেখ ও মানসুখ হওয়া তার একটি শাখাস্বরূপ। হুজুর আকরম (সঃ) সব সময় সব অবস্থায়ই উন্নতি ও পূর্ণতার মধ্যে থাকতেন। কোনো সুমহান হাল থেকে কখনও অবনতি ও নিম্নগতি কখনও তাঁর সত্তায় স্থান পেতো না। তবে হাঁ, অই সমস্ত উন্নত হালগুলির মধ্যে কোনো কোনো হাল অধিকতর উন্নত ও পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমস্ত নবীগণই কামেল ও মাসুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের কাউকে কাউকে অপরের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হুজুর আকরম (সঃ) এর আমল, আনুগত্য ও ইবাদত—এসব শুধুই যে তাঁকে তালীম দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং শরীয়তের অনুকূলে তাঁকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর আরোপিত হয়েছিলো, এমনটি নয়। (বরং এগুলি আরোপিত হয়েছিলো তাঁর উম্মতকে তালীম দেয়ার উদ্দেশ্যে)। আমল, আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে যে নূর ও নমুনা উদ্ভাসিত হয়ে থাকে তা যে হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না এমনটি নয়। বরং সেগুলি পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে বিরাজ করছিলো। নবুওয়াত ও তার মাকামসমূহ প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দান বৈ-তো নয়। এটা এসতেফা (মনোনয়ন) ও এজতেবা (নির্বাচন) এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এতে কোনোরূপ অর্জন ও রিয়াযতের (সাধনার) দখল নেই। এটা নিরন্তর আসরার (ভেদসমূহ) ও আনওয়ার (নূরসমূহ) এর বহিঃপ্রকাশ। অনবরত ও

ধারাবাহিক ওরুদ (ঐশীবাণী অবতরণ) ও জিকির এর উপর নির্ভরশীল। কুরআন অবতরণ, রব্বানী তালীম, রহমানী আদব ও প্রভুপ্রদত্ত আদেশ নিষেধ—এসব হচেছ সমস্ত কামালাত অর্জনের কফীল বা জিম্মাদার, সমগ্র নূরের বহিঃপ্রকাশের জামিন। ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় স্বভাবকে (নবীকরীম (সঃ) এর শানে) প্রমাণ করা ঠিক নয়। কারণ এটা মানুষের দৃষ্টিশক্তির যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত।

'কানাখুলুকুহুল কুরআন' হাদীছের ব্যাখ্যায় যদি বলা হয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে কুরআনের মাধ্যমে তাহযীব প্রদান করেছেন। مهذب 'মুহাযযাব' (মার্জিত) বানিয়েছেন। তখন উক্ত তাহযীবের অর্থ হবে— কোনো উচ্চ মাকামে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিম্ন মাকামের কাজে মন্থরতা দেখা দিলে কিঞ্চিৎ সজাগ করে দেয়া। অবহিত করে দেয়া। যেমন হুজুর পাক (সঃ) কখনও কোনো কাজের জন্য আল্লাহ্‌পাকের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বা কোনোকিছু তাঁর স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, আল্লাহ্‌পাক তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এগুলি সেই উচ্চ মাকামে নিমজ্জিত হওয়ার ফলেই হয়েছিলো। উলামায়ে কেরাম বলেন, তা‍্যীবের ব্যাখ্যা যদি এইরূপ করা হয়, তবে নবী পাক (সঃ) এর শানে সে‍া জায়েয রূপে দাঁড় করানোর অবশ্য একটা রাস্তা পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা করলে হুজুর পাক (সঃ) এর উঁচু মর্যাদাকে খর্ব করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে বিপত্তির কারণ হবে, যা কিছুতেই সমীচীন নয়।

অভিধান গ্রন্থে 'তাহযীব' শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'তাহযীব' 'হাযবা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ নম্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সঠিকতা ও শুদ্ধি। 'সাররাহ' গ্রন্থে তাহযীবের অর্থ ধরা হয়েছে মানুষকে পবিত্র করা, যেমন বলা হয়ে থাকে 'পবিত্র মানুষ'। আলোচনাসমূহের সারকথা এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) কে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক পূর্ণতার মাকামে সমাসীন জানতে হবে। তাঁর হাকীকতে হালের রহস্য উদঘাটন করতে অক্ষমতা স্বীকার করা, তাঁর প্রতি আদব সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর জালালত ও শানের অধিক নিকটবর্তী বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তৌফিক দানকারী।

সার্বজনীন রেসালত

হুজুর আকরম (সঃ) এর চরিত্র যেহেতু মহানতম চরিত্র, তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর রেসালতকে শুধু মানব জাতির জন্য সীমাবদ্ধ করেন নি, বরং নিখিল বিশ্বের সমগ্র জ্বীন-ইনসান তথা সমস্ত মাখলুকাতের জন্যই তাঁর রেসালতকে

সাধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার রবুবিয়াত যেমন সমস্ত আলমকে বেষ্টন করেছে, তেমনি আখলাকে মোহাম্মদী (সঃ)ও ওই সমস্ত কিছুকে অধিকার করে নিয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' এর গ্রন্থকার কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সঃ)এর রেসালতের পরিধি ফেরেশতাকুল পর্যন্ত ব্যাপৃত। উলামায়ে কেরামের একটি দল এরূপ মত পোষণ করেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে কুরআনে কারীমের এই আয়াতখানাকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন—'রসূলে পাক (সঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত জগতবাসীকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।' 'আলামীন' শব্দ দ্বারা আকলবিশিষ্ট সকলকেই শামিল করা হয়েছে। ফেরেশতাবৃন্দ যেহেতু আকলবিশিষ্ট সৃষ্টি তাই তাঁদের প্রতিও রসূলে পাক (সঃ) এর রেসালত প্রযোজ্য। উক্ত মতের সপক্ষে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছখানা প্রণিধানযোগ্য। হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে সমস্ত মাখলুকের প্রতি রসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। —অবশ্য কেউ কেউ এরকম মতও পোষণ করে থাকেন যে, হুজুর পাক (সঃ) এর রেসালত কোনো কোনো ফেরেশতার উপর প্রযোজ্য। তাঁদের মতে সে সমস্ত ফেরেশতা, দুনিয়াতে যাঁদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত রাখা হয়েছে। তাঁরা কিছু সংখ্যক ফেরেশতাগণকে বিশিষ্ট করেছেন কেনো তার কারণ স্পষ্ট নয়। কেননা দলীল যা প্রদান করা হয়েছে তা সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে। এখানে বিশিষ্ট হিসাবে সীমাবদ্ধ করার কোনো অবকাশ নেই। আর আল্লাহ্‌তায়ালা যে বলেছেন, আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রসূল করে প্রেরণ করেছি—এটাও বিশেষদের জন্য দলীল নয়। এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে পছন্দনীয় মত হচ্ছে, এটা আম। এদ্বারা কাউকে খাছ করা হয়নি। যদি খাছই করা হয়, তবে তিনি যে জ্বীনদেরও নবী এটা রহিত হয়ে যায়। এরূপ হুকুম এজমার খেলাফ। 'তিনি কতিপয় মানুষের নবী' এ বদ আকীদাটি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এখানে 'সমগ্র মানুষের জন্য' বলা হয়েছে। ইহুদীরা এ ধরনের বদ আকীদায় বিশ্বাসী ছিলো। তারা মনে করতো, হুজুর আকরম (সঃ) কেবল আরববাসীদের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। উক্ত বিশ্বাসকে আরও পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলেছেন, হে রসূল (সঃ) আপনি বলে দিন যে, হে মানবমন্ডলী! আমি আল্লাহ্‌র রসূল। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।—আল্লাহু আ'লামু।

হজরত শায়েখ শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো কোনো মুহাক্কিক আলেম এরকম বলেন যে, মোহাম্মদ

মোস্তফা (সঃ) এর আবির্ভাব জগতের সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের সাথেও সংশ্লিষ্ট। যাদের মধ্যে প্রাণীকুল, উদ্ভিদরাজি ও জড়পদার্থও শামিল। তবে জ্ঞানবিশিষ্ট যারা তাদের প্রতি তাঁর রেসালতের বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে—তাদেরকে শিক্ষা দেয়া, দ্বায়িত্বশীল করা, শুভ সংবাদ প্রদান ও গযবে এলাহীর ভয় প্রদর্শনের নিমিত্তে। আর প্রাণী ও জড় পদার্থ এ সমস্তের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছেন পূর্ণতার ফয়েয পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আপনাকে সমস্ত আলমের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। জড়পদার্থ হুজুর পাক (সঃ) কে সালাম প্রদান করেছে। 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রসূলুল্লাহ্' বলেছে। এটা তাদের পক্ষ থেকে তাঁর রেসালতের স্বীকারোক্তি।

যদি কেউ এরকম প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত, সুসংবাদ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন—এগুলিই তো হচ্ছে রেসালতের কাজ। ফেরেশতাবৃন্দের বেলায় এগুলি কখন সংঘটিত হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে এভাবে প্রদান করা হয়েছে যে, হয়তো এ দাওয়াত মেরাজের রজনীতে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু একাজকে মেরাজ রজনীর জন্য নির্দিষ্ট করারও কোনো কারণ নেই। বরং সবসময়ই তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কেননা হুজুর আকরম (সঃ) এর দরবারে অধিকাংশ সময় ফেরেশতাবৃন্দের আগমন ঘটতো। যেমন হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে জ্বীন জাতি আগমন করতো। তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতেন। জ্বীনদেরকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফেরেশতাদের ব্যাপারে তার উল্লেখ নেই। তার কারণ জ্বীনদের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা ও ফাসাদের তৎপরতা ছিলো। অপরপক্ষে ফেরেশতাদের বেলায় এরকম সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁদেরকে নিষেধ করা বা ভয় প্রদর্শন করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।যেহেতু গোনাহ্ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তারা আল্লাহ্তায়ালার কোনো কথা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

আলমে মালাকুতকে আলমে আমর (আদেশ জগত বা সূক্ষ্ম জগত) বলা হয়। সেখানে নিষেধ বা নিষিদ্ধতার কোনোরূপ অবকাশ নেই। হজরত জিব্রাইল (আঃ) ছাড়াও অন্যান্য ফেরেশতা যে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে আগমন করতেন—এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে আওকাতুন্নবী অনুচ্ছেদে বর্ণনা আছে। যেমন বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে হজরত জিব্রাইল (আঃ) এসেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইসমাইল নামে একজন ফেরেশতা। ইসমাইল ফেরেশতা একলক্ষ ফেরেস্তার সরদার ছিলেন। সে

এক লক্ষ ফেরেশতা প্রত্যেকেই আবার এক লক্ষ ফেরেশতার নেতা ছিলেন। ফাযায়েলে কুরআনের অনুচ্ছেদে সূরা ফাতেহার ফযীলত এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহের ফযীলত সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, একজন ফেরেশতা হাযির হয়েছেন যাঁর সম্পর্কে হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলেছেন, এ এমন এক ফেরেস্তা যে আজকের এদিন ছাড়া পৃথিবীতে আর আগমন করেনি। সুবহানাল্লাহ্। আরও অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর রওযা আতহারের সম্মানার্থে সকাল সন্ধ্যায় সত্তুর হাজার ফেরেশতা আগমন করে থাকেন। যেসমস্ত ফেরেশতা হুজুর পাক (সঃ) এর ওফাতের পর রওযা শরীফে আগমন করে থাকেন তাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় যে আসতেন না এটা কেমন করে কল্পনা করা যায়?

পবিত্র এলেম ও আকল

উপরোল্লেখিত দলীলপ্রমাণ সমূহের আলোকে জানা গেলো যে, নবী করীম (সঃ) এর প্রশংসনীয় আখলাক সুমহান, সর্বাধিক পূর্ণ ও কামেলে মুকাম্মাল ছিলো। আর এ মহান আখলাকের মূল, উৎস ও উৎপত্তিস্থল হলো আকল। কেননা আকল থেকেই এলেম ও মারেফতের লতা-তন্তু অংকুরিত হয়। তা থেকেই সিদ্ধান্ত প্রদানের দৃঢ়তা, তদবীরে, চিন্তা চেতনায় স্বাচ্ছন্দ, পরিণামে বিশুদ্ধতা, নফসের কল্যাণসমূহ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোরতা, সুন্দর শাসন ও প্রতিপালন, সৌন্দর্যের প্রচার প্রসার ও নিকৃষ্ট ও মন্দ স্বভাব চিরতরে পরিত্যাগ—ইত্যাদি গুণসমূহের উদ্ভব হয়।

আকলের হাকীকত কি? এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। অভিধান গ্রন্থে এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে, বস্তু সমূহের ভালো-মন্দ, উৎকর্য-অপকর্ষ, পূর্ণতা ও ত্রুটি ইত্যাদির মূল্যায়ন ক্ষমতাকে আকল বলা হয়। আবার এ সমস্ত মূল্যায়ন করা অনেক সময় শুধু আকলের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। এলেম ও আকলের [(বিদ্যা ও বুদ্ধির) সমন্বিত ফলাফল দ্বারা এটা হাসিল হয়ে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আকল এমন এক শক্তি যা এলেমের উৎস, উৎপত্তিস্থল ও প্রস্রবন তুল্য। আকলের সংজ্ঞায় এরূপও বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের তৎপরতা ও স্থিরতায় প্রশংসনীয় অবস্থার নাম আকল। হাঁ, এটাও আকলের বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্তর্ভূত।

উলামাগণ যে রকম বর্ণনা করেছেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে আকলের সঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে, আকল একটি রুহানী নূর যা দ্বারা এলমে জরুরী (স্বাভাবিক জ্ঞান) ও এলমে বদিহী (যুক্তিনির্ভর জ্ঞান) হাসিল হয়। মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আকলের আবির্ভাব ও অবস্থান সূচিত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তা বাড়তে থাকে এবং পরিণত বয়সে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়।

হুজুর আকরম (সঃ) এর আকল ও এলেমের পূর্ণতার স্তর এমন ছিলো যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সে স্তরে উপনীত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর যে এলেম ও আকলের ফয়েয বর্ষণ করেছেন, তার কতিপয় এমন যে, সে সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষের চিন্তা জ্ঞান স্থবির হয়ে যায়। কেউ যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর অবস্থা, তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী ও সৌন্দর্যময় কার্যাবলী অনুসন্ধান করে, তাহলে তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির উচ্চমান সম্পর্কে হয়তো কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পারবে। তাঁর জামে কালাম, সুন্দর শামায়েল, দুর্লভ ও সূক্ষ্ম আচরণ সমূহ, রাষ্ট্রনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ, শরীয়তের বিধান প্রকাশ ও তার বর্ণনা, মর্যাদামন্ডিত শিষ্টাচার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা,সুন্দর চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, আসমানী কিতাব ও সহীফা সম্পর্কিত জ্ঞান, অতীতের জাতি সমূহের ইতিবৃত্ত, অতীতকাল সমূহের প্রকৃতি, তাঁর কাহিনী ও ঘটনাবলীর বর্ণনা—আরব বেদুইন হিংস্র হায়েনার ন্যায় ছিলো, যাদের স্বভাব চরিত্র, মূর্খতা, অজ্ঞতা, হিংস্রতা ও হতভাগ্যতায় পরিপূর্ণ ছিলো, তাদেরকে তিনি কেমন করে সংশোধন করলেন। তাদের যুলুম অত্যাচার, পীড়া-যন্ত্রণাকে তিনি কেমন করে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন। তিনি চরম নির্যাতনকালে ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তদুপরি তাদেরকে এলেম, আমল ও সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তারপর সেই আরব বেদুইনরা কেমন করে সে সৌভাগ্যের নীতিমালাকে নিজেদের জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছিলো। এককালে তারা যে মহামানবকে অত্যাচারে জর্জরিত করে দিয়েছিলো, সেই মহান রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরবর্তীতে তাঁরা বন্ধু-বান্ধব, সহচর-সহযোগী এমনকি আপন পরিজনকেও বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। এ সমস্ত বিষয়ে যদি কেউ অধ্যয়ন করে তাহলে সে হয়তো অনুধাবন করতে সক্ষম হবে—মহামানব, মহান রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর আকল কতোটুকু পরিপূর্ণ ছিলো। জানতে পারবে যে, মহানবী (সঃ) এর এলেমের মর্যাদা ও স্তর কেমন ছিলো।

কেউ রসূলে আকরম (সঃ) এর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কি পরিমাণ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। বুঝতে পারবে আল্লাহ্তায়ালার ফয়েযের প্রবাহ কি রকম জারী ছিলো তাঁর উপর। অতীত ও ভবিষ্যতের এলেমসমূহ ও বহুবিধ গুপ্তরহস্য সম্পর্কে অবলীলাক্রমে তাঁর যে অবগতি ছিলো, তাতে নির্দ্বিধায় ও নিঃসন্দেহে নবুওয়াতের এলেম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব

হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, 'আপনি যা জানতেন না আল্লাহ্তায়ালা সে সবই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন। অনন্তর আপনার উপর আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ মহান।'

হজরত ওহাব ইবন মুনাববেহ্ তাবেয়ী হাদীছ শাস্ত্রের সনদে নির্ভরশীল এক মহান ব্যক্তিত্ব, মহাসত্যবাদী আল্লামা, হাদীছ শাস্ত্রের বিশেষ পণ্ডিত ও প্রণেতা ছিলেন। তিনি বলেন, উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের একাত্তরখানা কিতাব অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ঐ সমস্ত কিতাবে আমি দেখেছি যে, হক সুবাহানাহুতায়ালা পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে লয়প্রাপ্তি পর্যন্ত সকল মানবমন্ডলীকে যে পরিমাণ আকল ও জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং করবেন, সকলকে যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে এ সমষ্টিভূত জ্ঞান হুজুর আকরম (সঃ) এর আকল মুবারকের একপার্শ্বতুল্য হবে। সারা জাহান যদি মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহলে সে মরুভূমির বালুকারাশির সমতুল্য হবে হুজুর পাক (সঃ) এর এলেম ও আকল। যার একখানা বালুকণা তুল্য হবে সমস্ত জাহানের এলেম ও আকল। আবু নাঈম (রঃ) তাঁর 'হুলিয়া' নামক কিতাবে এবং ইবনুল আসাফির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন।

'আওয়ারেফুল মাআরেফ' গ্রন্থে কোনো কোনো আলেম থেকে এরূপ উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে যে, সমস্ত আকলের একশত ভাগের নিরানব্বই ভাগ আকল হুজুর পাক (সঃ) কে প্রদান করা হয়েছে, আর একভাগ প্রদান করা হয়েছে সমস্ত মুসলমানকে। বান্দা মিসকীন শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবী (রঃ) এর মত এই যে, সমস্ত আকলকে একহাজার ভাগ করে নয়শ নিরানব্বই ভাগই হুজুর পাক (সঃ) কে প্রদান করা হয়েছে, আর একভাগ বাকি সমস্ত মানবকুলকে প্রদান করা হয়েছে, যদি এরূপ বলা হয় তবুও তা যথাযথ হবে। সামান্যও অত্যুক্তি হবেনা। যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) এর অসীম কামালাত ছিলো বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই তাঁর এলেম ও আকলের আধিক্য সম্পর্কে অতিরিক্ত যা কিছুই বলা হবে, তা-ই যথাযথ হবে। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম, 'আমি আপনাকে কাউছার বা সীমাহীন কল্যাণ দান করেছি।'

নবী করীম (সঃ) এর মহান আখলাক সমূহের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যেগুলি মানুষের দৃষ্টিগোচর হতো সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এমর্মে যেসব উদ্ধৃতি পেশ করা হবে তার অধিকাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে 'আশশেফা', 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' 'রওযাতুল আযান' ও 'মাআরেজু ন্নবুওয়াত' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণ

এখন যে আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে, তা হুজুর আকরম (সঃ) এর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মহান গুণাবলী সম্পর্কে। এসব গুণাবলী নবুওয়াতের মহান গুণাবলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর শক্তি ব্যতীত নবুওয়াতের ভার বহন করা সম্ভব নয়। জগতে যাঁরা নবী রসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেছেন। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, আপনার পূর্বে সকল রসূলগণকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যে মিথ্যারোপ তাঁদের প্রতি করা হয়েছে এবং যে যন্ত্রণা তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে তাঁরা তার উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন।

আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীব (সঃ) কে ধৈর্য ধারণ করার জন্য এরশাদ ফরমান—আপনিও উলুল আযম পয়গম্বরগণের মতো ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেন— 'আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন, ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।'

ধৈর্যের মহান গুণটি যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদতের হৃদপিণ্ডতুল্য এবং সমস্ত কল্যাণ ও সৌন্দর্যের উৎস। কেননা নেকী অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি আসবেই। সে সময় যদি ধৈর্য ধারণ না করা যায় তবে তা সফলতা লাভ করেনা। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'ছবর' গুণটিকে পূর্ণ ইমান বলা হয়েছে। আবার কখনও কখনও ছবর গুণটিকে নিসফে ইমান বা ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। অই সমস্ত ক্ষেত্রে ছবরের উদ্দেশ্য হবে গোনাহ্র কাজ পরিহার করা এবং গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা। কেননা ইমানের চাহিদার অর্ধাংশ গোনাহ্বর্জন আর বাকি অর্ধাংশ আনুগত্য ও ইবাদত বাস্তবায়ন। এস্থানে যে ছবর বা ধৈর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ মানুষের পক্ষ থেকে যে দুঃখ-যন্ত্রণা, যুলুম-অত্যাচার আসবে তা বরদাশত্ করে নেয়া। সাইয়্যেদুল আম্বিয়া জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর উপর যে যন্ত্রণা ও নির্যাতন এসেছে, তা অন্যান্য নবী রসূলগণের তুলনায় অনেক বেশী ও অধিকতর কঠিন ছিলো। এ সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমাকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, ইতিপূর্বে আর কোনো নবীকে এরূপ কষ্ট দেয়া হয়নি। আর এরকম নির্যাতন ভোগ করার কারণ এই যে, তিনি উম্মতের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। কাজেই অন্যান্য নবীগণের নির্যাতনের তুলনায় তাঁর উপর নির্যাতন বেশী হয়েছিলো।

বর্ণিত আছে, আমর বিল মা'রুফ সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হলো এবং জাহেলদেরকে ক্ষমা করার ব্যাপারে যখন হুকুম আরোপিত হলো,

তখন হুজুর আকরম (সঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর কাছে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। হজরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আমি যতক্ষণ রববুল ইযযতের কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না। অতপর হজরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে জেনে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরকম এরশাদ করেছেন, যে আপনা থেকে দূরবর্তী হবে আপনি তার নিকটবর্তী হবেন। আপনাকে যে বঞ্চিত করবে আপনি তাকে দান করবেন, আপনার উপর যে অত্যাচার করবে আপনি তাকে মাফ করে দিবেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলে খোদা (সঃ) জীবনে কখনও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা ধনসম্পদের কারণে কারও প্রতি প্রতিশোধ কার্যকর করেননি। তবে যখন কেউ আল্লাহ্‌তায়ালার হালালকৃত বস্তুকে হারাম করেছে, তখন তিনি তার বদলা নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। হুজুর আকরম (সঃ) উহুদের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ও কঠিনতম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাফেরেরা তাঁর মুকাবেলা করেছে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, কঠিনতম দুঃখ যন্ত্রণা প্রদান করেছে। কিন্তু সে উহুদের প্রান্তরে তিনি ছিলেন ধৈর্যের অটল হিমাদ্রিতুল্য। প্রচন্ড নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও তিনি যে শুধু ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন তাই নয় বরং তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। তাদের ভালোবাসায় অন্তর বিগলিত করে দিয়েছেন। তাদের মূর্খতা ও যুলুমবাজীকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। এদেরকে অক্ষম হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসার প্রস্রবন থেকে উথলে উঠেছে মহান দোয়ার অমিয় বাণী, হে আল্লাহ্! আপনি আমার কাওমকে হেদায়েত দান করুন। এরা অবুঝ। এরা অজ্ঞ। —অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি এরকম দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্ আপনি এদেরকে ক্ষমা করে দিন।' কাফেরদের নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করলো, সাহাবায়ে কেরামের নিকট অসহ্য মনে হতে লাগলো, তখন তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এদের উপর বদদোয়া করতেন! আল্লাহ্‌তায়ালা যেনো তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। দয়ার সাগর, করুণার সিন্ধু আল্লাহ্‌র হাবীব এরশাদ করলেন, আমি মানুষকে অভিস্পাত করার জন্য প্রেরিত হইনি। বরং সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। দুনিয়ায় রহমত হিসেবে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

তাদের কথায় আশ্চর্য হতে হয়, যারা বলে, উহুদের যুদ্ধের মর্মান্তিক অবস্থায় হুজুর পাক (সঃ) এর অন্তরাত্মায় কম্পন এসেছিলো এবং তিনি

অধৈর্য ভাব প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু তখন তিনি 'এ জাতি কেমন করে কামিয়াব হবে' বাক্য দ্বারা খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এবং তখন আল্লাহ্তায়ালা 'আপনাকে কোনো অধিকার দেয়া হয়নি' এ আয়াত নাযিল করেছিলেন। নবী করীম (সঃ) এর শানে তাদের এরূপ চিন্তাধারা দেখে বড়ই আক্ষেপ হয়। অথচ ليس لك من الامر شئ 'লাইসালাকা মিনাল আমরে শাইউন' বা كيف يفلح قوم কাইফা ইয়াফলাহু কাওমুন' কোনোটিই নবী করীম (সঃ) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার খেলাফ হিসেবে প্রমাণ নয়। নবী করীম (সঃ) তো 'এ জাতি কেমন করে সফল হবে' বাক্য দ্বারা কাফেরদের আচরণের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আর আল্লাহ্তায়ালা 'আপনাকে অধিকার দেয়া হয়নি' বাক্য দ্বারা তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ) কে সান্তনা প্রদান করেছেন। ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র সত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। তবে আহ্যাবের যুদ্ধে (খন্দকের যুদ্ধে) কাফেররা যখন তাঁকে আছরের নামাজ আদায় করতে দিলো না, তখন তিনি কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন, যাতে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে আযাব প্রদান করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো তাদের বাড়িঘর ও কবরসমূহকে অনলপূর্ণ করে দেন। এমনিভাবে তিনি আরবের ঐ সকল কবীলার জন্য বদদোয়া করেছিলেন, যারা অসহায় দুর্বল মুসলমানগণকে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলতো। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে 'লাইসালাকা মিনাল আমরে শাইউন' আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়েছিলো। হুজুর পাক (সঃ) যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করেছিলেন তা ছিলো দ্বীন ইসলামের হকের স্বার্থে এবং মুসলমানগণের হক নষ্ট হওয়ার কারণে। অধিকন্তু আল্লাহ্তায়ালার এই নির্দেশ, 'হে নবী (সঃ)! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করুন' এর পরিপ্রেক্ষিতেই বদদোয়া করেছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত হতাভাগ্যদেরকেও বদদোয়া করেছিলেন, যারা নামাজ আদায়কালে হুজুর পাক (সঃ) এর পিঠ মুবারকের উপর উঁটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিতো।

একজন আহবার অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ধর্মযাজক, তার নাম ছিলো ইবনসা'না—তিনি বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নবুওয়াতের যেসমস্ত আলামত আমি পেয়েছি, তার সব কয়টিই হুজুর আকরম (সঃ) এর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করেছি। তবে দু'টি বিষয়ে আমি পরীক্ষা

করতে পারিনি। তার একটি হচ্ছে এই, তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, তাঁর সহিষ্ণুতা অধৈর্যতাকে বৃদ্ধি করতে পারবে না। অপরটি হচ্ছে, কঠিন যুলুম অত্যাচার তাঁর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে বাড়িয়ে দেবে। দুটি বৈশিষ্ট্য আবিস্কার করার উদ্দেশ্যে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। কিন্তু তার কোনো সুরাহা করতে পারিনি। তবে যেভাবে আমি তাঁর এলেম ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলাম তার ঘটনাটি এইরূপ—আমি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছ থেকে খেজুর ক্রয় করেছিলাম। মাল হস্তগত করার পূর্বে আমি তার মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার দু'তিন দিন পূর্বেই আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর চাদর মুবারক চেপে ধরে রাগত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, হে মোহাম্মদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতদিনেও তুমি আমার প্রাপ্য কেনো আদায় করো নি? খোদার কসম, আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর হয়ে তুমি পাওনা আদায়ে টালবাহানা করো! আমার এহেন অশালীন উক্তি শুনে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, রে আল্লাহর দুশমন! রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর শানে তুমি এমন অশালীন উক্তি করলে? বেতমিযীমূলক কথাবার্তা যা আমি শুনলাম, হুজুর পাক (সঃ) এর নাফরমানি হবে বলে যদি আশংকা না করতাম তাহলে এক্ষুণি আমার তরবারী তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিতো। হজরত ওমর (রাঃ) এর রোষান্বিত বাক্য শুনে হুজুর পাক (সঃ) বিনম্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, হে ওমর! আমি এবং এ ব্যক্তি তোমার মুখ থেকে এর বিপরীত কথা শুনবো আশা করেছিলাম। —এ কথার অর্থ এই, হুজুর পাক (সঃ) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ ব্যক্তির পাওনাটা তুমি আমার কাছ থেকে উত্তমভাবে আদায় করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারতে। আর তাকেও সুন্দর ব্যবহার করার ব্যাপারে শিক্ষা দিতে পারতে। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, ওমর! এখন যাও তার পাওনাগুলো আদায় করে দাও। অধিকন্তু তাকে যে তুমি ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়েছো, সে জন্য আরও বিশ সা খেজুর অতিরিক্ত দিয়ে দিও। হজরত ওমর (রাঃ) রসূল (সঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলেন। এ ঘটনাটির পর উক্ত ইয়াহুদী ধর্মযাজক বললেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের মধ্যে নবুওয়াতের সমস্ত আলামত আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু এ দু'টি ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। আজ আমি তার যথাযথ প্রমাণ পেয়ে গেলাম। ভাই ওমর! আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি

ঘোষণা দিচ্ছি, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।'

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে আছে, একদিন হুজুর পাক (সঃ) এক মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে সাথে আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। তখন একজন বেদুইন লোক এলো। এসেই লোকটি হুজুর পাক (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের উপর যে চাদরখানা ছিলো তা সজোরে চেপে ধরলো। চাদর ধরে সে এতো জোরে টান দিলো যে, চাদরের চাপে হুজুর পাক (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের চামড়া কিঞ্চিৎ ছিলে গেলো। হুজুর পাক (সঃ) বেদুইন লোকটির দিকে তাকালেন, সে কি বলতে চায় তা বুঝতে চেষ্টা করলেন। লোকটি বললো, আমি যে দু'টি উট নিয়ে এসেছি তা খাদ্য দিয়ে বোঝাই করে দিতে হবে। কেননা আমার বালবাচ্চা আছে, তাদেরকে খাওয়াতে হবে। আর আপনি আপনার নিজের মাল বা আপনার বাপদাদার মালতো আর দিচ্ছেন না! (বাইতুল মাল থেকে দিবেন, তাতে আপনার আপত্তি কোথায়?)

লোকটির কথা শুনে হুজুর পাক (সঃ) বললেন, তুমি চাদর দিয়ে আমাকে আটকে রেখেছো। ছেড়ে না দিলে আমি মাল দিবো ক্যামন করে? বেদুইন বললো, খোদার কসম! আপনি যতক্ষণ আমার এ দু'টি উট বোঝাই করে না দেবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়ছিনা। তখন হুজুর পাক (সঃ) জনৈক সাহাবীকে ডেকে বলে দিলেন, এ লোকটির একটি উট খেজুর আর অপরটি যব দিয়ে বোঝাই করে দাও! —এ ঘটনাটি আবু দাউদ শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) এ ঘটনাটিই আনাস (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় হুজুর আকরম (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের উপরের শক্ত ডোরা বিশিষ্ট একখানা নাজরানী চাদর ছিলো। অকস্মাৎ একটি বেদুইন লোক নিকটে এসে চাদর ধরে হুজুর (সঃ) কে টান দিলো এবং চাদর দিয়ে তাকে শক্ত ভাবে পেঁচিয়ে ধরলো। হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তখন হুজুর পাক (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রুক্ষ ডোরা বিশিষ্ট চাদরের চাপে হুজুর পাক (সঃ) এর কাঁধের চামড়া ছিলে গেছে। লোকটি তখন বলতে লাগলো, 'হে মোহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ্‌র প্রদত্ত (গনীমত) মাল থেকে আমাকেও প্রদান করার জন্য হুকুম দিন।' হুজুর পাক (সঃ) লোকটিকে নিরীক্ষণ করে মৃদু হাসলেন তারপর তাকে কিছু দান করার জন্য আমাকে হুকুম করলেন।

হুজুর আকরম (সঃ) এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায় তাঁর জান ও মালের উপর কতোইনা অমানুষিক নির্যাতন এসেছে, কিন্তু সেগুলিকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। জালেমদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ সব তিনি করেছেন একটি মাত্র আশায়—যদি তারা মুসলমান হয়ে যায়। যাবতীয় নির্যাতন ভোগ করেও তাদের অন্তর জয় করতে চেয়েছেন। যাতে ইসলাম কবুল করে। যাতে আল্লাহ্‌র পথে, শান্তির পথে ফিরে আসে। নবী করীম (সঃ) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে এরকম বর্ণিত আছে, জীবনে তিনি কখনও কাউকে কটুকথা বলেননি এবং কারও কটুকথার বদলাও গ্রহণ করেন নি। বরং শুধু ক্ষমা করতেন, ক্ষমা করে যেতেন। এক হাদীছে এরূপ বর্ণিত আছে, তিনি কাউকে কখনও গালি দিতেন না, ফাহেশা কালাম বা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করতেন না। কখনও কাউকে অভিসম্পাত করতেন না। 'অশ্লীলতা' শব্দটি দ্বারা কথা, কাজ ও স্বভাব সবকিছুর অশ্লীলতা বুঝায়। তবে এ শব্দটির ব্যবহার সাধারণতঃ কথার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

হুজুর পাক (সঃ)-এর পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করতে যেয়ে এক জায়গায় এমন বলা হয়েছে যে, তাঁর কালাম ফাহেশা ও ছিলোনা, মুতাফাহ্‌হাশও ছিলোনা। একথার মর্মার্থ এই যে, ফাহেশা কথা বলার অভ্যাস হুজুর পাক (সঃ) এর ছিলোনা বা কখনও তিনি ইচ্ছা করেও ফাহেশা কথা বলতেন না। মুতাফাহ্‌হাশ কথাটির অর্থ হচ্ছে ফাহেশা, অশ্লীল বা রুক্ষ কথা ইচ্ছা করে তাকাল্‌লুফের সাথে করা। ফাহেশা কথাটি এর চেয়ে বেশী সাধারণ অর্থবোধক।

কেউ যদি এরূপ প্রশ্ন করে, এ ঘটনাটি তো সহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর আকরম (সঃ) উকবা ইবন মঈত, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন হানযাল এবং অন্যান্য কাফের, যারা তাঁকে বিভিন্নভাবে দুঃখ কষ্ট দিতো, তিনিতো তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তাহলে এর বৈধতা কতটুকু? তখন এর উত্তরে বলতে হবে হুজুর পাক (সঃ) যে এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে নয়। বরং এরা আল্লাহ্‌তায়ালার হুরমত সমূহকেও ধ্বংস করে দিতো। আবার কেউ কেউ এভাবে উত্তর দিয়েছেন, তিনি যে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি বলা হয়েছে তার অর্থ, যতক্ষণ কেউ কুফুরীর সীমায় না পৌঁছতো ততক্ষণ তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেননা। হুজুর পাক (সঃ) এর চাদর মুবারক ধরে টান দেয়ার ঘটনা বা এ জাতীয় অন্যান্য

ঘটনার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সমাধান বুঝে নিতে হবে। দাউদীর মতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার অর্থ মাল সম্পদ সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। হুজুর পাক (সঃ) এর ক্ষমাশীলতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লবীদ ইবনুলআ'সাম ইয়াহুদীর ঘটনা, যে তাঁকে যাদু করেছিলো এবং খয়বরের ঐ ইয়াহুদী নারীর ঘটনা, যে হুজুর পাক (সঃ) কে বিষমিশ্রিত বকরীর রান খাইয়েছিলো। দয়াল নবী তাদেরকে নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এরকম অন্য আরেক দিনের ঘটনা, হুজুর পাক (সঃ) চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় কায়লুলা করছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পেলেন, এক আরব বেদুইন তাঁর শির মুবারকের উপর তরবারী উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে আছে। বেদুইনটি বললো, এখন আপনাকে আমার এ তরবারীর আঘাত থেকে কে রক্ষা করবে? কে আপনার হেফাজত করবে? হুজুর পাক (সঃ) বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হলেন না। শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আল্লাহ্। ব্যাস এতটুকুই কথা। বেদুইনটির হাত কেঁপে উঠলো। ঝন ঝন শব্দে তরবারী মাটিতে পড়ে গেলো। হুজুর পাক (সঃ) তরবারীটি তুলে নিলেন। স্বাভাবিক স্বরে বললেন, এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? বেদুইনটি কেঁপে উঠলো। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। করুণার হিমাদ্রি, দয়ার সাগর মহান রসূল (সঃ) প্রতিশোধ নেবেন, তা-কি হতে পারে? তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হেসে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। মাফ করে দিলেন অনুতপ্ত আরব বেদুইনকে।এরপর লোকটি তার কওমের লোকদের কাছে গিয়ে বলতে লাগলো, ওহে! তোমরা শোনো। আজ আমি সর্বোত্তম এক মহান ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। আরেক দিনের ঘটনা, —সাহাবায়ে কেরাম একটি লোককে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আপনার দুশমন। তার অভিপ্রায়, সুযোগ পেলে আপনাকে হত্যা করবে। আল্লাহ্র হাবীব এরশাদ করলেন, কোনো চিন্তা করোনা। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসে থাকো, তবে জেনো তা সম্ভব হবে না। তুমি আমার উপর সফল হতে পারবে না।

এ সমস্ত ঘটনা যা বিবৃত হলো, হুজুর পাক (সঃ) এর সুমহান আখলাক ও অসীম ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মদীনার মুনাফেক সম্প্রদায় যারা সুযোগ সন্ধান করতো—আড়াল থেকে তারা মহানবী (সঃ) কে নানারূপে যন্ত্রণা দিতো, আবার যখন সামনে আসতো, তখন তাদের খোশামোদ ও চাটুকারিতার অন্ত থাকতো না। মুনাফেকদের এধরনের কপট আচরণ ও তৎপরতার কারণে সব মানুষের

অন্তর থেকে ঘৃণা উৎসারিত হতো। কিন্তু দয়াল নবী এদের প্রতি কিরূপ আচরণ করলেন? এদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, এদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করুন। —কিন্তু নবী পাক (সঃ) এর দয়ায় ভরা অন্তর থেকে স্বাভাবিকভাবে কঠোরতা আসতে চায়না। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা, রহমত ও এসতেগফারের দরজা উন্মুক্ত রাখলেন, তাদের জন্য তখনও দোয়া করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করলেন-'হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর নাই করেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।'—এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর পাক (সঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আরয করলেন, মাবুদ! আপনি যেহেতু ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া উভয়টার উপর আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই এসতেগফারকে আমি গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেন, আপনি যদি সত্তুর বারও তাদের জন্য এসতেগফার করেন, তবুও না। তখন হুজুর পাক (সঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্ আমি সত্তুর বারের চেয়েও বেশী তাদের জন্য আপনার কাছে ক্ষমার দরখাস্ত করবো। এটা হুজুর পাক (সঃ) সম্মানীয় স্বভাব। কাফের মুনাফেকরা তাঁর উপর যুলুম অত্যাচার করেছে, তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের অবকাশ আছে যে, 'সত্তুর বার' কথাটি দ্বারা তো কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয়নি। কথাটি আধিক্য বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, তাহলে হুজুর পাক (সঃ) কেমন করে বললেন "সত্তুর বারের চেয়েও বেশী ক্ষমা চাইবো?" এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি সীমাহীন ক্ষমা-গুণের কারণে আয়াতে কারীমার শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এ রকম আরয করেছেন। এমনকি তাঁর ক্ষমা-গুণের প্রাবল্য এতো অধিক ছিলো যে, রইসুল মুনাফেকীন আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই এর পুত্রকে যিনি একজন খালেস মুসলমান ছিলেন, হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য। এ আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই এর যখন মৃত্যু হলো, হুজুর আকরম (সঃ) স্বীয় জামাখানা দেহ মুবারক থেকে খুলে তার কাফন বানিয়ে দিলেন এবং তার জানাযার নামাজ পড়ার জন্য এরাদা করলেন। হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বিস্মিত হয়ে হুজুর পাক (সঃ) এর জামার দামন মুবারক আঁকড়ে ধরে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি এমন একজন মুনাফেকের জানাযা

পড়ানোর জন্য উদ্যত হয়েছেন, যে ছিলো সমস্ত মুনাফেক সম্প্রদায়ের সরদার। হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় জামার দামন মুবারক হজরত ওমর (রাঃ) এর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, ওমর তুমি দূরে থাকো! এই মুহূর্তে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন, 'হে নবী (সঃ) মুনাফেকদের থেকে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে, আপনি কোনোদিন তাদের জানাযার নামাজ পড়বেন না এবং তাদের কবরের কাছে দণ্ডায়মান হবেন না। এ হুকুম জারী হওয়ার পর হুজুর পাক (সঃ) উক্ত এরাদা পরিত্যাগ করলেন। উম্মতের উপর তাঁর সীমাহীন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মমত্ববোধ ছিলো এটা সত্য। কিন্তু আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে যখন এর নিষিদ্ধতার হুকুম জারী হয়ে গেলো, তখন তিনি আর কি করতে পারেন?

কোনো কোনো উলামা এ ঘটনাটির কারণ এ ভাবে ব্যক্ত করেন যে, তিনি মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই এর পুত্রের মন রক্ষার্থে একাজ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও নেককার সাহাবী ছিলেন। তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর নিকট জানাযা পড়ানোর জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর আবদার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর জামা মুবারক আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাইকে যে দান করেছিলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করে কোনো কোনো আলেম এরূপ বলেন যে, বদরের যুদ্ধে হুজুর পাক (সঃ) এর চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদরের অন্যান্য কয়েদীগণের সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন, তখন বস্ত্রহীন হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই তাকে একখানা জামা দান করেছিলো। হজরত আব্বাস (রাঃ) দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে তাঁর গায়ে লাগতে পারে এমন জামা আর কারও কাছে ছিলোনা। আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই তখন তাঁকে একটি জামা দিয়ে উপকার করেছিলো। তার প্রতিদানে হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় জামা মুবারক কাফন স্বরূপ তার গায়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

মোট কথা, এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা একথাটাই বুঝানোর প্রয়াস হয়েছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর আখলাক কতো মহান, কতো সুন্দর ছিলো। মুনাফেকরা কখনও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি, নানা রকম যন্ত্রণায় জর্জরিত করেছে। কিন্তু তিনি তাদের এরকম আচরণের বিপরীতে শুধুই সদাচরণ করে গেছেন। এ থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, কাফের মুনাফেকদের প্রতি যাঁর দিলে এতো মমতা ছিলো, মুখলেস মুসলমানদের জন্য তাঁর দিলের অবস্থা ছিলো কেমন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।'

উম্মতে মুসলিমার উপর হুজুর আকরম (সঃ) এর স্নেহমমতা কেমন ছিলো, এবার এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক। হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, উম্মতের মধ্যে কেউ যদি কবিরা গোনাহ্ করে ফেলে বা কেউ কাউকে কোনোরূপ কষ্ট প্রদান করে, তবে যেনো যতদূর সম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। আরও এরশাদ ফরমান, কেউ যদি কোনো মুহাররামাতের সঙ্গে অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার গোনায় গোনাহ্গার হয়, তাহলে উচিত হবে তা গোপন রাখা, ফাঁস না করা। উম্মতের মধ্যে কারও উপর যদি শরীয়তের শাস্তি কায়েম হয়, তাহলে তাকে তিরস্কার, ঘৃণা গালিগালাজ বা অভিশম্পাত না করে। আল্লাহ্পাকের দরবারে তার জন্য যেনো ক্ষমা প্রার্থনা করে। উম্মতের প্রতি তাঁর হুকুম ছিলো এরকমই। এ প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ ফরমান, তোমরা কোনো মুসলমানকে লানত করোনা, কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে। এই হাদীছ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষের অন্তরের গোপন অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করেন। যদিও প্রকাশ্যে তার দ্বারা কোনো অপরাধ, অবিশ্বাস বা লাঞ্ছনাকর কাজ সংঘটিত হয়ে যায়।

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি হুজুর পাক (সঃ) এর নিকট আসার জন্য অনুমতি চাইলো। তিনি অনুমতি দিলেন। হুজুর পাক (সঃ) লোকটিকে দেখে মন্তব্য করলেন, এ লোকটি তার এলাকার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। কিন্তু লোকটি যখন হুজুর পাক (সঃ) কাছে বসে গেলো, তখন তিনি উৎফুল্ল হলেন। খুশির ভাব প্রকাশ করলেন। লোকটি যখন নবী করীম (সঃ) এর দরবার থেকে চলে গেলো, তখন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! লোকটি যখন প্রথমে এসে প্রবেশ করলো তখন আপনি এমন এমন মন্তব্য করলেন। আর যখন সে আপনার নিকট বসে গেলো তখন আনন্দ ও উৎফুল্লতার ভাব প্রকাশ করলেন। এর তাৎপর্য কি? হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি আমাকে কখনও কি কর্কশভাষী দুর্ব্যবহারকারী হিসেবে দেখেছো? তবে একথা সত্য যে, যাকে মানুষ যুলুম অত্যাচারের কারণে ভয় করে, তার তরফ থেকে ক্ষতির আশংকায় মানুষ তা থেকে দূরে সরে থাকে, এমন লোক আল্লাহ্তায়ালার নিকট নেহায়েত মন্দ।

হুজুর পাক (সঃ) এর এ বক্তবের দুটি অর্থ হতে পারে। (১) হুজুর পাক (সঃ) লোকটির প্রতি এরূপ ভাব দেখানোর ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন। কোমল

অন্তরের কারণে লোকটি মন্দ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি রূঢ় আচরণ করতে পারেননি। খুশির ভাবের বহিঃপ্রকাশটি আপনাআপনিই হয়েছে। শুধু তাই নয়, এরূপ লোকের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে মানা করেছেন—তাহলে মানুষ ঘাবড়ে গিয়ে কাছে আসতে কুণ্ঠাবোধ করবে, দূরে সরে যাবে। (২) এও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির যে দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা তার ধনদৌলতের প্রাচুর্যতার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। লোকটি মন্দ হওয়া সত্ত্বেও তার ধনদৌলতের কারণে তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ কেউ করতে পারতোনা। ক্ষতি করার ভয়ে মানুষ তাকে লৌকিক সম্মান করতো।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, হুজুর পাক (সঃ) মন্দ লোকটির সাথে সদাচরণ করেছেন তার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলে তার মাধ্যমে তার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এই ছিলো হুজুর (সঃ) এর উদ্দেশ্য। যেহেতু লোকটি তার গোত্রের সরদার ছিলো। তখন প্রশ্ন জাগে যে, হুজুর (সঃ) যে তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলেন, এটা কি গীবতের পর্যায়ে পড়ে না? তার উত্তর হলো, এটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা, নবীগণকে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে এ সত্যটি পৌঁছানো হয়ে থাকে, যেনো তাঁরা তাঁদের উম্মতের যাবতীয় দোষত্রুটি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন। দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেন। তা না হলে উম্মত হেদায়েত পাবে কেমন করে? এটা উম্মতের জন্য নসীহত ও সংশোধনের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু উম্মতের অবস্থা এর বিপরীত। তারা একে অপরের দোষ চর্চা ও গীবত করে থাকে। তদুপরি উম্মতের জন্যও তো এ বিধান আছে, কেউ যদি বেপরোয়াভাবে ফেসক কুফরী বা অন্যায় অনাচার কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার দোষসমূহ প্রকাশ করে দেয়া জায়েয। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ) এর মধ্যে সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যই এরকম করে দিয়েছিলেন যে, সুন্দর চরিত্র, বিনয়, নম্রতা, প্রফুল্লতা ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলীর সমন্বয় তাঁর মধ্যে ছিলো। উক্ত ঘটনাটিতে উম্মতের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, কোনো দুরাচারীর কাছ থেকে যদি উক্তরূপ ক্ষতির আশংকা হয়, তবে দোষ-আলোচনা পরিহার করে চলতে হবে। বিনয় ও হাসিখুশীর সাথে তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। তার ক্ষতি ও ফাসাদ থেকে নিজকে রক্ষা করে চলতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ভালো ব্যবহার যেনো চাটুকারিতায় পরিণত না হয়। এ দু'এর মধ্যে পার্থক্য হলো ক্ষতি থেকে বাঁচা ও নিজের মান ইজ্জত বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যে ব্যবহার করা হয়, তাকেই ভালো ব্যবহার

বলে। আর দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির মানসে যে ভালো ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় চাটুকারিতা।

কোনো কোনো আলেম এ দুটি শব্দের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, ভালো ব্যবহার হচ্ছে দুনিয়াবী কার্যাবলী, দুনিয়ার কল্যাণ বা সংশোধন, দ্বীনের কল্যাণ বা সংশোধন, অথবা উভয়ের কল্যাণ বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু করা। একাজটি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। কোনো কোনো সময় তা মুস্তাহ্সান বা প্রশংসনীয়ও বটে। আর চাটুকারিতা হচ্ছে, দ্বীনের কার্যাবলীকে দুনিয়াবী কল্যাণ বা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। হুজুর আকরম (সঃ) উক্ত সরদার লোকটির সাথে যে আচরণ করেছেন, তা দুনিয়াবী আচার ব্যবহার, যথা ভালো ব্যবহার, নরোম মার্জিত আচরণ। হুজুর পাক (সঃ) তার সঙ্গে উক্তরূপ আচরণ করেছেন সত্যিই, কিন্তু তাঁর যবান মুবারক থেকে উক্ত নালায়েক সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য বের হয়নি। যাতে বাস্তবের বিপরীত হয়। সুতরাং হুজুর পাক (সঃ) এর কথা ছিলো হকের বহিঃপ্রকাশক আর কাজ ছিলো সুন্দর আচরণমূলক।

হজরত কাযী আয়ায (রঃ) বলেন, উক্ত সরদার লোকটি হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় মুসলমান ছিলো কিনা তা জানা নেই। যদি তখন সে মুসলমান না হয় তাহলে হুজুর পাক (সঃ) এর মন্তব্য অর্থাৎ তার সম্পর্কে মন্দ বলা এটা গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। আর যদি মুসলমান হয় তা হলে তার মুসলমানী বিশুদ্ধ ছিলোনা। এমতাবস্থায় তার প্রকৃত অবস্থাটা বর্ণনা করে দেয়া হুজুর পাক (সঃ) এর উদ্দেশ্য ছিলো। যাতে কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি তার ধোঁকায় পতিত না হয়। ঐ লোকটির জীবনালোচনায় পাওয়া যায় যে, হুজুর পাক (সঃ) এর পার্থিব জীবনে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তার দ্বারা এমন কার্যাবলী সংঘটিত হয়েছিলো যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার ইমান (থেকে থাকলেও) দুর্বল ছিলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, হুজুর পাক (সঃ) তার সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছিলেন, তা এখবার বিল গায়েবের ও আলামাতে নবুওয়াত এর পর্যায়ে পড়ে। লোকটির মধ্যে উক্ত নিকৃষ্ট দোষসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি যে তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তা ছিলো তাঁর কোমল হৃদয়ের কারণে।

এখন উক্ত সরদার লোকটির পরিচয় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় আসা যাক। তার নাম ছিলো উয়ায়না ইবন হিসন ইবন হুযায়ফা ইবন বদর ইবন ফারায়ী। লোকেরা তাকে আহমাকুল মুত্বা বলে ডাকতো। নির্বুদ্ধিতা ও অহংকারের কারণে তাকে সকলে আহমক বলতো। মুত্বা মানে

যার আনুগত্য করা হয়। যেহেতু সে গোত্রের সরদার ছিলো, তাই লোকেরা তার আনুগত্য করতো। এ কারণে তাকে মুত্বা বলা হতো।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা উয়ায়না ইবন হিসন ইবন হুযায়ফা তার ভ্রাতুষ্পুত্র হারর্ ইবন কায়স ইবন হুসায়ন এর নিকট এলো। আর হারর্ ইবন কায়স আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং মজলিশে শূরার সদস্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উয়ায়না তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললো, ভাতিজা! আমীরুল মুমিনীন এর দরবারে তোমার তো বেশ মানমর্যাদা আছে। আমিও যেনো তাঁর নৈকট্য পেতে পারি সে জন্য তুমি তাঁর কাছে আমার পক্ষ থেকে একটি আবেদন পেশ করো। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে আবেদন রাখবো। হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর পর হারর ইবন কায়স তাঁর চাচা উয়ায়নার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের দরবারে দরখাস্ত পেশ করলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি দিলেন।

উয়ায়না যখন হজরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর কাছে এলো, তখন বলতে লাগলো, হে খাত্তাবের সন্তান! আমাকেও কিছু মালপত্র প্রদান করুন না। খোদার কসম! আপনি কিন্তু আমাকে বেশী কিছু দেন না, আমাদের প্রতি আপনি ইনসাফ করেন না। —তার এরূপ কথা শুনে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে গেলেন। এমনকি ওকে শাস্তি প্রদানের নিয়ত করলেন। তখন হারর ইবন কায়েস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, 'ক্ষমাশীলতা গ্রহণ করুন। সৎকাজের আদেশ করুন আর মূর্খদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।' হারর ইবন কায়স তাঁর চাচা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, লোকটি জাহেল। হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম হজরত ওমর (রাঃ) আয়াতে কারীমার হুকুমের বিন্দু মাত্র লংঘন করলেন না।

'ফতহুল বারী' কিতাবে উদ্ধৃত আছে, হজরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর যমানায় উয়ায়না মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয় মুসলমানগণের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলো। এরপর পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুরতাদী থেকে তওবা করে। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর যমানায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই কিতাবের শেষের দিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে তার কর্মতৎপরতার ধরন ধারণ ও গতিবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ্, তাতে তার বদ আচরণ ও ধৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিনয়, শিষ্টাচার ও সদাচরণ

এই অনুচ্ছেদে হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর পরিবার পরিজন, খাদেম ও সাহাবীগণের প্রতি কি রকম বিনয়ী ছিলেন, তাঁদের প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার ও সদাচরণ করতেন এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে। 'সার্‌রাহ্‌' নামক গ্রন্থে تواضع 'তাওয়াযু' শব্দের অর্থ করা হয়েছে এনকেসারী বা বিনয় প্রকাশ করা, কাঁধ অবনত করা। অভিধান গ্রন্থে 'তাওয়াযু' এর অর্থ লাঞ্ছিত অবস্থার কাজ।

আরবের লোকেরা এ শব্দটি ব্যবহার করে যখন তারা উঁটের স্কন্ধ নীচু করে তার উপর তাদের পা স্থাপন করে। 'তাওয়াযু' শব্দটি وضع 'ওয়াযউন' মূল ধাতু থেকে নির্গত। 'ওয়াযউন' শব্দের অর্থ নীচে রাখা। মুতাওয়াযে (বিনয়ী) ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে তার যথাযথ মাকাম ও মর্যাদার নীচে মনে করে কাজেই এক্ষেত্রে 'ওয়াযউন' শব্দ প্রযোজ্য হয়। আর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'তাকাববুর'। মুতাকাববের (অহংকারী) ব্যক্তি নিজেকে তার যথাযথ মাকাম ও মর্যাদার উর্ধে মনে করে। তাই এক্ষেত্রে 'তাকাববুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর কেউ যদি নিজকে স্বীয় মাকাম ও মর্যাদার নীচে মনে করে বলে যাহির করে, তবে সেক্ষেত্রে تصنع 'তাসান্নু' (ভনিতা) শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাকাব্বুর ও তাসান্নু এ দুটির মধ্যবর্তী এক অবস্থার নাম হচ্ছে 'তাওয়াযু' কিন্তু মানুষের যেহেতু তাকব্বরী করার কোনোরূপ অবকাশই নেই, তাই 'তাসান্নু'কে কখনও 'তাওয়াযু' এর স্তরে মনে করে নেয়া হয়।

হজরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো "তাওয়াযু' কাকে বলে?" তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন 'তাওয়াযু' হচ্ছে— স্কন্ধদ্বয়কে নত করা এবং পার্শ্ব দেশের প্রতি ঝুঁকে থাকা। এমর্মে তিনি আরও বলেছিলেন, 'তাওয়াযু' হচ্ছে তুমি হকের সামনে অবনত হয়ে যাবে। তার প্রতি অনুগত হয়ে যাবে। যে হক বলবে তাকে তুমি কবুল করবে এবং তার পক্ষ থেকে যা বলা হবে তা মেনে নিবে। তিনি আরও বলেন, যে নিজেকে মূল্যবান মনে করবে তার 'তাওয়াযু' (বিনয়) এর কোনো আশা নেই। আরেফগণ বলে থাকেন, কোনো বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত 'তাওয়াযু' এর হাকীকতে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা, যতক্ষণ তার অন্তরে নূরের মুশাহাদার ঔজ্জ্বল্য বিকিরিত না হবে। কেননা উক্ত মুশাহাদা নফসকে বিগলিত এবং নম্র করে। নফসের এই বিগলন তাকাববুরী বা অহংকারের নাপাকী থেকে নফসকে পবিত্র করে দেয়। কাজেই নফস তখন শান্ত হয়ে যায়। নফস তখন জামায়ে হকের দর্পন তুল্য হয়ে যায়। কিবির বা অহংকারের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ময়লা ও ধূলাবালি দূরীভূত হয়ে যায়।

'তাওয়াযু' বা বিনয়ের পূর্ণতা এবং বুলন্দ মরতবা ছিলো সাইয়্যেদুল আম্বিয়া জনাব মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর মধ্যে। তিনি সার্বিক পূর্ণতার উচ্চতম শিখরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তাওয়াযু বা বিনয়কে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) কে এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন, তিনি নবীবাদশাহ্ হবেন নাকি নবীবান্দা হবেন। তিনি নবীবান্দা হওয়াটাকে পছন্দ করেছিলেন। যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) من تواضع لله رفعه الله মানতাওয়াযাআ লিল্লাহি রা ফাআ হুল্লাহ্ 'যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মর্যাদা উন্নত করে দেন' এই বাণীর মর্ম অনুসারে 'তাওয়াযু' বা বিনয়কে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন, সমস্ত মানব জাতির সরদার বানিয়েছেন। হুজুর আকরম (সঃ) সাহাবাগণকে বলতেন, তোমরা আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে অতিরঞ্জিত করো না, সীমা লংঘন করোনা। যেমন নাসারা সম্প্রদায় হজরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) কে আল্লাহ্র পুত্র হিসাবে আখ্যায়িত করতো। পূর্ণ ফযল ও কামাল অর্জন করা সত্ত্বেও আমি আল্লাহ্র বান্দা-ই। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র রসূল বলো।

হজরত আবু উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) লাঠিতে ভর করে আমাদের নিকট তশরীফ আনলেন। আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজমী লোকেরা কাউকে সম্মান প্রদর্শনার্থে যেমন দণ্ডায়মান হয়, তোমরা ওরকমভাবে দণ্ডায়মান হয়োনা। তিনি আরও এরশাদ করলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা। আমি অন্যান্য বান্দাদের ন্যায় পানাহার করি। আমি ঐ রকমভাবে বসি যে রকম অন্যান্য বান্দারা বসে থাকে। মহান পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর মুখনিঃসৃত এমন বাণী তাঁর বিনয় ও নম্রতার মহান স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

মহানবী (সঃ) এর 'তাওয়াযু' বা বিনয়ের প্রকৃতি এমন ছিলো যে, তিনি খাদেমগণকেও ধমকের সুরে কিছু বলতেন না। কটুকথাও বলতেন না। এমনকি এমনও বলতেন না যে, কেনো এমন করেছো? বা এমন করোনি কেনো? পরিবার পরিজনের প্রতি তিনি যেরূপ মেহেরবানী করতেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ ছাড়া কাউকে কখনও হাত দ্বারা প্রহার করেননি। দ্বীনের হক ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণে কারও থেকে কখনও কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা

(রাঃ) কে লোকেরা জিজ্ঞেস করতো, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন ঘরে তশরীফ আনতেন, তখন তাঁর অবস্থানের ধরন কেমন হতো? তিনি বললেন, হুজুর পাক (সঃ) সর্বাধিক মিষ্টভাষী, হাসি খুশি ও মৃদু হাসির লোক ছিলেন। তাঁর বিনয়ের ধরন এমন ছিলো যে, সাহাবাগণের সঙ্গে উপবেশনকালে তাঁদের সামনে তিনি কদম মুবারক লম্বা করে রয়েছেন এমন কখনও কেউ দেখেননি। সাহাবায়ে কেরাম অথবা পরিবার পরিজনের ভিতরে কেউ যদি কখনও তাঁকে সম্বোধন করতেন; তখন তিনি 'লাব্বায়কা' বলে জবাব দিতেন।

হুজুর পাক (সঃ) এর আচার ব্যবহার এমন সুন্দর ছিলো যে, তিনি সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতেন। তাদের প্রতি কখনও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করতেন না। তিনি সকল গোত্রের সরদারগণকে সম্মান করতেন এবং তাদেরকে গোত্রের বিচারক নিযুক্ত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম কে কি অবস্থায় আছেন তার খোঁজ খবর নিতেন, এভাবে তাঁদের মন জয় করতেন। তিনি তাঁর সাথী সহচর সকলের প্রতি সমান নযর দিতেন, সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। ফলে সকলেই এ রকম ধারণা করতেন যে, তিনিই বোধ হয় অন্যান্য সকলের তুলনায় হুজুর পাক (সঃ) এর অধিক নৈকট্য লাভে ধন্য। মজলিশের অধিকার সকলকেই সমানভাবে প্রদান করতেন। তাঁর কাছে উপস্থিত অথবা খেদমতে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। কোনো লোক যখন তাঁর কানের কাছে এসে গোপন কোনো কথা বলতো, তিনি তা শেষ পর্যন্ত শুনতেন। কেউ হাত মুবারক চেপে ধরলে, তিনি হাত নরোম করে ছেড়ে দিতেন। যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় হাত ছাড়তো, ততক্ষণ স্বীয় হস্ত মুবারককে তার হস্তবন্ধন থেকে সরিয়ে নিতেন না। কোনো কারণে কখনো হুজুর পাক (সঃ) এর পেশানী মুবারকে ভাঁজ পড়তো (চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়তেন) বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হর্ষোৎফুল্ল ললাট মুবারকে বা খোশ আখলাকে ছেদ পড়তো। এ ধরনের কোনো কারণ সৃষ্টি না হলে তিনি সাধারণতঃ অবাধ মিলামিশা থেকে দূরে সরে থাকতেন, নিজেকে পরহেজ করে চলতেন। তাঁর প্রশস্ততা এবং প্রফুল্লচিত্ততার দ্বারা মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো। তিনি সকলের জন্যই পিতৃতুল্য, এমনকি তার চেয়েও অধিক স্নেহশীল ছিলেন। হক বা অধিকারপ্রাপ্তির ব্যাপারে সকলেই তাঁর কাছে সমান ছিলো। তাঁর স্বভাবে সর্বদাই প্রাণবন্ততা, হাসিখুশী ও মিষ্টি ভাষণ বিদ্যমান ছিলো। তিনি কখনও কটুকথা বলতেন না, কর্কশভাষী ছিলেন না, উচ্চস্বরে কথা বলতেন না,

ফাহেশা কথা বা কোনো দোষের কথা কখনও যবান মুবারক দিয়ে উচ্চারণ করতেন না।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, অনিন্দিত স্বভাবের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর চেয়ে অধিক কেউ ছিলো না। হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দশ বৎসর পর্যন্ত রসূল (সঃ) এর খেদমতে ছিলাম, কিন্তু আমি তাঁকে কখনও 'উহ্' বলতে শুনিনি বা তিনি কখনও আমাকে একথাটিও বলেননি যে, তুমি একাজ কেনো করেছো বা এমনটি করোনি কেনো?

হজরত জাবীর ইবন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি সর্বদাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে মৃদু হাসি অবস্থায় দেখেছি। সাহাবায়ে কেরামের সামনে কখনও তাঁকে পা মুবারক লম্বা করতে দেখিনি। কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর জন্য স্বীয় চাদর মুবারক বিছিয়ে দিতেন। যথেষ্ট খাতির করতেন। কাছে নিয়ে বসাতেন। কথা কাটাকাটি করতেন না, যতক্ষণ কেউ সীমালংঘন না করতো। বক্তা সীমা অতিক্রম করে ফেলবে বলে যখন আশংকা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন বা অন্য কোনো প্রসংগ টেনে পূর্ব আলোচনা সমাপ্ত করে দিতেন। আগন্তুক সাক্ষাতপ্রার্থীর খাতিরে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন এবং তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন। যখন আগন্তুকের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন, তখন আবার নামাজে মনোনিবেশ করতেন। দুস্থ রোগীর সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করতে কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। দরিদ্র মিসকীনদের সাথে বসে খেতেন। কোনো গোলাম ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত দিলে সে দাওয়াত কবুল করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। দাওয়াতী খানায় যবের রুটি আর গলিত চর্বির ঝোল এসব ব্যবস্থা থাকতো। কিন্তু তিনি তাই আনন্দচিত্তে গ্রহণ করতেন। সাহাবীগণের সঙ্গে সহজভাবে বসতেন। মজলিশের একেবারে শেষ প্রান্তে কোনো এক কোণেও যদি খালি জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন। সফরের সময় কখনও কখনও গাধার উপর আরোহন করতেন এবং কাউকে নিজের পাশে বসিয়ে সফর সঙ্গী বানাতেন। বনু কুরায়যা দিবসে তিনি যে গাধাটির উপর আরোহন করেছিলেন তার লাগাম ছিলো রশির আর তার পালানগুলি ছিলো খেঁজুর শাখার বাকলের। তিনি এমন উটের পিঠে আরোহণ করে হজ পালন করেছিলেন যার কাজাওয়াগুলি ছিলো অনেক পুরাতন। তার উপর বিছানো ছিলো চার দেরহাম মূল্যের একখানা চাদর। আর এ হজ পালন করেছিলেন ঐ সময়ে যখন ইসলামী বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন দেশ ও শহর অধিকৃত হয়েছিলো। যেদিন মক্কা বিজয়ের মহান গৌরব

মুসলমানদের অর্জিত হয়েছিলো, সেই দিন তিনি একশ' উঁট কুরবানী করে দিয়েছিলেন। আর ঐ সময় যখন তিনি মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে দিতে মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তাঁর 'তাওয়াযু'ও বিনয়ের ধরন এমন ছিলো যে, কাজাওয়ার সর্বাগ্রের কাষ্ঠ খন্ডের কাছে স্বীয় মস্তক মুবারক অবনমিত করে রেখেছিলেন। অথচ কোনো পরাক্রমশালী বাদশাহ্ যখন কোনো দেশ দখল করে, তখন সেখানে মস্তক উন্নত করে সদম্ভে প্রবেশ করে।

হজরত কায়স ইবন সাআদ আনসারী (রাঃ) এবং তাঁর পিতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ আনসারগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হজরত কায়স (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হুজুর আকরম (সঃ) অনুগ্রহ করে আমাদের ঘরে এলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় আমার পিতা হজরত সাআদ (রাঃ) বাহন হিসাবে একটি গাধা নিয়ে এলেন। হুজুর আকরম (সঃ) সেই গাধাটির উপর আরোহন করলেন। হজরত সাআদ (রাঃ) পুত্র কায়সকে লক্ষ্য করে বললেন, কায়স, তুমি যাও হুজুর (সঃ) এর সাথে থাকো। হজরত কায়স (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) আমাকে বললেন, কায়স! তুমি হেঁটে যাবে কেনো? আমার সঙ্গে বসো। আমি আদবের কারণে আপত্তি করলাম। তখন হুজুর আকরম (সঃ) আমাকে বললেন, হয় তুমি আমার সঙ্গে বসো নতুবা চলে যাও। আমার সাথে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হুজুর (সঃ) তখন হজরত কায়স (রাঃ) কে এরূপ বলেছিলেন, তুমি আমার সামনে আরোহন করো, কেননা বাহনের মালিকের হক সামনে বসা।

অন্য একদিনের ঘটনা। এইরূপ বাহনে এক সাহাবী কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হুজুর আকরম (সঃ) কে দেখে বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং হুজুর পাক (সঃ) কে আরোহন করালেন। হুজুর পাক (সঃ) তাঁকে সামনে বসালেন। এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক এক ঘটনা ইমাম তিবরী (রঃ) 'মুখতাসারুস্‌সিয়ার' কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। একদিন হুজুর পাক (সঃ) পালানবিহীন এক গাধায় আরোহন করে কুবার দিকে যাচ্ছিলেন আর হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হুজুরের পদাতিক সাথী ছিলেন। হুজুর (সঃ) হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন, হে আবু হুরায়রা আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বসাবো। তিনি আরয করলেন, হুজুরের যা মর্জি হয়। হুজুর (সঃ) বললেন, উঠ, আমার সঙ্গে বসে যাও। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন আরোহন করার উদ্দেশ্যে লাফ দিলেন, তখন তাঁর থাবা হুজুর পাক (সঃ)এর গায়ে লেগে গেলো। তিনি উঠতে পারলেন না। এমনকি উভয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হুজুর (সঃ) পুনরায় আরোহন করে

বললেন, আবু হুরায়রা তোমাকে আরোহন করিয়ে নিতে চাই। তিনি আরয করলেন, হুজুরের যা মর্জি হয়। এবারও তিনি উঠতে ব্যর্থ হলেন। আবার দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর তৃতীয়বার যখন হুজুর পাক (সঃ) তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। তখন তিনি আরয করলেন, কসম ঐ মহান আল্লাহ্তায়ালার যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, এ মুহূর্তে আমি আর হুজুর পাক (সঃ) কে তৃতীয়বারের মতো যমীনে ফেলে দিতে চাইনা।

ইমাম তিবরী বর্ণনা করেন, একদা হুজুর আকরম (সঃ) কোনো এক সফরে ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি দুম্বা জবেহ করে তা রান্না করতে বললেন। হুকুম পেয়ে সাহাবাগণ দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন আমি দুম্বা জবেহ্ করবো। অন্যজন বললেন, আমি তার চামড়া ছিলার দায়িত্ব নিলাম। তৃতীয়জন বললেন, আমি রান্না করবো। তখন হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, তাহলে লাকড়ী সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আমরাই তো একাজের জন্য যথেষ্ট, হুজুরের কষ্ট করার প্রয়োজন কি? তখন হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, আমি অবশ্য জানি যে, তোমরাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করিনা যে, তোমরা কাজ করবে আর আমি তোমাদের থেকে আলাদা থাকবো। তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে শুধু শুধু কেনো বসে থাকবো? আল্লাহ্তায়ালা এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর কোনো বান্দা আপন সাথী সঙ্গীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখুক।

একদা হুজুর আকরম (সঃ) এর জুতা মুবারকের ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিলো। সাহাবাগণের মধ্যে একজন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ), আমাকে অনুগ্রহ করুন, এটা আমি ঠিক করে দিই। তখন হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, নিজে স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে বসে থেকে অপরের মাধ্যমে কোনো কাজ করিয়ে নেয়াটা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।

একদা হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে কয়েকজন দূত এলে হুজুর আকরম (সঃ) তাদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্। এঁদের খেদমতের দায়িত্ব আমাদেরকে প্রদান করুন। তখন হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করলেন, এঁরা আমার সাহাবাগণকে যথেষ্ট সম্মান ও খেদমত করেছেন, কাজেই আমি নিজেই তার প্রতিদান পরিশোধ করতে চাই।

হুজুর আকরম (সঃ) পরিবার পরিজনের কাজকর্ম অনেক সময় নিজেই করে দিতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই করে নিতেন। জুতা মুবারক

ছিঁড়ে গেলে তা নিজেই ঠিক ঠাক করে নিতেন। নিজের বকরীর দুধ নিজেই দোহন করতেন। পোশাক পরিচ্ছদে উকুন হয়েছে কি না তা খুব লক্ষ্য করে দেখতেন। এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে, কাপড় বা মাথার উকুন তালাশ করো। অথচ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর দেহ মুবারকে উকুন হতোনা। এমনকি তাঁর দেহে মাছিও বসতো না। তাহলে হাদীছ শরীফে উল্লেখিত বিবরণ নিয়ে দ্বন্দের সম্মুখীন হতে হয়। এর উত্তর হচ্ছে, হুজুর পাক (সঃ) স্বীয় পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি এরকম অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন, যেনো তিনি কাপড়ের উকুন তালাশ করছেন। আসলে তিনি তা করতেন কাপড়ের ধূলা বালি দূর করে কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে। এছাড়া আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, তিনি এরূপ করতেন উম্মতকে শিক্ষা দেবার মানসে। উম্মত যেনো স্বীয় কাপড় চোপড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। উকুন ইত্যাদি হয়ে থাকলে তা ফেলে দিয়ে পরিচ্ছদাদি ব্যবহারোপযোগী করে রাখে। এরকম সুন্দর আমল অনুসরণ করে সুন্নত পালনের ছওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়। সম্ভবতঃ তিনি এ উদ্দেশ্যেই এরকম করতেন। (অনুবাদক)

হুজুর আকরম (সঃ) নিজের বাহন হিসাবে যে উটটি ব্যবহার করতেন, তা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবার কাজটি হুজুর পাক (সঃ) নিজেই করতেন এবং তার ঘাস খাদ্য ইত্যাদি উটের সামনে নিজেই নিয়ে দিতেন। আটার খামির তৈরীর কাজে তিনি খাদেমের সহযোগিতা করতেন। খাদেমের সঙ্গে বসে খানা খেতেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হুজুর পাক (সঃ) এর উক্ত কার্যাবলী কোনো কোনো সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। কোনো কোনো সময় এরূপ করে থাকলেও তা দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) এর অনেক খাদেম ছিলো এবং গোলামের সংখ্যা ছিলো দশ জন। উক্ত কার্যাবলী তিনি কখনও কখনও নিজে সম্পন্ন করতেন। আবার কখনও তাঁদেরকে হুকুম দিয়ে করাতেন। কখনও আবার তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন।বাজার থেকে সামান ক্রয় করে নিজেই বহন করে নিয়ে আসতেন। অন্যের উপর বহনের দায়িত্ব দিতেন না।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম। হুজুর (সঃ) চার দেরহামের বিনিময়ে একখানা পাজামা কিনলেন। তিনি ওজনকারীকে বললেন, মূল্য গ্রহণের বেলায় মাল খুব ভারী করে নাও। অর্থাৎ ওজনের সময় মাল কম বা সমান সমান নিও না বরং বেশি বেশি করে নাও। লোকটি হুজুর (সঃ) এর কথা

শুনে স্তম্ভিত হয়ে বললো, মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমি এরূপ কথা জীবনে কখনও শুনিনি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আফসোস! তুমি তোমাদের নবী (সঃ) কে চিনতে পারলেনা। একথা শুনামাত্র লোকটি তার হাত থেকে দাঁড়ি পাল্লাটি ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র হাতখানায় চুম্বন করতে উদ্যত হলো। তিনি হাত মুবারক টেনে সরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এরূপ করা তো আজমীদের কাজ। তারা তাদের বাদশাহ্ বা সরদারদের সাথে এরূপ করে থাকে। আমি তো আর বাদশাহ নই। আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। হুজুর আকরম (সঃ) এরূপ বলেছিলেন নেহায়েত বিনয়ের কারণে। তাঁর অভ্যাসই ছিলো এরকম। এরপর হুজুর আকরম (সঃ) পাজামাখানা উঠিয়ে নিলেন। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আগে থেকেই এরাদা করে রেখেছিলাম যে, পাজামাখানা আমি নিজে উঠেয়ে নিবো। কিন্তু হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করলেন, ছামানের মালিক ছামান বহনের হকদার। তবে হাঁ, কেউ যদি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার কারণে ছামান বহন করতে অক্ষম হয়, তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।

দুর্বল সনদের সাথে কোনো কোনো হাদীছে এরকম বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন হুজুর পাক (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্। আপনি কি পাজামাখানা পরিধান করবেন? তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ, আমি এটা সফর, একামত, দিন-রাত সর্বদাই পরিধান করে থাকি। কেননা বেশি বেশি করে সতর করার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে। আমি সতর ঢাকার জন্য এর চেয়ে বেশী উপযোগী আর কোনো পোশাক দেখিনা। ইবন হেব্বান, তবরানী ও উকায়লীও এই হাদীছখানা বর্ণনা করেছেন। তবে এসকল বর্ণনার সনদ দুর্বল। এই হাদীছখানার ভিত্তিস্থল হলেন ইউসুফ ইবন যিয়াদ ওয়াসেতী। তিনি নেহায়েতই দুর্বল একজন বর্ণনাকারী। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হজরত উছমান যুন্নুরাইন (রাঃ) কে যেদিন শহীদ করা হয়েছিলো, সেদিন তিনি উক্ত পাজামা পরিহিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও অধিক আলোচনা করা হয়েছে 'শরহে সফরুস্সাআদাত' নামক কিতাবে। প্রয়োজনে তা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

একদা এক ব্যক্তি হুজুর আকরম (সঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁর ভয়ে লোকটি কাঁপতে লাগলো। তিনি বললেন, 'নিজকে সংবরণ করো কেঁপোনা। আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমাকে আমার জননী জন্ম দিয়েছেন। আমিতো ঐ কোরেশ বংশের লোক যারা কাদীদ নামক খাদ্য

গ্রহণ করে থাকে।' গোশতের শুটকিকে কাদীদ বলা হয়। তৎকালীন আরব দেশে ফকীর মিস্‌কীনদের খাদ্য ছিলো কাদীদ নামক শুটকি জাতীয় খাবার।

আরেক দিনের ঘটনা। হুজুর আকরম (সঃ) এর খেদমতে এক অপ্রকৃতিস্থ রমণী এসে বললো, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন, বসো। মদীনা শরীফের যে কোনো অলি গলি বা যে কোনো রাস্তায় আমাকে বসতে বললে আমি তোমার সঙ্গে বসবো এবং তোমার অভাব পূরণ করবো। হুজুর পাক (সঃ) রমণীটির সঙ্গে বসলেন এবং তার অভাব অভিযোগ শ্রবণ করে তা পূরণ করে দিলেন।

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, মদীনা শরীফের বাঁদীগণ নবী করীম (সঃ) এর কাছে আসতো এবং তাঁর হাত মুবারক ধরে টেনে নিয়ে যেতো। তারা যেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইতো, তিনি সেখানেই যেতেন। আপত্তি করতেন না। এরূপ ঘটনার মধ্যেও হুজুর পাক (সঃ) এর অসাধারণ বিনয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরুষ হোক বা নারী, আযাদ বা বাঁদী যে কেউ তাঁকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে তিনি নির্দ্বিধায় তাদের সঙ্গ প্রদান করতেন। কেউ যদি মদীনা শরীফের বাইরেও তাঁকে নিয়ে যেতে চাইতো, তাতেও তিনি আপত্তি করতেন না। 'তাওয়াযু' বা বিনয়ের এবং অহংকার বর্জনের এর চাইতে উত্তম নিদর্শন কল্পনাই করা যায় না। কোনো মুসলমান বিধবা অসহায়া মহিলার সঙ্গে কোথাও গমন করাকে হুজুর পাক (সঃ) লজ্জার কারণ মনে করতেন না।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আবিল হুসামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আমি একবার হুজুর পাক (সঃ) এর কাছ থেকে কোনো একটি জিনিস ক্রয় করেছিলাম। তার কিছু মূল্য বাঁকি ছিলো। আমি হুজুর (সঃ)এর কাছে ওয়াদা করেছিলোম যে, অমুক জায়গায় গিয়ে আমি বাকি মূল্য পরিশোধ করে দিবো। কিন্তু আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তিনদিন পর আমার সে কথা স্মরণ হলে সেখানে চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, হুজুর পাক (সঃ) সেখানেই অবস্থান করছেন। হুজুর (সঃ) আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলে দিয়েছো। তিনদিন ধরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় আছি। আবু দাউদ শরীফে এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঘটনায় হুজুর পাক (সঃ) এর সীমাহীন বিনয়, ধৈর্য্য ও ওয়াদা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাইয়েদুনা ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ওয়াদাপালনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হজরত ইসমাইল (আঃ) ছিলো সাচ্চা ওয়াদাপালনকারী।

-নবী করীম (সঃ) এর শরীয়তের অনুসরণকারী উম্মতের কোনো কোনো বুযুর্গ সম্পর্কেও ওয়াদা পালনে এরকম একনিষ্ঠতার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন গাউছুস সাকালাইন বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) কোনো এক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে কৃত ওয়াদা পালনার্থে পুরা একটি বৎসর তাঁর প্রতীক্ষায় কোনো একস্থানে বসেছিলেন। আর সেই বুযুর্গ ব্যক্তি হলেন খিযির (আঃ)।

তৎকালীন আরবদেশের দস্তুর ছিলো মদীনা শরীফের বাঁদীরা পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে হুজুর আকরম (সঃ) এর দরবারে আগমন করতো। তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক তাদের আনীত পাত্রের পানিতে স্থাপন করতেন। আর তারা সে পানি নিয়ে রুগীদের গায়ে মুখে ছিটিয়ে দিতো। কখনো কখনো এমনও হতো যে, শীতকালের সকাল বেলায় তারা ঠাণ্ডাপানি নিয়ে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে চলে আসতো। তিনি তাদের সন্তুষ্টির খাতিরে হাতে ঠাণ্ডা অনুভব করা সত্বেও পানি স্পর্শ করতে দ্বিধা করতেন না। কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির কাছ থেকে তাবাররুক গ্রহণ করা বৈধ—এসব ঘটনা তার দলীল।

পূতপবিত্রা স্ত্রীগণের সঙ্গে সদাচরণ

হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর পূতপবিত্রা স্ত্রীগণের সঙ্গে খুবই উত্তম ব্যবহার করতেন। তাঁদেরকে সাহচর্য ও মানসিক শান্তি প্রদান করতেন। আনসারগণের শিশুদেরকে এনে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর কাছে খেলাধূলা করার জন্য ছেড়ে দিতেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) যে পাত্রে পানি পান করতেন, হুজুর পাক (সঃ) সেই পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন এবং যেখানে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুখ লাগাতেন হুজুর (সঃ)ও সেখানেই মুখ লাগাতেন। হুজুর (সঃ) যখন মেসওয়াক করতে চাইতেন মেসওয়াকখানা প্রথমে আয়েশা (রাঃ) এর হাতে দিতেন। তিনি তা নিজের মুখে চিবিয়ে মোলায়েম করে দিলে হুজুর (সঃ) তাঁর হাত থেকে নিয়ে মেসওয়াক করতেন। এটা শেষ সীমার 'তাওয়াযু' ও আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার নিদর্শন। রোজাদার থাকা অবস্থায় হুজুর আকরম (সঃ) আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর উরুর উপর হেলান দিতেন এবং তাঁর চুম্বন গ্রহণ করতেন। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে হাবশীদের খেলা (তীর নিক্ষেপ) দেখাতেন। আর আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তখন তাঁর গণ্ডদেশ হুজুর (সঃ) এর কাঁধ মুবারকের উপর হেলান দিয়ে রাখতেন। এসব ঘটনা আয়েশা (রাঃ) এর বাল্যবেলার ঘটনা। একদিনের ঘটনা—হুজুর আকরম (সঃ) আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) এর সঙ্গে

দৌড়ে জিতে গেলেন। কিছুদিন পর আবার দৌড় অনুষ্ঠিত হলো। এবার হুজুর (সঃ) আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে হারিয়ে দিলেন। প্রথম দৌড়ে আয়েশা (রাঃ) জিতে যাওয়ার কারণ এই ছিলো যে, তখন তাঁর শরীর স্বাভাবিক ধরনের ছিলো। আর পরের বার যেহেতু তুলনামূলকভাবে আগের চাইতে অনেকটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাই দৌড়ে হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেননি। দ্বিতীয় দৌড়ে হেরে গেলে নবীকরীম (সঃ) তাঁকে বললেন, প্রথম বারে হেরে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় বারে জিতে তার বদলা নিলাম।

একদিন হুজুর আকরম (সঃ) হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে তশরীফ আনলেন। হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর জন্য খাবার পাঠালেন। খাবারের পাত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার সময় হজরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) হাতে লেগে পাত্রটি মাটিতে পড়ে গেলো। পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো আর আহার্য দ্রব্য মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। হুজুর (সঃ) ভাঙা পাত্রের টুকরাগুলি কুড়িয়ে নিলেন এবং খানাগুলিও মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য একটি পাত্রে রেখে উপস্থিত সকলের প্রতি ওযরখাহী পেশ করে বললেন, এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এরপর হুজুর (সঃ) হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘর থেকে একখানা ভালো পেয়ালা নিয়ে খাদেমের মাধ্যমে হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশার (রাঃ) ঘর থেকে খাবারও নিয়ে এসে বললেন, পেয়ালার বদলে পেয়ালা এবং খানার বদলে খানা দেয়া হলো। এসব ক্ষেত্রে মানুষের অত্যধিক রাগের উদ্রেক হয়ে থাকে। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকা উত্তম চরিত্রের নিদর্শন। তার দলীল স্থাপন করেছেন হজরত মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। এ ধরনের অবস্থায় স্ত্রীকে শাস্তি দিলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসে। কেননা দুঃখ ও রাগের অবস্থায় নারী জাতির মর্যাদার কথা স্মরণ থাকেনা।

একদিন হজরত সাউদা (রাঃ) হুজুরপাক (সঃ) এর জন্য শুরবা নিয়ে এলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হজরত সাউদা (রাঃ) কে বললেন, তুমিই পান করো। কিন্তু তিনি তা পান করলেন না। হজরত আয়েশা (রাঃ) পুনরায় তাঁকে বললেন, তুমি এ শুরবা পান করে ফেলো, নতুবা আমি তোমার মুখে মেখে দেবো। তিনি তাতেও পান করলেন না। এরপর হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত সাউদা (রাঃ) এর মুখের উপর উক্ত শুরবা লেপন

করে দিলেন। হুজুর আকরম (সঃ) তা দেখে হাসছিলেন। তিনি হজরত সাউদা (রাঃ) কে বললেন, ঠিক আছে তুমিও তাঁর মুখে মেখে দাও। হজরত সাউদা (রাঃ) হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর মুখের উপর শুররা লেপন করে দিলেন। হুজুর (সঃ) তা দেখে পুনরায় হেসে উঠলেন।

স্ত্রীগণের প্রতি হুজুর পাক (সঃ) এর আচরণ এমন ছিলো যে, তাঁরা কখনো রাগ করলে বা মেযাজ দেখালে তার জন্য তিনি কোনোরূপ শাস্তি আরোপ করতেন না। তিনি তাঁদেরকে অক্ষম মনে করতেন। আর তাঁদের উপর শরীয়তের আহ্কাম ও আদল প্রয়োগ করলে নেহায়েত মোলায়েম ও নম্রতার সাথে করতেন।

কোনো ব্যক্তি যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর জীবন সম্পর্কে নিগুঢ়ভাবে চিন্তা করে যে, তিনি পরিবার-পরিজন, সাহাবী, ফকীর-মিসকীন, এতীম বিধবা, মেহমান, আগন্তুক ইত্যাদির প্রতি কি রকম আচরণ করতেন— তাহলে জানতে পারবে, হুজুর পাক (সঃ) এর জ্যোতির্ময় অন্তরে নম্রতা ও দয়া মেহেরবানীর এমন এক সীমাহীন অবস্থা বিরাজিত ছিলো যা অন্য কোনো মাখলুকের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায়না। তার পাশাপাশি শরীয়তের হদ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি এতো কঠোর ছিলেন যে, কোনো মাখলুক সে সীমায় পৌঁছতে কখনো সক্ষম হবে না। তাঁর আখলাক ও আমল সমূহের নিগুঢ় তত্ত্বে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তাঁর আমল ও আখলাক সম্পূর্ণই মোজেজা এবং নবুওয়াতের নিদর্শন।

হুজুর আকরম (সঃ) সকলের সঙ্গে হাসি-খুশী ও খোলামেলা আচরণ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মিলেমিশে কথাবার্তা বলতেন। কখনো কখনো তাঁদের সঙ্গে হাস্যরসিকতাও করতেন। তবে এসবের উদ্দেশ্য ছিলো মনোরঞ্জন। রসিকতার ভাবভঙ্গি ও আলোচ্য বিষয় কিন্তু অর্থহীন ছিলোনা। বাচ্চাদের সঙ্গে নিজে খেলাধূলা করতেন এবং তাদেরকে নিজের কোলে বসাতেন। আযাদ, গোলাম, বাঁদী মিসকীন নির্বিশেষে সকলের দাওয়াত কবুল করতেন। কখনো রুগীদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য মদীনা শরীফের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যেতেন। কোনো কোনো হাদীছ শরীফে অবশ্য হাস্যরসিকতা ও খেলতামাশা করা সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ সমস্ত হাদীছ দ্বারা খেলতামাশা ও হাস্যরসিকতায় অতিরঞ্জিত করাকে বুঝানো হয়েছে। আর অতিরঞ্জিত করার অর্থ হচ্ছে এমন খেলতামাশা ও হাস্য রসিকতায় লিপ্ত হওয়া যার কারণে মানুষ আল্লাহ্ পাকের স্মরণ ও দ্বীনের চিন্তা ফিকির থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। আর যে উক্ত কাজকে সার্বিক ও বিশুদ্ধ রাখতে পারবে, তার জন্য এটা মোবাহ্ বা বৈধ। আবার এ সবের

উদ্দেশ্য যদি হয় কাউকে খুশি করা ও তার হৃদয় জয় করা (দ্বীনের খাতীরে) তাহলে এটা মোস্তাহাব। যেমন হুজুর আকরম (সঃ) করে থাকতেন।

হুজুর আকরম (সঃ) এর মহান চরিত্রে যদি তাওয়াযু বা বিনয়, প্রেম-ভালোবাসা ও হাসিখুশি ভাব না থাকতো, তবে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সাহস হতোনা? কেননা তাঁকে চূড়ান্ত সীমার শান-শওকত, ভীতিপ্রদ ভাবগাম্ভীর্য, বিশালতা ও ঐশ্বর্য প্রদান করা হয়েছিলো। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরম (সঃ) ফজরের সুন্নত আদায় করার পর হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে যদি জাগ্রত পেতেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। অন্যথায় জায়নামাজের উপর এক পার্শ্বে কাত হয়ে আরাম করতেন। এরপর বাইরে এসে জামাতে ফরজ আদায় করতেন। তার কারণ এই যে, রাত জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির আযকারে মশগুল থাকার মাধ্যমে হকতায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর উপর যে নূরের বর্ষণ হতো, নৈকট্য ও বিশেষত্ব লাভের পরিপ্রেক্ষিতে হকতায়ালার পক্ষ থেকে কালাম শ্রবণ করা, মুনাজাত কবুল হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর উপর এমন এক অবস্থার উদ্ভব হতো যার বর্ণনা প্রদান করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ঐ হাল বিদ্যমান থাকাকালে হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করা বা তাঁর সোহবতে অবস্থান করা কারও পক্ষেই সম্ভব হতো না। তাই তিনি উক্ত হাল থেকে কিঞ্চিৎ হালকা হওয়ার জন্য হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর সঙ্গে কথোপকথন করতেন বা জায়নামাজে গড়াগড়ি করে আরাম করতেন। যাতে হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ভালোবাসা থেকে প্রাপ্ত তাছীর তাঁর উক্ত হালের পরিবর্তনে সহায়ক হয়। অথবা যে যমীন সমস্ত সৃষ্টির মূল তাতে গড়াগড়ি দিয়ে হালের পরিবর্তন আনতে প্রয়াস পেতেন। এহেন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত উচ্চতর মাকাম থেকে যখন অবতরণ করতেন, তখন মাখুলকাতের প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ্ হতেন। আর এরূপ করার কারণ হচ্ছে, তিনি মুসলমানগণের প্রতি বিনম্র এবং দয়াবান ছিলেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তিনি মুমিনগণের প্রতি দয়ালু'। এ সূক্ষ্ম তত্ত্বখানা 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে ইবনুল হাজ্জ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ হজরত শায়েখ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর এইরূপ হাল উপরোক্ত মাকামের সাথে নির্দিষ্ট ছিলো এমনটি নয়। বরং তিনি সর্বদাই আ'লা ইল্লিয়ীন (ঊর্ধগামীগণের ঊর্ধতম) এবং কুরব (নৈকট্য) এর মাকামে অবস্থান

করতেন। যাহেরে তিনি মাখলুকাতের সাথে সম্পর্ক ও সম্মিলন বজায় রাখলেও বাতেনে উক্ত সম্পর্ক ও সম্মিলন রাখতেন না। নিশ্চয়ই হুজুর পাক (সঃ) তাঁর স্নেহপরায়ণতা ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে যে আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে দাওয়াত ও আহকাম পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন, এটা আহাদিয়াতের মহান মাকাম থেকে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে অবতরণ। তাই তিনি মানুষের সঙ্গে উঠা বসা করেছেন। আল্লাহ্‌পাকের বাণী 'আমি কি আপনার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেইনি?' অনুসারে তাঁর মধ্যে এই আমানত পরিপূর্ণরূপে রাখা হয়েছিলো। যাতে করে তিনি পরিপূর্ণতার সাথে হকের দাওয়াত মাখলুকাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। রাত জাগরণের সময় এবং সুবেহ্ সাদেকের সময় হুজুর পাক (সঃ)এর সময়সমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়—গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মাকাম। এ দু'টি মাকামের পূর্ণতা হুজুর পাক (সঃ) এর জন্য খাছ। তবে তাঁর উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে উক্ত মাকামদ্বয়ের অংশ বা ফয়েয পেয়ে থাকেন।

হাস্যরসিকতার ধরন

হুজুর আকরম (সঃ) এর হাস্যরসিকতার ফলাফল ও তার বরকত আকাংখা গণনা করা এবং সীমিত করা সম্ভব নয়। একদিন হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কন্যা যিনি হুজুর পাক (সঃ) এর রবীবা ছিলেন—হুজুরের কাছে এলেন। ঐ সময় হুজুর পাক (সঃ) সবেমাত্র গোছল সেরেছেন। তিনি রসিকতা করে তাঁর মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। এ পানির বরকতে তাঁর চেহারায় এমন এক অপূর্ব লাবণ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো যা কখনো চেহারা থেকে বিলুপ্ত হয়নি। যৌবনের লাবণ্য সর্বদাই তাঁর চেহারায় বিরাজ করতো।

হজরত মাহমুদ ইবন রবী' একজন নবদীক্ষিত সাহাবী। যখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর তখন একদিন হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর বাড়ীতে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে একটি কূপ ছিলো। হুজুর আকরম (সঃ) বালতি দিয়ে পানি তুলে সে পানি পান করলেন।পানি পান করার পর রসিকতা করে হুজুর (সঃ) তাঁর সিক্ত মুখখানা হজরত মাহমুদ ইবন রবী' এর চেহারাতে সংস্থাপন করলেন। এর বরকতে তাঁর স্মরণ শক্তি এতো প্রখর হয়েছিলো যার বদৌলতে তাঁকে বর্ণনাকারী সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীছ বুখারী শরীফে আনা হয়েছে।

হুজুর আকরম (সঃ) এর রসিকতামূলক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম ঘটনা —এক বেদুইন ব্যক্তি, নাম তার যাহের। তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্য কখনো কখনো হাদিয়া হিসাবে এমন

তরিতরকারী নিয়ে আসতেন যা হুজুর (সঃ) পছন্দ করতেন। হুজুর আকরম (সঃ) তাঁকে শহরের জিনিসপত্র যেমন কাপড় চোপড় ইত্যাদি দান করতেন। হুজুর (সঃ) তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, যাহেরের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমি তার শহুরে বন্ধু। একদিন হুজুর (সঃ) বাজারে গিয়ে দেখলেন, যাহের সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি তিনি তাঁর পেছন দিক দিয়ে গিয়ে দু'হাত মুবারক দিয়ে তার চোখের উপর চেপে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে তাঁকে চোখ বন্ধ অবস্থায় জাপটে ধরে ফেললেন এবং নিজের পবিত্র বক্ষের সঙ্গে তাঁর পিঠখানা মিলিত করে ফেললেন। তিনি হুজুর (সঃ) কে চিনতে না পেরে বলতে লাগলেন, কে আমাকে জাপটে ধরেছে? শেষে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি আর কেউ নন্ স্বয়ং হুজুর (সঃ), তখন নিজেকে বন্ধনমুক্ত করার চেষ্টা করলেন না। তাঁর পিঠকে হুজুর আকরম (সঃ) এর সীনা মুবারকের সাথে আরও নিবিড় করে রাখলেন এবং পৃথক করার জন্য কোনোরূপ ইচ্ছাই করলেন না। কিছুক্ষণ পর হুজুর (সঃ) বললেন, এখানে এমন কেউ আছো যে এ গোলামটিকে ক্রয় করতে পারে। একথা শুনে যাহের বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ আপনি আমাকে দূষিত ও কম দামের জিনিস মনে করলেন? তখন হুজুর (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তো আল্লাহ্তায়ালার নিকট দূষিত এবং স্বল্প মূল্যের নও, বরং তুমি এক দুর্মূল্য বস্তু।

খাদ্যবস্তুর কোনো দোষত্রুটি বর্ণনা না করা হুজুর আকরম (সঃ) এর অন্যতম বিনয়। যদি মনে চাইতো খেয়ে নিতেন, আর মনে না চাইলে রেখে দিতেন। একথা তিনি কখনো বলতেন না যে, এ খাবার ভালো নয়। টক হয়ে গেছে, লবণ বেশী হয়েছে বা কম হয়েছে, শুরবা ঘন হয়ে গিয়েছে বা পাতলা হয়ে গেছে—এরূপ বলাবলি করতেন না।

ফায়দা

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করা অন্যায় এবং সুন্নতের খেলাফ। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, নিছক সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষ আলোচনা করা যেতে পারে। যদি এরকম বলে যে, মাল নষ্ট করা হলো অথচ খাবার যথামানের তৈরী হলো না, তাহলে এরূপ বলা জায়েয হবে। তদুপরি লক্ষ্য রাখতে হবে, এরূপ আলোচনা বা বক্তব্যের দ্বারা পাচকের মনে আঘাত লাগে কিনা। যদি তার মনে আঘাত লাগে তবে না বলাই উত্তম।

হুজুর পাক (সঃ) এর 'তাওয়াযু' বা বিনয়ের আরেকটি প্রকৃতি এরকম—যে সময় সাধারণভাবে দুনিয়ার নিন্দাবাদ করা হতো, তখন হুজুর

পাক (সঃ) বলতেন, তোমরা দুনিয়াকে মন্দ বলোনা। গালি দিওনা। কেননা, দুনিয়া হচ্ছে একটি উত্তম বাহন যা মুমেন ব্যক্তিকে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের এবং নাজাতের দিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। হুজুর পাক (সঃ) যমানাকে গালি দিতেও মানা করতেন। যেমন হাদীছে কুদসীতে এসেছে, নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেন, তোমরা যমানাকে গালি দিওনা। কেননা আমিই তো যমানা।

হুজুর আকরম (সঃ)এর কথায় কোনো অবাস্তব কিছু থাকতো না। যেমন রাজা বাদশাহ্ বা দুনিয়াদার লোকেরা বলে থাকে। তবে হাঁ, তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অবশ্য অনুমতির প্রয়োজন পড়তো। কেননা পরিবারপরিজনের সাথে তিনি যখন স্বীয় গৃহে নিরিবিলিতে অবস্থান করতেন, ঐ সময় অযাচিতভাবে কেউ সেখানে প্রবেশ করলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তাই অনুমতির প্রয়োজন ছিলো।

হুজুর আকরম (সঃ) বলতেন, তোমরা আমাকে ইউনুস ইবন মুতাই (আঃ) এর উপর মর্যাদা দিওনা এবং মুসা (আঃ) এর উপর আমাকে প্রাধান্য দিওনা। একথার মধ্যেও তাঁর বিনয়ের আভাস পাওয়া যায়। এ ধরনের আরও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। হুজুর আকরম (সঃ) যে এরশাদ করেছেন, 'আমি বনী আদমের সরদার' বা এজাতীয় যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাদ্বারা বাস্তবতার ও আল্লাহ্র নেয়ামতের স্বীকৃতিকে প্রকাশ করা হয়েছে। তদুপরি আল্লাহ্তায়ালার আদেশ মান্য করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করছেন, 'আপনার প্রভুর নেয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করুন'। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এর উত্তর এভাবে প্রদান করেছেন যে, হুজুর আকরম (সঃ) لاتفضلوا 'লাতুফাদ্দেলু' বা এ জাতীয় কথা ঐ সময় বলেছেন যখন তিনি سيد ولد ادم 'সাইয়্যেদু বুলদে আদাম' "সমস্ত বনী আদমের সরদার" এ মর্মে প্রকাশ্য ঘোষণা দেননি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সর্বাগ্রে সালাম প্রদান

হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর কাছে আগত আগন্তুককে আগেভাগে সালাম প্রদান করতেন। এটাও তাঁর বিনয়ের নিদর্শন। কেউ তাঁকে আগে সালাম দিলে তিনি তার উত্তর প্রদান করতেন। এখান থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হুজুর পাক (সঃ) এর রওযা শরীফের যিয়ারতকারীদের জন্য এ মহামূল্যবান নেয়ামত পাওয়ার শুভ সংবাদ রয়েছে। যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) তাঁর জাহেরী জীবনে উক্ত গুণে গুণান্বিত

ছিলেন। কাজেই এখনও সে গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তাই যিয়ারতকারী ব্যক্তি তাঁর সালাম লাভে ধন্য হবে। কোনো কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে তাঁদের কারামত হিসাবে স্বকর্ণে হুজুর পাক (সঃ) এর সালাম শ্রবণ করা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর দুনিয়ার জীবনে উম্মতের জন্য রহ্মত ছিলেন। কবরের জীবনেও ঠিক তেমনিভাবে উম্মতের জন্য রহ্মত হয়ে আছেন।

দানশীলতা

'জুদ' ও 'সাখা' শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ একই। কামুস অর্থাৎ অভিধান গ্রন্থে দেখানো হয়েছে জুদ মানে সাখা আর সাখা মানেই জুদ। সার্রাহ্ নামক গ্রন্থে এর অর্থ করা হয়েছে বীরত্ব। এ সম্পর্কে সংকলিত আছে যে, سخاوت 'সাখাওয়াত' এক স্বভাবগত গুণের নাম। যার বিপরীত শব্দটি হচ্ছে شح 'শুহ্' অর্থাৎ বখিলী। এ বখিলী মানুষের সত্তাগত ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তাই سخى 'সখী' শব্দটির প্রয়োগ আল্লাহ্তায়ালার ক্ষেত্রে বৈধ নয়। কেননা, তথায় তবিয়ত ও নফস বলতে কিছু নেই। জুদ এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে بخل 'বুখল' বা বখিলী। এটি একটি অর্জনযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাজেই প্রত্যেক সখীই জাওয়াদ কিন্তু প্রত্যেক জাওয়াদ সখী নয়। আর জাওয়াদ এর হাকীকত এই যে, কোনো গরয এবং বিনিময় তলব করা ছাড়া দান করা। তাই জাওয়াদ সিফতটি আল্লাহ্তায়ালার একটি সিফত। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা কোনো গরয ও বিনিময় ছাড়াই সমস্ত যাহেরী ও বাতেনী নেয়ামতসমূহ, অনুভব ও জ্ঞানগত যাবতীয় পূর্ণতা মাখলুকাতকে দান করেছেন। আল্লাহ্তায়ালার পর আজওয়াদুল আজওয়াদীন বা দানশীলগণের সেরা দানশীল হলেন তাঁর প্রিয় হাবীব জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সঃ)। তাঁর পর দানশীল হলেন উম্মতের মধ্যে উলামায়ে কেরাম, যারা এলমে দ্বীন বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সর্বাধিক দানশীল তারপর বনী আদমের মধ্যে আমি সর্বাধিক দানশীল। অতঃপর আমার পর যাঁরা এলমেদ্বীন শিক্ষা দেবে এবং তার প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকবে।

কাযী আয়ায মালেকী (রঃ) জুদ এবং সাখাওয়াত এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরও দু'টি গুণকে মিলিত করেছেন। সে দু'টি গুণ হচ্ছে كرم 'করম' (মহানুভবতা) ও سماحت 'সামাহাত' (ক্ষমাশীলতা)। তিনি বলেন,

এই সব শব্দগুলির অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তবে ওলামায়ে কেরাম এই শব্দ সমূহের অর্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁদের মতে এমন বস্তু যা মর্যাদাশালী ও মূল্যবান তা যদি মনের খুশিতে খরচ করা হয়, তাহলে তা হবে মহানুভবতা। তাঁকে আবার حريت 'হুররিয়াত' ও বলা হয়। যার অর্থ স্বাধীনচেতা। এ শব্দটি نزالت 'নাযালাত' এর বিপরীত। সাররাহ্ নামক গ্রন্থে নাযালাত এর অর্থ করা হয়েছে, নীচতা, মন্দ স্বভাব। نزيل-نزل 'নাযাল' ও নাযীল উহা থেকেই নির্গত। অভিধান গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এরকম:—

النزل والنزيل الخسيس من الناس المحتقر
فى جميع احواله

অর্থাৎ নাযাল ও নাযীল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নীচ প্রকৃতির এবং তার যাবতীয় স্বভাবে আচরণে নিকৃষ্টতা এবং মন্দভাব রয়েছে। 'সামাহাত' শব্দের ব্যাখ্যায় এরকম বলা হয়েছে যে, 'সামাহাত' এমন একটি গুণ যে, কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তুকে নিজে অধিক উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও মনের খুশিতে অন্যকে দান করে দেয়। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে شكاس 'শাকাস' যার অর্থ কঠিন স্বভাব। যেমন বলা হয় رجل شكس 'রাজুলুন শাকসুন' (কঠিন স্বভাবের লোক), قوم شكس 'কাওমুন শাকসুন' (অমুক কওম কঠিন স্বভাবের)।

'সাখাওয়াত' এর অর্থ হচ্ছে সহজভাবে কোনোকিছু খরচ করা এবং যা ভালো নয় তা হাসিল করা থেকে বেঁচে থাকা। আর 'জুদ' এর অর্থও তাই। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে تقتير 'তাকতীর' যার অর্থ খরচ করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা। সাররাহ্ গ্রন্থে তাকতীর এর অর্থ করা হয়েছে পরিবার পরিজনের বেলায় খরচ করাতে কৃপণতা করা।

কাযী আয়ায (রঃ) বলেন, রসূল পাক (সঃ) এর যাবতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের যতটুকু অবগতি, সে সমস্ত গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ হবে এমন কেউ নেই।

সাইয়্যেদুনা হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) সর্বাধিক সুন্দর, সবচেয়ে বড় বাহাদুর এবং সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। তার কারণ এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর ব্যক্তিসত্তা, সম্মানিত নফস ও তাঁর মেযাজ সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ ছিলো। এ তিনটি গুণে যিনি গুণান্বিত হতে পারবেন, তাঁর কার্যাবলী হবে

সর্বোচ্চ সুন্দরতম, তাঁর সুরত হবে সবচেয়ে কমনীয় এবং তাঁর চরিত্র হবে সুন্দর। হুজুর আকরম (সঃ)এর মধ্যে জিসমানী ও রুহানী কামালাত ছিলো। তাঁর মধ্যে দৈহিক ও চারিত্রিক উভয় প্রকারের সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছিলো।তাই তিনি সর্বাধিক মহানুভব, সবচেয়ে বেশী প্রশস্তহৃদয় ও দানবীর ছিলেন।

কোনো ব্যক্তি কিছু যাঞ্চা করলে 'না' বলেছেন—এরকম ঘটনা হুজুর আকরম (সঃ) এর জীবনে একটিও নেই। ছহি হাদীছসমূহে একরমই বর্ণনা এসেছে। তিনি সকল প্রার্থনা কবুল করতেন এবং প্রার্থিত বস্তু দান করতেন। এমর্মে তাঁর প্রশংসায় কবি ফরযদক বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) শাহাদের বাক্য ব্যতীত কখনো 'লা' কথাটি উচ্চারণ করেননি। যদি তাশাহহুদ বা কালেমা শাহাদাত না থাকতো তাহলে তাঁর لا 'লা' (না) সমূহ نعم 'নাআম' (হাঁ) এ পরিণত হতো।

প্রার্থনাকারীকে দেয়ার মতো হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু না থাকলে তিনি অপেক্ষা করতেন, ভালোকথা বলে মন সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পেতেন এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এরকম বলতেননা, তোমাকে কিছু দিতে পারবো না।

উলামায়ে কেরাম বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর লা দ্বারা কথা বলাতে দান করা থেকে মানা করে দেয়া নিশ্চিত হয় না। আবার এটাও নিশ্চিত হয় না যে, উযরখাহীর ভিত্তিতে তিনি লা বলতেন না। অথচ এক জামাতের কাছে তিনি উযরখাহী পেশ করে লা বলেছেন এরূপ বর্ণনা তো পাওয়া যায়। ঐ জামাতের লোকেরা হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সওয়ারী চেয়েছিলো। তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি তো এমন কোনো সওয়ারী পাচ্ছিনা যাতে তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। উলামায়ে কেরাম বলেন, لا اجدما احملكم عليه 'লা আজিদু মা আহমিলুকুম আলাইহে' এবং لا احملكم 'লাআহমিলুকুম' (আমি তোমাদেরকে আরোহন করাবো না) এ দু কথার অনেক পার্থক্য আছে। যদিও হুজুর আকরম (সঃ) আশআরী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে 'লাআহমিলুকুম' বলেছেন। এমনকি তাদের ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি কসম করেও বলেছেন, ওয়াল্লাহ্ লা আহমিলুলুম (আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে আরোহন করাবো না।) এরকম স্থানের উক্তি সম্পর্কে সমাধান এরকম—হয়তো হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে তখন কোনো সওয়ারী ছিলোনা। সওয়ালকারীদের এ সম্পর্কে জানাও ছিলো। তা সত্বেও তারা হঠকারীতার আশ্রয় নিয়েছিলো এবং রসূল আকরম

(সঃ) কে উত্যক্ত করছিলো। তখন তিনি তাদের এ ধরনের আচরণ এবং লোভকে অবদমনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের উক্তি করেছিলেন। এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে 'লা' শব্দ জারী না হওয়ার দ্বারা তাঁর মধ্যে কোনোরূপ কৃপণতা ছিলো না এটাই বুঝানো হয়েছে। বরং তাঁর অন্তর ছিলো মহান আর হস্ত মুবারক ছিলো প্রশস্ত। বখীল ও আন্তরিক বলহীন লোকেরা যেরকম করে থাকে, তিনি সেরূপ কখনও করতেন না। তাঁর যবান মুবারক থেকে 'লা' নির্গত না হওয়ার বক্তব্যের তাৎপর্য এটাই।

হুজুর আকরম (সঃ) এর দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা আছে, কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে পেয়ে যেতো। কথাটি দ্বারা তাঁর দানশীলতা প্রমাণিত হয় বটে। তবে একথাটির আরও গভীর তাৎপর্য আছে। তা হচ্ছে এই যে, হুজুর পাক (সঃ) যাঞ্চাকারীর জন্য যা উপযোগী হতো তিনি তাকে তাই দান করতেন। আবার কোনো কোনো সময় এমনও হতো যে, প্রার্থনাকারীর মঙ্গলার্থে কোনো জিনিস দান করা থেকে বিরতও থাকতেন। যেমন কোনো মুআমেলা ও হুকুম সংক্রান্ত ব্যাপার হলে দান করা থেকে বিরত থাকতেন। দান করলে যদি মুআমেলার আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হতো বা তাকে কোনোরূপ সংশোধন করার প্রয়োজন পড়তো. আর দান করলে সে সংশোধনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা থাকতো, তা হলে সেক্ষেত্রে দান করা থেকে বিরত থাকতেন। আবার দান করার দ্বারা লোভী হয়ে যাবে, চাওয়ার মতো একটি ঘৃণিত স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে বলে যদি তিনি আশংকা করতেন—তবে দান করা থেকে বিরত থাকতেন। এ সম্পর্কে হজরত হাকীম ইবন হাযাম (রাঃ) এর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি উম্মুল মুমিনীন হজরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং রসূল করীম (সঃ) এর দরবারে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি নবী করীম (সঃ) এর নিকট কোনো একটি বস্তু প্রার্থনা করেছিলেন। হুজুর (সঃ) তাঁকে সে বস্তুটি দান করেন নি। বরং তাঁকে বলেছিলেন, "আমি অবশ্য ইচ্ছা করলে বস্তুটি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু এ দানের সঙ্গে এক প্রকারের কালিমা এবং ঘৃণা সঙ্গী হয়ে যাবে।" তাই তিনি তাঁকে নসীহত করলেন, পারতপক্ষে সওয়াল না করাই ভালো। হুজুর আকরম (সঃ) এর এরূপ উপদেশ শুনে পরবর্তী জীবনে তিনি এমন হয়েছিলেন যে,

হাত থেকে যদি চাবুক পড়ে যেতো, উঠিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে কখনো বলতেন না।

হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) একদা কোনো একটি আমলের খাহেশ করলেন। হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করলেন, হে আবু যর! তুমি দুর্বল হও আমলের খাহেশ করো না। কারও কাছে কোনো কিছু চেয়োনা। এমন কি হাতের লাঠিও পড়ে গেলে কারও সাহায্যে উঠানোর চিন্তা করোনা। হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবা এবং বড় সাধক ছিলেন। তাঁর মত ছিলো যে, কোনো মাল জমা করা ও তা সঞ্চিত করে রাখা হারাম। যাকাত আদায় করলেও।

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, হুজুর আকরম (সঃ) কোনো বস্তু কোনো একটি সম্প্রদায়কে দেয়ার জন্য দান করলেন। তখন হজরত ওমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) কোনো ব্যক্তিকে কিছু দিতে সুপারিশ করলেন। প্রকৃত অবস্থা ছিলো এরকম যে, এই ব্যক্তি উক্ত জিনিস পাওয়ার উপযোগী। হজরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার জানা মতে সে মুমিন। — এরকম তিনি তিনবার বললেন। হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করলেন, এমন অনেক লোক আছে যাঁদেরকে তাদের সংশোধনের জন্য না দেয়াটাকেই আমি পছন্দ করি। হুজুর আকরম (সঃ) হজরত ওমর (রাঃ) এর মতো দু বার সে ব্যক্তি সম্পর্কে মুমিন বা মুসলিম শব্দের প্রয়োগ করলেন। (অর্থাৎ সে মুমিন বা মুসলমান আছে কথা ঠিকই)। তারপরও যখন হজরত ওমর (রাঃ) হুজুর (সঃ) কে বারবার অনুরোধ করছিলেন, তখন তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করলেন। এঘটনাটি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালার আখলাকের সাথে নিজের আখলাককে তৈরী করে নেয়া। যেমন আল্লাহ্তায়ালা কোনো বান্দাকে যদি মহব্বত করেন তখন তাঁকে দুনিয়ারী সুখ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করেন। আর যাকে আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসেন না, তাকে দুনিয়াতে অঢেল সম্পদ দান করে থাকেন। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন অবশ্য উদয় হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এখানে হুজুর (সঃ) দান করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। তাহলে কি তিনি এখানে 'না' শব্দ ব্যবহার করেননি? এর উত্তর এই যে, 'না' শব্দ ব্যবহার ছাড়াই— উক্ত অসম্মতি প্রকাশ করা সম্ভব। সম্ভবতঃ তিনি ঐ রূপই করে থাকবেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু।

মোটকথা এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) কোনো সওয়ালকারীকে বিমুখ করতেন না। তাঁর কাছে দেয়ার মতো কিছু না থাকলে বলতেন, আমার নামে কারও কাছ থেকে কর্জ করে নাও। যখন আমার কাছে কিছু এসে

যাবে, তখন তা পরিশোধ করে দেবো। একদিন তাঁর কাছে কোনো এক ব্যক্তি কিছু চাইলে হুজুর (সঃ) বললেন, আমার কাছে তো তেমন কিছু নেই। তুমি যাও, কারো কাছ থেকে কর্জ করে নাও। একথা শুনে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার ক্ষমতার বাইরে যা, সে ব্যাপারে তো আল্লাহ্পাক আপনাকে বাধ্য করেননি। কথাটি হুজুর পাক (সঃ) এর পছন্দ হলো না। এরপর একজন আনসারী হুজুর পাক (সঃ) কে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি যথেষ্ট দান করুন। আরশের অধিপতি যিনি, তাঁর কাছ থেকে কোনো স্বল্পতার আশংকা করবেন না। একথা শুনে হুজুর (সঃ) মৃদু হাসলেন। চেহারা মুবারকে উৎফুল্লতা প্রতীয়মান হলো এবং তিনি বললেন, আমাকে এমনই হুকুম করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একদিন হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে নব্বই হাজার দেরহাম আনা হলো। তিনি সেগুলি চাটাইয়ের উপর রেখে বন্টন করতে লাগলেন। কোনো প্রার্থনাকারীকে বঞ্চিত করলেন না। এভাবে সমস্ত দেরহাম দান করে দিলেন।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে বাহ্রাইন থেকে কিছু সামগ্রী আনা হলো। তিনি বললেন, এগুলি মসজিদে ছড়িয়ে দাও। একথা বলে তিনি মসজিদ থেকে বাইরে চলে এলেন এবং তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। যখন পুনরায় মসজিদে এলেন, তখন নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর সামগ্রীগুলোর কাছে গেলেন এবং ঐগুলিকে সকলের মধ্যে বন্টন করতে শুরু করলেন। এমন সময় হজরত আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমাকেও এখান থেকে কিছু দান করুন। কেননা আমি আমার নিজের এবং আকীল (রাঃ) এর ফিদইয়া দান করেছি। একথা শুনে হুজুর আকরম (সঃ) হজরত আব্বাস (রাঃ) এর চাদরকে এমনভাবে ভরে দিলেন যে, তিনি তা উঠিয়ে নিতে অক্ষম হয়েছিলেন। তখন হজরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আপনি কাউকে হুকুম দিন যেনো এগুলি আমার জন্য বহন করে নিয়ে দেয়। হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, না চাচাজান। এটা হতে পারেনা। আপনি যতোটুকু বহন করতে পারেন, ততোটুকুই গ্রহণ করুন। হুজুর পাক (সঃ) তাঁকে এই কথা বলেছিলেন তাঁর লোভপ্রবণতাকে দূর করার জন্য এবং তাঁকে আদব ও সৌজন্য শিখানোর জন্য। এরপর হজরত আব্বাস (রাঃ) উক্ত মাল ঘাড়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। হুজুর পাক (সঃ) বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর তিনি যখন সেখান থেকে উঠলেন, তখন আর

এক দেরহামও অবশিষ্ট ছিলোনা। হজরত ইবন আবী শায়বা (রাঃ) বর্ণনা করেন, উক্ত মালের পরিমাণ ছিলো একলাখ দেরহাম। এ মালগুলি হজরত আলা ইবন হাযরী বাহ্‌রাইন থেকে কর আদায় করে হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে প্রেরণ করেছিলেন। আর এটা ছিলো সর্বপ্রথম আদায়কৃত কর যা হুজুর (সঃ) এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো।

হুনায়ন বিজয়ের দিবসে হুজুর পাক (সঃ) এর দানশীলতার এবং মহানুভবতার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো, তা ছিলো সীমা, সংখ্যা ও অনুমানের গণ্ডিবহির্ভূত। কেননা, ঐ দিন প্রত্যেক আরবীয় ব্যক্তি শত শত উট ও হাজার হাজার বকরী লাভ করেছিলো। ঐ দিনের বেশির ভাগ দানই ছিলো মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। যাতে দুর্বল ইমানের অধিকারী ব্যক্তিরা পার্থিব সাহায্যের প্রভাবে ইমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সফওয়ান ইবন উমাইয়াও ঐ শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুজুর পাক (সঃ) তাঁকে প্রথমবার একশত বকরী দান করলেন। এরপর আবার একশত বকরী দান করলেন এবং তৃতীয় বার আরও একশত বকরী দান করলেন। আল্লামা ওয়াকেদী (রঃ) এর কিতাবে কিতাবুল মাগাযীতে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ দিন সফওয়ান ইবন উমাইয়া এত উট-বকরী লাভ করেছিলেন যে, তাঁর প্রান্তর ভরপুর হয়ে গিয়েছিলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেই দিন সফওয়ান (রাঃ) বলেছিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে নবী করীম (সঃ) ব্যতীত আর কোনো লোক দানশীলতায় এরকম বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারবে না।" হুজুর পাক (সঃ) দানের মাধ্যমে উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা করলেন যার মিশ্রন তাঁর মধ্যে ছিলো।

আবু সুফিয়ান ইবন হরব ও তাঁর পুত্র অপরিচ্ছন্ন অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ঐ দিন আবু সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আজতো কুরাইশ বংশের মধ্যে আপনার মতো সম্পদশালী আর কেউ নেই। কাজেই এখান থেকে আমাদেরকেও কিছু দান করুন। হুজুর (সঃ) মৃদু হেসে হজরত বেলাল (রাঃ) কে বললেন, তাঁকে চল্লিশ আওকিয়া রৌপ্য এবং একশত উট দিয়ে দাও। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পুত্র এযীদকেও এর কিছু অংশ দান করুন। আবু সুফিয়ানের এক পুত্রের নাম ছিলো এযীদ (রাঃ)। আর ইনি হজরত মুআবীয়া (রাঃ) এর ভাই ছিলেন। তাই হজরত মুয়াবীয়া (রাঃ) উক্ত নামানুসারে তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন এযীদ। হুজুর (সঃ) একথার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পুনরায় চল্লিশ আওকিয়া রৌপ্য ও একশত উট প্রদান করলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বললেন, আমার আরেক পুত্র মুআবীয়াকেও অংশ দেয়া হোক। হুজুর (সঃ) তাঁকেও ঐ পরিমাণ মাল

প্রদান করলেন। এবার হজরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ্‌র কসম, যুদ্ধের সময় আপনি যেরকম মহানুভব ছিলেন শান্তির সময়ও তেমনি মহানুভব আছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে উত্তম পারিতোষিক প্রদান করুন। এ ঘটনা হাওয়াযেন ও হুনায়ন বিজয় অধ্যায়েও বর্ণনা করা হবে। মক্কা বিজয়ের ঘটনার পর সেই আলোচনা আসবে। অবশ্য আলোচনাটি পুনরাবৃত্তি মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা পুনরালোচনা নয়। কারণ, এজাতীয় আলোচনা যতোই আসবে ততোই তা থেকে মেশক আম্বরের সুবাস উদগিরীত হবে।

হাওয়াযেন কবীলাকে পরজিত করাবার পর সে কবীলা থেকে মুসলিমবাহিনী অনেক বাঁদী পেয়েছিলেন। তা থেকে ছয় হাজার বাঁদীকে হুজুর আকরম (সঃ) তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। উক্ত যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী যেসমস্ত গনীমত লাভ করেছিলেন, তার সমষ্টি ছিলো নিম্নরূপ—

১। ছয় হাজার মানুষ। ২। বিশহাজার উট, ৩। প্রায় চল্লিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার আওকিয়া রৌপ্য। একেক আওকিয়ার ওজন ছিলো চল্লিশ দেরহাম। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া এর গ্রন্থকার হিসাব করে বলেছেন যে, হুনায়ন বিজয়ের সময় হুজুর পাক (সঃ) মানুষকে যে দান করেছিলেন সে মালের সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ শায়েখ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর দানশীলতা ও বদান্যতা সীমা, সংখ্যা, অনুমান ও কিয়াসের গণ্ডিবহির্ভূত ছিলো। যা কিছু বিদ্যমান ছিলো হুজুর (সঃ) এর বদান্যতা শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা। বরং তার চেয়ে লক্ষগুণ মালও যদিও তাঁর কাছে আসতো, তবুও তাঁর দানের অবস্থা এরকমই থাকতো।

প্রকৃতপ্রস্তাবে দানশীলতা ও বদান্যতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত গুণাবলী শর্ত নয়। বরং এগুণটি সত্তাগত, প্রকৃতিগত ও জন্মগত হয়ে থাকে এবং এর প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ অন্যরূপ হয়ে থাকে। প্রকৃত দানশীল ব্যক্তি যা কিছু হাতে আসে তাই দান করে দিয়ে থাকেন এবং এ দানের কারণে দারিদ্র ও অনটন আসার আশংকা ঘুনাক্ষরেও তাঁদের অন্তরে প্রবেশ করে না।

হুজুর পাক (সঃ) যখন কোনো অভাবী লোককে দেখতেন, তখন নিজের প্রয়োজন থাকা সত্বেও খাদ্যপানীয় অভাবীর হাতে তুলে দিতেন।

তিনি বিভিন্ন প্রকারে দান খয়রাত করতেন। কাউকে হেবা করতেন। কাউকে হক থেকে দান করতেন, কাউকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করতেন, কাউকে সদকা প্রদান করতেন। আবার কাউকে হাদিয়া প্রদান করতেন। কখনো এমন হতো যে, কোনো দোকানীর কাছ থেকে কাপড় ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করার পর আবার সেই কাপড় তাঁকেই দান করে দিয়েছেন। কখনো এমন হতো যে, তিনি কারো কাছ থেকে কিছু কর্জ করতেন এবং তাঁকে তা দেয়ার সময় বেশী দিয়ে দিতেন। কখনো কাপড় খরিদ করে তার মূল্যের চেয়ে বেশী দিয়ে দিতেন। কখনো কারো কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী তাঁকে বিনিময় দিয়ে দিতেন।

একদা এক মহিলা হুজুর পাক (সঃ) এর নিকট কিছু সুন্দর সুস্বাদু খেজুর নিয়ে এলো। হুজুর পাক (সঃ) এজাতীয় খেজুর খুব পছন্দ করতেন। হুজুর পাক (সঃ) বিনিময়ে বাহরাইন থেকে আনীত অলংকারাদি দিয়ে মহিলার দু'হাত ভরে দিলেন।

যে কোনো প্রকারে সম্ভব হতো হুজুর পাক (সঃ) দান খয়রাত হাদিয়া ইত্যাদি মানুষকে প্রদান করতেন, যদিও তাঁর নিজস্ব জিন্দেগী অত্যন্ত ফকিরী হালে অতিবাহিত হতো। কোনো সময় একমাস, কোনো সময় দু'মাস একটানা এভাবে অতিবাহিত হতো যে, হুজুর পাক (সঃ)এর পবিত্র গৃহে আগুনও জ্বলতো না। অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় পেট মুবারকের উপর পাথর বেঁধে নিতেন। এই যে, হুজুর পাক (সঃ) এর ফকিরী, দৈন্য ও অক্ষম অবস্থা এটা ধন সম্পদ না থাকার কারণে ছিলো এমনটি নয়। বরং মানুষকে সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে যে যাহেদানা জিন্দেগী তিনি পছন্দ করতেন, সেই কারণেই এমনটি হতো। কোনো কোনো সময় হুজুর পাক (সঃ) তাঁর স্ত্রীগণের জন্য মাসিক ব্যয়সমূহ জোগাড় করে তাঁদেরকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন না।

নবী করীম (সঃ) সাধারণভাবে সমগ্র বনী আদমের উপর সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতার বিভিন্ন ধরন ছিলো। জাগতিক বস্তু দান করা ছাড়াও এলেম দান করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য দ্বীনে হকের হেদায়েত দান করা ইত্যাদিও বদান্যতার পর্যায়ভুক্ত। যার সার্বিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর মাধ্যমে।

বীরত্ব ও বাহুবল

সাররাহ্ নামক কিতাবে হুজুর পাক (সঃ) এর বীরত্ব ও বাহুবল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ভীতিকর অবস্থায় বা স্থানে নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতা

প্রদর্শন করাকে বাহাদুরী বা বীরত্ব বলা হয়। শেফা নামক কিতাবে বলা হয়েছে, শক্তির প্রাচুর্য এবং তাকে আকলের অনুগত করার নাম শুজাআত বা বীরত্ব। কামুস বা অভিধানগ্রন্থে বলা হয়েছে, ভয়ভীতির সময় মনে সাহস সঞ্চার করা ও তাকে সুদৃঢ় রাখার নাম বীরত্ব। হুজুর পাক (সঃ) এর এগুণটি বদান্যতার গুণের ন্যায়ই পরিপূর্ণ ছিলো। অনেক সময় দেখা গেছে, কঠিন অবস্থায় যেখানে বড়ো বড়ো নির্ভীক লোকদেরও পদস্খলন হয়ে গেছে, সেখানে হুজুর পাক (সঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অটল রয়েছেন। স্বস্থান থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। বরং দৃঢ়তা সহকারে অধিক থেকে অধিকতর বেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। সামান্যতম পিছপা হননি। এব্যাপারে হুনায়ন যুদ্ধের অবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাফেরদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হয়েছে। যাতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক প্রকারের উত্তেজনা, পেরেশানী, চাঞ্চল্য এবং টলটলায়মানতার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) স্বস্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করলেন না। তিনি ঘোড়ার উপর আরোহন অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময় হজরত আবু সুফিয়ান ইবন হারেছ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মনে মনে কামনা করছিলেন, কাফেররা যেনো হামলা করে। হুজুর পাক (সঃ) অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে নামলেন। আল্লাহ্পাকের কাছে সাহায্য কামনা করলেন এবং পবিত্র হাতে এক মুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নিয়ে কাফেরদের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন। সেদিন হুনায়ন প্রান্তরে এমন একটি কাফেরও ছিলোনা যার চোখে মুখে সে ধূলিকণা পতিত হয়নি। হুজুর পাক (সঃ) তখন উচ্চারণ করছিলেনঃ

আনান্নাবিই লা কাজিব আনা বানু আব্দুল মোত্তালিব

অর্থাৎ আমি নবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের আওলাদ।

সেই দিন হুনায়ন সমরপ্রান্তরে হুজুর পাক (সঃ) এর চাইতে নির্ভীক, দুঃসাহসী ও বীরপুরুষ কাউকে দেখা যায়নি। বর্ণিত আছে, মুসলমানগণ ও কাফেররা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ পিছপা হয়ে গেলেন। তখন হুজুর পাক (সঃ) স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন এবং কাফেরদের উপর হামলা করলেন। ঐ সময় আনসারগণকে ডাক দেয়া হচ্ছিলো এগিয়ে আসার জন্য। এতে সাহাবাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় ফিরে এলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর পাশে একে একে সমবেত হতে লাগলেন। পরিশেষে মুসলমানগণেরই বিজয় হলো। এর বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

হজরত ইবন ওমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর চেয়ে অধিক বীরপুরুষ, নির্ভীক, দানশীল এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট আর কাউকে আমি দেখিনি। আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) বলেন, যুদ্ধের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে জ্বলতো এবং মুজাহিদগণের বক্ষসমূহ যখন রক্তিমবর্ণ ধারণ করতো, তখন আমরা হুজুর আকরম (সঃ) এর আশ্রয় অন্বেষণ করতাম। এমন অবস্থায় হুজুর পাক (সঃ) দুশমনদের সবচাইতে নিকটে অবস্থান করতেন এবং সমরপ্রাঙ্গনে তিনি কঠিনতম ব্যক্তিতে পরিণত হতেন।

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে বাহাদুর হিসাবে গণ্য করতো, যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের চাইতে হুজুর পাক (সঃ) এর বেশী নিকটে থাকতো।

হজরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রাঃ) বর্ণনা করেন, বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা করার জন্য হুজুর পাক (সঃ) সর্বাগ্রে এগিয়ে যেতেন।

হেকায়েত

এক রাত্রিতে মদীনা তায়্যিবায় একটি গুজব রটে গেলো এবং তাতে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। গুজবটি হলো এই যে, মদীনা শরীফে সম্ভবতঃ কোনো চোর বা দুশমন ঢুকে পড়েছে। খবর শুনে নবী করীম (সঃ) সকলের আগে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে তরবারী উঠিয়ে নিয়ে হজরত আবু তালহা (রাঃ) এর অশ্বের উপর আরোহন করলেন। তাঁর অশ্বটি খুব তেজস্বী এবং দ্রুতগামী ছিলো। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেদিক থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো, হুজুর পাক (সঃ) সেদিকে চলে গেলেন। হুজুর (সঃ) উক্তস্থান পরিদর্শন করে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন রাস্তায় ঐ লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো, যারা তাঁর পরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে বললেন, চলো, সকলেই ফিরে চলো। এখানে কিছুই ঘটেনি। হজরত আবু তালহা (রাঃ) এর ঘোড়াটি প্রথমে খুব ধীরগতি সম্পন্ন ছিলো। কিন্তু যখন হুজুর পাক (সঃ) তার উপর আরোহন করলেন, তখন ঘোড়াটি এত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে গেলো যে কারও ঘোড়াই তার সঙ্গে তাল রেখে দৌড়াতে পারছিলো না। এটি হুজুর পাক (সঃ) একটি অন্যতম মোজেজা ছিলো।

দৈহিক শক্তি ও পেশীবলের দিক দিয়ে হুজুর পাক (সঃ) এতো সুদৃঢ় ছিলেন যে, বিশ্বখ্যাত কোনো কুস্তিগীরও তাঁর সামনে টিকতে পারতো না। মোহাম্মদ ইবন ইসহাক (রঃ) স্বীয় কিতাবে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। মক্কা নগরীতে রুকানা নামক একজন পালোয়ান ছিলো। সে কুস্তিতে বিশেষ

পারদর্শী এবং শারীরিক শক্তিতে মক্কা নগরীতে অপ্রতিদ্বন্দী এক ব্যক্তিত্ব ছিলো। দূরদূরান্ত থেকে বীর পুরুষেরা তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আসতো। কিন্তু অবলীলাক্রমে সে তাদেরকে ধরাশায়ী করে দিতো। একদিন ঘটনাক্রমে সে হুজুর পাক (সঃ) এর সামনে পড়ে গেলো। হুজুর (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রুকানা, তুমি আল্লাহ্‌কে কেনো ভয় করছো না এবং আমার দাওয়াতকে কেনো কবুল করছো না? উত্তরে রুকানা বললো, হে মোহাম্মদ (সঃ) আপনার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করুন। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, কুস্তিতে যদি আমি তোমাকে পরাজিত করতে পারি তাহলে কি তুমি ইমান আনবে? সে বললো, হ্যাঁ। রসূল (সঃ) বললেন, তাহলে প্রস্তুত হও। কথাশুনে রুকানা পালোয়ান কুস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হুজুর (সঃ) কোনোরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন না। তিনি তাঁর সাধারণ পোশাক-চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। প্রথম আক্রমণেই হুজুর (সঃ) রুকানাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। রুকানার বিস্ময়ের অবধি রইলোনা। হুজুর (সঃ) তাকে এমনভাবে ধরলেন যে, নড়াচড়া করার উপায় নেই। ছেড়ে দেয়ার জন্য আবেদন করলে হুজুর (সঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর সে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার কুস্তি করলো। কিন্তু প্রতিবারেই তাকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হলো। প্রতিবারেই হুজুর (সঃ) তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন। এতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রুকানা বললো, আপনার কি আজীব শান! এতো শক্তির অধিকারী আপনি? এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি যে, রুকানা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিনা? ওয়াল্লাহু আ'লামু।

উক্ত কুস্তিগীর রুকানা ব্যতীত আরও অন্যান্য কুস্তিগীররাও হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তিনি সকলকেই পরাজিত করেছিলেন। আবুল আশাদ জাহ্‌মী নামক এক শক্তিশালী লোক ছিলো আরবদেশে। তার শারীরিক শক্তি এতো বেশী ছিলো যে, সে গরুর চামড়ার উপর উঠে দাঁড়িয়ে যেতো। লোকেরা তার চতুর্দিক দিয়ে তাদের গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চামড়া ধরে টানাটানি করতো। টানের চোটে চামড়া ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো কিন্তু তার পায়ের নীচ থেকে চামড়া সরিয়ে নিতে পারতো না। সে স্বস্থান থেকে একটুও বিচ্যুত হতোনা। একদিন সে হুজুর পাক (সঃ) কে বললো, আপনি যদি আমাকে যমীনের উপর ফেলে দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার উপর ইমান আনবো। হুজুর পাক (সঃ) তাকে ধরেই যমীনের উপর ফেলে দিলেন। কিন্তু হতভাগা এরপরও ইমান আনলো না। এটি একটি লম্বা চওড়া ঘটনা, যথাস্থানে এর আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

লজ্জাশীলতা

এ অনুচ্ছেদে হুজুর পাক (সঃ) এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। হায়া শব্দের অর্থ লাজুকতা। ইহার মূলধাতু حيات 'হায়াত' অর্থাৎ জীবন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'হায়া' এর অর্থ বৃষ্টিও হতে পারে। যেহেতু বৃষ্টি প্রাণীকুলের জীবনীশক্তির কারণ। হায়া বা লজ্জাশীলতা মানুষের অন্তরের জীবনীশক্তি অনুসারে হয়ে থাকে। যার হৃদয় যে পরিমাণ জাগ্রত তার হায়াও ঐ পরিমাণ অধিক ও শক্তিশালী। অভিধানে 'হায়া'র অর্থ করা হয়েছে تغير 'তাগায়্যুর' (রূপান্তর) ও انكسارى 'এনকেসারী' (অক্ষমতা)। এটা এমন একটি গুণ যা মানুষের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক করে এবং বিভিন্ন প্রকার দোষের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শরীয়তের পরিভাষায় হায়া এমন এক সৌন্দর্যগুণের নাম, যা মানুষকে অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। হকদারের হক আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। হায়াকে ইমানের অংশও বলা হয়েছে। এ অর্থে হাদীছ শরীফে এসেছে, লজ্জাশীলতা ইমানের অঙ্গ। যদিও এ গুণটি মানুষের মৌলিক, স্বভাবগত এবং জন্মগত গুণ। তথাপিও এর ব্যবহার শরীয়তের এলেম ও তার বাস্তবায়নের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন যে, হায়া অর্জনীয় গুণ। শরীয়তপ্রবর্তক লজ্জাশীলতাকে ইমানের অংশ হিসাবে নির্দেশ করেছেন এবং তা অর্জনের জন্য মুসলমানকে বাধ্য করে দিয়েছেন। এটা যদি মৌলিক ও স্বভাবগত গুণই হতো, তবে আল্লাহ্তায়ালা তার জন্য বান্দাকে বাধ্য করতেন না। তবে যাঁর মধ্যে এগুণটি স্বভাবগত ও মৌলিক হিসাবে বিদ্যমান থাকে, সে এই গুণ অর্জনে অধিকতর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাকে মৌলিকতার বিধানে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে এ বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার রাখা উচিত যে, হায়া সংক্রান্ত আলোচনা অন্যান্য সমস্ত মৌলিক গুণাবলী আলোচনার ন্যায়, যেমন- বদান্যতা, বীরত্ব ইত্যাদি। এগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য হুকুম করা হয়েছে এবং এর বৈপরীত্য থেকে মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে। এজাতীয় গুণাবলী সম্পর্কে পুরস্কারের ওয়াদা যেমন এসেছে, তেমনি তার খেলাফ করলে সে সম্পর্কে ধমকও দেয়া হয়েছে। এসবগুলি সবই ইমানের শাখা।

হুজুর পাক (সঃ) এর অর্জিত ও মৌলিক উভয়প্রকার হায়াই পূর্ণমাত্রায় ছিলো। কেননা, তাঁর পবিত্র কলবের জীবনীশক্তি সবচেয়ে মজবুত ছিলো এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় প্রবণতা থেকে কলবকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাঁর সর্বাধিক মজবুত, পূর্ণ ও উত্তম ছিলো। সহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)

অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীদের প্রতি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। সাররাহ্ নামক গ্রন্থে مخدره 'মুখাদ্দিরাহ্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে পর্দানশীন রমণী। হাদীছ শরীফে خدرها 'খাদরিহা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার ব্যবহারিক অর্থ হবে প্রচলিত ভাব অনুসারে। কেননা কুমারী মেয়েরা সাধারণত পর্দানশীন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, فى خدرها 'ফীখাদরিহা' শব্দ দ্বারা বাক্যকে যে কয়েদ (সীমিত) করা হয়েছে এটা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, পর্দানশীন নারীদের সাধারণত হায়া বা লজ্জাশীলতা বেশী থাকে। অথবা এই অর্থে যে, বাইরে অবাধে বিচরণকারিণী রমণীদের তুলনায় পর্দানশীনদের লজ্জাশীলতা বেশী থাকে। হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, অপর্দানশীনদের প্রতি তো হুজুর (সঃ) এর লজ্জাসংকোচ ছিলোই। পর্দানশীনদের প্রতিও তাঁর লজ্জা ছিলো অত্যধিক। কোনো মানুষ তাঁর কাছে এলে তিনি তার সাথে দেখা করতে যেতেন। নতুবা নির্জনে অবস্থান করতেন।

লজ্জাশীলতা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মাযহাব

হায়া বা লজ্জাশীলতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে তরীকতের মাশায়েখগণের কিছু বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। হজরত যুন্নুন মিসরী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, তুমি যা কিছুই হকতায়ালা শানুহুর কাছে প্রেরণ করো তাতে যখন অন্তরে ভয়াবহতার সাথে ভীতিপ্রদ অবস্থার আবির্ভাব ঘটবে সেই অবস্থার নামই হায়া। তিনি আরও বলেন, আলহুব্বুইয়ানতিকু ওয়াল হায়াউইয়াসকুতু ওয়াল খওফু ইয়াকলুক অর্থাৎ প্রেম প্রেমিককে বাকশীল বানিয়ে দেয়। হায়া মানুষকে মৌনব্রতী করে। আর ভয়ভীতি মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

হজরত ইয়াহ্ইয়া ইবন মোআয রাযী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালাকে লজ্জা করে, আল্লাহ্তায়ালা সে বান্দার গোনাহের প্রতি লজ্জা করেন। হায়া বা লজ্জাশীলতা সম্মান ও ভয় উভয়ের মিশ্রিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে। যেমন হুজুর আকরম (সঃ) ঐ দলের প্রতি লজ্জা করছিলেন, যাঁরা হজরত যয়নব (রাঃ) এর বিয়ের ওলীমায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা উক্ত অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) লজ্জা করছিলেন এই ভেবে যে, তাঁদেরকে কেমন করে উঠিয়ে দেবেন। ঐ অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা আয়াত নাযিল করে তাঁদেরকে সেস্থান ত্যাগ করার জন্য হুকুম দিয়ে দিলেন। আল্লাহ্তায়ালা এমর্মে এরশাদ করলেন, আহার সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসে থাকা নবী (সঃ) এর কষ্টের কারণ। অথচ নবী (সঃ) লজ্জা করছেন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সত্য প্রকাশ করতে কোনোরূপ লজ্জা করেন না।

লজ্জা কখনও বন্দেগীর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। মাবুদের মহত্ব ও পূর্ণতার উপযোগী বন্দেগী না হওয়ার কারণে বান্দা তার প্রতিপালকের প্রতি লজ্জা করে থাকে।

আরেক প্রকারের লজ্জা আছে যা বান্দা নিজের প্রতি আরোপ করে থাকে (অর্থাৎ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়)। এ ধরনের লজ্জা সম্মানিত এবং বুজুর্গ লোকদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এটা উপর্যুক্ত মর্তবার চেয়ে কম মর্তবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে নিহিত। কাজেই নিজেকে নিজের কাছে লজ্জাশীল বানানো উচিত। লজ্জার এ প্রকারটি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের মধ্যে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা বিদ্যমান। তম্মধ্যে একটি নিন্দনীয় কাজ করলে অপরটি তার প্রতি লজ্জিত হয়। লজ্জার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এ প্রকারটি সবচেয়ে পূর্ণ এবং উন্নতমানের। মানুষ যখন স্বীয় সত্তার প্রতি লজ্জাশীল হয়ে যাবে, তখন অপরের প্রতি তো আরও বেশী লজ্জাশীল হবে।' 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এরকম উল্লেখ করা হয়েছে।

হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, লজ্জা মানুষকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুই দান করেনা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, লজ্জাশীলতা সর্বতঃরূপে কল্যাণ। হাদীছ শরীফে একটি ঘটনা এসেছে। এক ব্যক্তি তার ভাইকে সংকোচ না করার জন্য নসীহত করেছিলো। ভাইটি লজ্জাশীলতার কারণে মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্য চেয়ে নিতেও লজ্জা করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে লোকটি তার ভাইকে উপদেশ দিতো যে,হক আদায় করার ব্যাপারে লজ্জা করা উচিত নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর পাক (সঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, তাঁকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জাশীলতা ইমানের অঙ্গ।

মানুষের দোষ গোপন করা এবং এমন কাজ যা মানুষ নিজের জন্য পছন্দ করে না, তা কারো মধ্যে দৃষ্টিগোচর হলে সে ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখা লজ্জাশীলতার নিদর্শন। হুজুর পাক (সঃ) এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রণী ছিলেন।

এক বর্ণনায় হজরত আনাস (রাঃ) থেকে সংকলিত আছে—এক ব্যক্তি হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে এলো। তার চেহারার উপর হলুদ রঙের ন্যায় যাফরান লেপন করা ছিলো। তা কোনো মেয়েলোকের কাছ থেকে লেগে থাকবে হয়তো। লোকটি লজ্জা পাবে ভেবে হুজুর পাক (সঃ) তাকে কিছুই

বললেন না। কেননা, হুজুর পাক (সঃ) এর সম্মানিত স্বভাব এরকম ছিলো যে, অপছন্দনীয় কিছু দেখলেও সে সম্পর্কে তিনি মুখের উপর কাউকে কিছু বলে দিতেন না। কাউকে কিছু বলা যদি নেহায়েত প্রয়োজনই পড়তো এবং এ ব্যাপারে যদি তিনি বাধ্য হয়ে যেতেন, তখন ইশারা ইঙ্গিতে তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন। লোকটি যখন হুজুর পাক (সঃ) এর কাছ থেকে বাইরে গেলো, তখন তিনি একজনকে বললেন, তাঁকে যেয়ে বলো চেহারার উপর থেকে যেনো হলুদ রংগুলি ধুয়ে ফেলে। অন্য এক বিবরণে আছে, রসূল (সঃ) বলেছিলেন, "তাঁকে বলে দাও যে তাঁর দেহ থেকে যেনো কাপড় খুলে ফেলে। (সম্ভবতঃ কাপড়ে হলুদ রঙ মিশ্রিত হয়েছিলো)। এঘটনায় একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা উচিত যে, হুজুর পাক (সঃ) এর উক্ত কথায় হলুদ রঙ বর্জন করা ওয়াজিব এবং উহা ব্যবহার করা হারাম—এ পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো না। (এক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা বর্জনের ইঙ্গিত ছিলো)। যেহেতু হলুদ বর্ণ ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র লজ্জাশোভিত অবস্থা এরকম ছিলো যে, তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কারো চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। যদি এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হতো যা তাঁর পছন্দনীয় নয়, তখন এমন কথা বলতেন না যে, অমুক ব্যক্তি এমন বলে, বা এমন করে। বরং বলতেন, এ সম্প্রদায়ের কি অবস্থা হবে, যারা এমন কাজ করে বা এমন কথা বলে এবং এমনিভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে। যারা করে বা যারা বলে বিশেষ করে তিনি তাদের নাম উচ্চারণ করতেন না। তাঁর সম্মানিত অভ্যাসে এজাতীয় উক্তি ছিলো তাঁর বক্তব্যের মূলনীতি স্বরূপ। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি কাউকে মন্দও বলতেন না। উচ্চস্বরে কোনো কথাও বলতেন না। হাটে বাজারে যেয়ে কোনো শোরগোলও করতেন না। মন্দ কাজের বদলা মন্দ দিয়ে শোধ করতেন না। বরং ক্ষমা ও বাৎসল্যই তাঁর কাজের নীতি। তাওরাত কিতাবও হুজুর আকরম (সঃ) এর এরকম গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে। এর সমর্থনে তাওরাত থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম (রাঃ) ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ)।

স্নেহ, দয়া ও মেহেরবানী

হুজুর আকরম (সঃ) এর স্নেহ, দয়া ও মেহেরবানী সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আপনাকে সমস্ত আলমের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন,

তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্য এমন একজন রসূল আগমন করেছেন, তোমরা কষ্টে পতিত হয়ে যাবে এই চিন্তা তাঁর কাছে অসহনীয়, তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য অত্যধিক আগ্রহী। মুমিনদের ব্যাপারে স্নেহশীল ও মেহেরবান।

شفقت 'শফকত' মেহেরবানীকে বলা হয়। হুজুর আকরম (সঃ) শফীক অর্থাৎ মেহেরবানীকারী বা দয়াপ্রবণ ছিলেন। 'এশফাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ ভয় প্রদর্শন করা। শফকত শব্দেও এ অর্থ পাওয়া যায়। কেননা 'মুশফিক' ভয় করে থাকে, ক্ষতিকর কোনোকিছু তাকে স্পর্শ করে কিনা। কাজেই হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রশংসায় শফীক বা মুশফিক শব্দ প্রয়োগ না করে حريص 'হারীস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু তিনি মানুষের সংশোধন ও পরিশুদ্ধি আসুক, এ ব্যাপারে লোভাতুর থাকতেন এবং সেজন্য মানুষকে উপদেশ প্রদান করতেন। نصوح 'নুসুহ' ও رأفت 'রা'ফাত' অত্যধিক দয়াপ্রবণতাকে বলা হয়। 'সাররাহ্' নামক কিতাবে রহমত শব্দের অর্থ করা হয়েছে দান করা, দয়া করা আর 'রা'ফাত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে অত্যধিক দান ও মেহেরবানী করা।

হুজুর আকরম (সঃ) উম্মতের ব্যাপারে শরীয়ত ও তার বিধিবিধানের সহজসাধ্যতা ও লঘুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। কোনো কোনো আমল হুজুর আকরম (সঃ) ইচ্ছা করেই মাঝে মধ্যে পরিহার করতেন, যাতে উক্ত আমল উম্মতের উপর ফরজ না হয়ে যায়। যেমন প্রত্যেক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করা, এশার নামাজকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী কর, সওমে বেসাল (অনবরত রোজা রাখা) বা এজাতীয় আরও বিধান আছে যা তিনি ইচ্ছা করেই মাঝে মধ্যে পরিহার করতেন। হুজুর আকরম (সঃ) আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করতেন, মানুষ যে তাঁকে গালি দেয়, লানত করে এগুলিকে যেনো আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য রহমত, নৈকট্য ও কুফুরী থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়ার ওসীলা বানিয়ে দেন। হুজুর আকরম (সঃ) এর সম্মানিত স্বভাব এরকম ছিলো যে, তিনি যখন জামাতে নামাজ আদায় করতেন আর সে জামাতে যদি কোনো শিশু সন্তানের মা হাযির থাকতো, তবে শিশুর কান্নার আওয়ায শুনতে পেলে তিনি নামাজ সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করতেন। যাতে সন্তানের মা শিশুর কান্নার আওয়াযে উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়ে। হুজুর পাক (সঃ) মাঝে মাঝে এরকম বলতেন, তোমাদের কেউ যেনো এমন কথা আমার কাছে না পৌঁছায় যা আমি পছন্দ করিনা। কেননা, আমি কামনা করি, আমার সীনা পাক সাফ থাকুক (সম্ভবতঃ উম্মতের দুঃখকষ্টের কথা

শুনতে তিনি পছন্দ করতেন না, তাতে তার অন্তঃকরণে আঘাত লাগে। তাই তিনি এরকম বলতেন)।

কুরাইশ বংশের লোকেরা হুজুর পাক (সঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো এবং সীমাহীন দুঃখকষ্ট প্রদান করতে লাগলো। এমতাবস্থায় হজরত জিব্রাইল (আঃ) হাযির হয়ে বললেন, পাহাড় নিয়ন্ত্রণের দ্বায়িত্বে যে সমস্ত ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, 'মোহাম্মদ (সঃ) যা হুকুম করেন, তা তোমরা বাস্তবায়িত করো।' তখন পাহাড়ের ফেরেশতাগণ বললেন, 'হে মোহাম্মদ (সঃ), আপনি যা চান আমাদেরকে আদেশ করুন। আপনি যদি চান তাহলে 'আখবাশাইন' নামক পাহাড় দুটি এনে এদের উপর ফেলে দিয়ে এই এলাকাকে উলটপালট করে দেই।' আখবাশাইন মক্কা মুকাররমার দুটি পাহাড়ের নাম। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে লোকালয় অবস্থিত। হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, না। আমি এটা চাই না যে, এরা ধ্বংস হয়ে যাক। আমি এ প্রত্যয় পোষণ করি, হয়তো এদের বংশধরদের ভিতর থেকে এমন লোক বেরিয়ে আসবে, যারা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করবে। আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে শরীক করবেনা। এটি এক সুদীর্ঘ ঘটনা। এর বর্ণনা পরবর্তীতে যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) নবীকরীম (সঃ) এর কাছে আরয করলেন, আল্লাহ্তায়ালা আসমান যমীন ও পাহাড় পর্বতকে হুকুম প্রদান করেছেন, তারা যেনো আপনার আনুগত্য করে, আপনি যা হুকুম করেন তারা তাই বাস্তবায়িত করে এবং আপনার দুশমনদেরকে যেনো ধ্বংস করে দেয়। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, আমি ধৈর্য ধারণ করা পছন্দ করি। আর আমার উম্মতের উপর আযাব প্রদানে যেনো বিলম্ব করা হয়, এটাই কামনা করি। হতে পারে আল্লাহ্তায়ালা এদেরকে হয়তো মাফ করে দিবেন। তওবা করার সুযোগ দিয়ে তাদের উপর রহমত নাযিল করবেন। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে যখনই হুজুর পাক (সঃ) কে দু'টি পন্থা থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তখনই হুজুর (সঃ) তার মধ্যে সহজতর পন্থাটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য একথার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে সুস্পষ্ট ও নিকটতর ব্যাখ্যা এই যে, হুজুর পাক (সঃ) সহজতর আমলটি গ্রহণ করতেন উম্মতের জন্য। নিজের জন্য নয়। হজরত ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) ওয়ায, নসীহত ও উপদেশ প্রদানকালে আমাদের মনমেজাজের প্রতি

লক্ষ্য রাখতেন। এর অর্থ এই যে, তিনি কখনও কখনও ওয়াজ নসীহতের কথা শুনাতেন। সর্বদাই করতেন না যাতে শ্রোতাদের মন বিগড়ে যায়।

বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা প্রদান, সুসম্পর্ক ও সেবাশুশ্রূষা

হুজুর পাক (সঃ) এর আখলাক ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের দাবী রক্ষা করা, সুঅঙ্গীকার করা, মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, রুগীর সেবা শুশ্রূষা করা এবং মনমেজাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা অন্যতম। হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন কোনো বস্তু হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে হাদিয়া স্বরূপ আনা হতো তখন তিনি বলতেন, অমুক মহিলার কাছে নিয়ে যাও। সে হজরত খাদীজা (রাঃ) এর বান্ধবী। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হজরত খাদীজা (রাঃ) এর প্রতি আমার এতো ঈর্ষা হতো যে অন্য কারো প্রতি এরকম হতো না। কেননা হুজুর আকরম (সঃ) তাঁকে খুব বেশী স্মরণ করতেন। হুজুর পাক (সঃ) যদি একটি বকরীও জবেহ করতেন, তবে অবশ্যই তা থেকে হজরত খাদীজা (রাঃ) এর বান্ধবীগণের জন্য কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। একদা হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে একজন মহিলা আগমন করলে হুজুর (সঃ) তাকে দেখে আনন্দিত করলেন। তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করলেন। মহিলা সেস্থান থেকে প্রস্থান করলে হুজুর (সঃ) বললেন, এ মহিলা খাদীজা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতেন। তিনি আরও বললেন, কারও বৈশিষ্ট্যকে সদাচরণের সাথে লালন করে যাওয়া ইমানের অংশ।

হুজুর আনওয়ার (সঃ) রক্তসম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়দের হকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতেন। হুজুর পাক (সঃ) এরকম বলতেন, অমুকের পিতার বংশ আমার বন্ধু নয়। কোনো কোনো হাদীছে এসেছে, তিনি এরকম বলতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এবং নেককার মুসলমান ব্যতীত আমার কোনো বন্ধু নেই। তবে হাঁ রক্ত সম্পর্ক অবশ্যই স্বীকার্য এবং এহেন রক্ত সম্পর্কের কারণে আমি তাদের প্রতি নরোম ব্যবহার করে থাকি। একথার তাৎপর্য এই যে, হুজুর পাক (সঃ) আত্মীয়স্বজনদেরকে অস্বীকার করতেন না বটে, তবে তাদের চাইতে ইমানদারগণকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেন, আমি তাদের প্রতি কম অনুগ্রহ করে থাকি। যেমন কারও চেহারার উপর পানির ছিটা দিলে যেমন অল্প পানি চেহারার উপর পতিত হয়, সম্পর্কধারী আত্মীয়দেরকে আমি ঐ রকমই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। হুজুর (সঃ) এর এই উক্তি দ্বারা ইবন আবিল আসকে বুঝানো হয়েছে।

হুজুর আকরম (সঃ) উমামা বিনতি যয়নব (রাঃ) কে কোলে উঠিয়ে নিতেন। হুজুর পাক (সঃ) যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন তিনি তাঁর

কাঁধ মুবারকের উপর বসে থাকতেন। আবার যখন সেজদায় যেতেন তখন মাটিতে নেমে যেতেন। আবার যখন দণ্ডায়মান হতেন কাঁধে উঠে বসতেন। হুজুর পাক (সঃ) এর এরকম অভ্যাস শিশুদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও স্নেহবাৎসল্যের কারণে ছিলো। হজরত উমামা (রাঃ) যে হুজুর (সঃ) এর কাঁধে উঠে বসতেন এবং যমীনে নেমে যেতেন, তা তিনি নিজেই করতেন। হুজুর (সঃ) স্বহস্তে এরকম করতেন না। হুজুর (সঃ) যখন দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁধে উঠে বসে যেতেন আবার যখন যমীনে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন তখন নীচে নেমে যেতেন। এখানে কেউ যেনো এরকম মনে না করে যে, হুজুর (সঃ) স্বহস্তে এগুলি করে নামাজে আমলে কাছীর করেছেন। অধিকন্তু উক্ত নামাজ ফরজ নামাজ ছিলোনা, বরং তা ছিলো নফল নামাজ। ওয়াল্লাহু আ'লীমু।

হুজুর আনওয়ার (সঃ) এর দুধবোন হজরত শীমা (রাঃ)। তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর দুধমাতা হজরত হালীমা সা'দীয়া (রাঃ) এর সঙ্গে একত্রে হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমত ও লালন পালনের কাজ করতেন। হজরত শীমা (রাঃ) কে ইবনুল আছীর মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে শামিল করেছেন। হাওয়াযেন গোত্রের বান্দীদের সংগে তিনিও হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে আনীত হয়েছিলেন। তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করলে হুজুর (সঃ) তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। হুজুর (সঃ) তাঁকে বললেন, আপনি যদি আমাদের এখানে থাকতে চান তাহলে বলুন। সম্মান মর্যাদার সাথে আপনাকে এখানে রাখা হবে। ধনদৌলতও প্রদান করা হবে। আর যদি নিজ গোত্রে ফিরে যেতে চান তাহলে যেতে পারেন। তিনি আপন গোত্রে ফিরে যাওয়াকে পছন্দ করলেন। তাই হুজুর আকরম (সঃ) সাজ সরঞ্জাম সহকারে তাঁকে সসম্মানে তাঁর গোত্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আবুত্তুফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদা বাল্যকালে হুজুর পাক (সঃ) কে দেখলাম, একজন মহিলা তাঁর কাছে আগমন করলেন। তিনি উক্ত মহিলার জন্য স্বীয় চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন। মহিলাটি উক্ত চাদরের উপর উপবেশন করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটি কে? সাহাবাগণ বললেন, ইনি সেই মহিয়সী রমণী, যিনি হুজুর আকরম (সঃ) কে দুধ পান করিয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, মহিলা ছিলেন হজরত হালীমা সা'দীয়া (রাঃ)। ইবন আব্দুল বার 'এস্তিআব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি হালীমা (রাঃ) ই ছিলেন। উলামায় কেরাম অবশ্য এ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, হুজুর

পাক (সঃ) কে সর্বমোট আটজন মহিলা দুধপান করিয়েছিলেন। তিনি হয়তো তাঁদের মধ্যে একজন হবেন। আল্লাহ্‌পাক ভালো জানেন।

আমর ইবন সায়েব বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) একবার কোনো একস্থানে তাশরীফ আনয়ন করলেন। সেখানে হুজুর (সঃ) এর দুধপিতা এলেন। তিনি তাঁর জন্য স্বীয় চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন। তিনি তার উপর বসলেন। অতঃপর তাঁর দুধমাতা এলে তাঁকেও চাদরের এক প্রান্তে বসিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর দুধ ভাই এসে পড়লে হুজুর (সঃ) তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাছে এনে সামনে বসিয়ে দিলেন।

হুজুর (সঃ) সৌহার্দ স্বরূপ আবু লাহাবের বান্দী ছাওবিয়ার জন্য খানা ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রেরণ করতেন। কেননা, তিনিও হুজুর পাক (সঃ) কে দুধ পান করিয়েছিলেন। ছাওবিয়া মৃত্যুবরণ করলে হুজুর (সঃ) লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছাওবিয়ার কোনো নিকটাত্মীয় আছে কি? লোকেরা জবাব দিয়েছিলো, না তার কেউ নেই।

হজরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর হাদীছে উল্লেখ আছে-তিনি হুজুর আকরম (সঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে রসূল (সঃ)! আপনি শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর্ কসম! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে কক্ষণও লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি তো মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন, আপনি এতীম-অনাথদের দায়িত্বভার বহন করেন, অসহায়দের জন্য কামাই রোজগার করে দেন, মেহমানদারী করেন, সত্যের জন্য বিপদের ক্ষেত্রে আপনি সাহায্য করে থাকেন।

ন্যায় পরায়ণতা, আমানতদারী, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সত্যভাষণ

হুজুর আকরম (সঃ) শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, আমানতদার, সর্বাধিক দয়াপরবশ এবং সত্যভাষী ছিলেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর দুশমন ও বেগানা লোকেরাও যার স্বীকৃতি প্রদান করতো। তাঁরা তাঁকে মোহাম্মদ আলআমীন বলে ডাকতো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হুজুর (সঃ) এর নাম যে আলআমীন হয়েছিলো, তার কারণ এই যে তাঁর মধ্যে যাবতীয় সৎগুণাবলী সন্নিবেশিত ছিলো। আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী مطاع ثم امين এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ সত্যের দিকেই গিয়েছেন। 'আমীন' এর উদ্দেশ্য হুজুর

পাক (সঃ) এর সম্মানিত সত্তা। 'শেফা' নামক পুস্তকে এরকমই বলা হয়েছে।

কাবাগৃহ সংস্কারের সময় কুরাইশ বংশের চারটি গোত্র যখন হাজারে আসওয়াদ সংস্থাপন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যের সংকট সৃষ্টি করেছিলো, তখন সকলেই একথার উপর একমত হয়েছিলো যে, আগামীকাল ভোরবেলা যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম খানায়ে কাবায় প্রবেশ করবে, আমরা সকলেই তার সিদ্ধান্তকে মেনে নেবো। পরদিন সর্বপ্রথম হুজুর আকরম (সঃ) কাবা শরীফের চত্বরে প্রবেশ করলে সকলেই বলতে শুরু করলো, এতো মোহাম্মদ, এতো আলআমীন। তিনি যা ফয়সালা প্রদান করবেন, আমরা সকলেই তা মেনে নেবো। হুজুর (সঃ) একখানা চাদর এনে চাদরের চার কোণ চার গোত্রের দলপতিদেরকে ধরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদখানা তুলে নিয়ে চাদরের মাঝখানে রেখে দিলেন। হাজারে আসওয়াদের এ ঘটনা ঘটেছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে, খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমাতুয্ যাহ্‌রা (রাঃ) এর জন্মের বৎসর। ইসলামী যুগের আবির্ভাবের পূর্বে কুরাইশ বংশের লোকেরা হুজুর আকরম (সঃ) কে বিচারক এবং মধ্যস্থতাকারী তৃতীয় পক্ষ নির্ধারণ করতো। হুজুর পাক (সঃ) স্বয়ং এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার কসম, নিশ্চয়ই আমি আকাশেও বিশ্বস্ত এবং যমীনেও বিশ্বস্ত।

হজরত আলী মুতর্জা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার অভিশপ্ত আবু জাহেল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে লক্ষ্য করে বললো, আমরাতো আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করিনা বা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেও মনে করি না। আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তবে আপনি যে দ্বীনের কথা নিয়ে এসেছেন সেগুলিকে আমরা মিথ্যা মনে করি। —আবু জাহেলের উক্তি কতই না বাজে, অর্থহীন, দুর্বোধ্য এবং স্ববিরোধী। রসূল (সঃ) কে যখন সত্যবাদী বলে মানা হলো, তখন তিনি যা কিছু বলছেন তাকে অবশ্যই সত্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। এরপর এমন বিরোধীতা ও অহংকারের কিইবা মূল্য থাকতে পারে? ঐ সময় আল্লাহ্‌তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন, হে আমার প্রিয় হাবীব, নিশ্চয়ই এরা আপনাকে মিথ্যারোপ করছে না। কিন্তু এ যালেমেরা আল্লাহ্‌তায়ালার আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে এখানে মোটামুটি মমার্থ এরকম—আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ) কে সান্ত্বনা স্বরূপ বলছেন, হে মাহবুব! আপনি চিন্তামুক্ত থাকুন। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এরা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে। তাই নিশ্চয়ই

এদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবো। এর দৃষ্টান্তটি এরকম, যেমন কোনো একদল লোক কোনো এক প্রভুর লোককে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দিচ্ছে। এতে প্রভু উক্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলছেন যে, এরা তোমাকে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদান করছে এটা আমি জানি। এরা প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমাকে দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছে না, আমাকেই যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি অবশ্যই এদেরকে শাস্তি দান করবো।

কথিত আছে, আখনাস ইবন শুরাইক বদরের যুদ্ধের দিন আবু জাহেলের সঙ্গে মিলিত হলো। আখনাস আবু জাহেলকে লক্ষ্য করে বললো, হে আবুল হাকাম, (এটা আবু জাহেলের উপাধি ছিলো) এস্থানে তুমি আর আমি ভিন্ন তৃতীয় কেউ উপস্থিত নেই যে আমাদের কথা শুনতে পারবে। তুমি এখানে আমার কাছে সত্য করে বলতো দেখি, মোহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? তখন অভিশপ্ত আবু জাহেল উত্তর করলো, খোদার কসম নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ (সঃ) সত্যের উপর আছেন। তিনি সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী কখনও নন।

রোমের বাদশাহ্ হারকাল ও আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর কথোপকথন সংক্রান্ত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, বাদশাহ্ হারকাল আবু সুফিয়ান এর কাছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই হুজুর (সঃ) এর নবুওয়াতের প্রমাণ পেয়েছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কি ঐ দলভুক্ত ছিলে যারা মোহাম্মদ (সঃ) কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে?' অর্থাৎ তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণার পূর্বে তোমরা কখনও কি তাঁকে মিথ্যাবাদী জানতে? আবু সুফিয়ান জবাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি কখনও মিথ্যাবাদী ছিলেন না। হারকাল তখন বললেন, 'তিনি যদি এমনই হয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ্‌র যাতে পাক সম্পর্কে তিনি মিথ্যা বলবেন এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?' বাদশাহ্ হারকালের এ উক্তিটি নবুওয়াতের আলামত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। হাদীছখানা বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে আছে। তাছাড়া মেশকাত শরীফের শরাহ্ গ্রন্থে এর বিস্তারিত তরজমা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নযর ইবন হারেছ একদিন কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললো, মোহাম্মদ (সঃ) তো তোমাদের কাছেই ছোটকাল থেকে বড়ো হয়েছেন। তোমাদের সব কাজেই তাঁকে তোমরা পছন্দ করে আসছো, তাঁকে তোমরা ভালবেসে আসছো। কথাবার্তায় তিনি সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী, আমানতদারীতে সকলের চেয়ে মহান। এ মুহূর্তে যখন কেশাগ্রে বাধর্ক্যের ছাপ পরিস্ফুট হয়ে

উঠলো, আর দ্বীন ও মিল্লাতের কথা নিয়ে যখন তিনি তোমাদের কাছে তশরীফ আনলেন, তখনি তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করতে লাগলে। খোদার কসম, তিনি কক্ষণও যাদুকর নন। এই নযর ইবন হারেছ অবশ্য কাফের ছিলো। কুফুরী পর্দায় তার কলব আচ্ছাদিত ছিলো। কিন্তু লোকটি ছিলো বুদ্ধিমান। তার বিচারবোধ ছিলো সত্যের অনুকূলে। কিন্তু হলে কি হবে? অন্যান্যদের অন্তরের উপরে যে পুরু পর্দা পড়েছিলো। তার অন্তর থেকে পর্দা উন্মোচিত হলেও অন্যান্যদের পুরু পর্দা এসে তার কলবকে পুনরায় ছেয়ে ফেলতো।

ওলীদ ইবন মুগীরা কুরাইশ কাফেরদের সরদাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো। সে একাধিকবার কুরআন পাক শুনেছে। কুরআন শুনে কেঁদেছে। সে মন্তব্য করেছিলো, কুরআন কোনো মানুষের কথা হতে পারেনা। এ কালামে যে মাধুর্য ও চিত্তাকর্ষকতা রয়েছে তা অন্য কালামের নেই। নিঃসন্দেহে এ কালামে মধুরতা বিদ্যমান। এতে আছে طلاوة 'তালাওয়াত' অর্থাৎ মর্মস্পর্শী ও শান্তিদায়ক বাক্য। 'সাররাহ্' নামক কিতাবে 'তালাওয়াত' এর অর্থ করা হয়েছে সৌন্দর্য ও হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। কুরআনে পাকে এ গুণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

হারেছ ইবন আমের ঐ দুষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো যারা লোকসমক্ষে হুজুর (সঃ) কে মিথ্যারোপ করতো। কিন্তু এ লোকটি যখন নিরিবিলিতে তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে কাটাতো, তখন মন্তব্য করতো 'আল্লাহর কসম মোহাম্মদ (সঃ) মিথ্যা বলার লোক নন।'

একদিন আবু জাহেল হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মুসাফেহা করলো। এদেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, একি তুমি মোহাম্মদ (সঃ) এর সঙ্গে মুসাফেহা করলে কেনো? তখন আবু জাহেল বললো, খোদার কসম! আমি জানি যে মোহাম্মদ (সঃ) একজন পয়গম্বর। কিন্তু কি করবো বলো! আমরা আবদে মানাফের বংশের অনুসরণকারী কি কখনও ছিলাম? মুশরিকরা যখনই হুজুর (সঃ) কে দেখতো, তখনই তারা বলতো "ইনি নবী"। এই তো ছিলো মুশরিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা।

আহলে কিতাব ইহুদী নাসারারা তো হুজুর পাক (সঃ) এর রেসালাত সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতো এবং বিশ্বাস করতো। 'তারা আপন আপন সন্তান সন্তুতিকে যেমন চিনতো তেমনই চিনতো হুজুর পাক (সঃ) কে একজন সত্য নবী হিসাবে' (কুরআন)। আর এরা তো পুরুষানুক্রমে আখেরী যমানার নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। মৃত্যুর সময় তারা আপন আপন সন্তান সন্তুতিকে ওসীয়ত করে বলে যেতো, আখেরী যমানার নবী আগমন

করলে তারা যেনো তাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা যেনো, সে নবীর কাছে এই মর্মে আরয করে যে, আমরা আপনার সাহায্যে আমাদের জান মাল বিসর্জন করে দেবো। আমাদের সালাম যেনো তিনি কবুল করেন এবং আমাদেরকে তাঁর গোলামগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইয়ামনের বাদশাহ্গণের মধ্যে তুব্বা নামে একজন মুসলমান বাদশাহ্ ছিলেন। তার কাওমের লোক ছিলো কাফের। হুজুর আকরম (সঃ) তাঁর সম্পর্কে বললেন, তুব্বা বনী তামীম গোত্রের লোক কিনা এটা আমি জানি না।—উক্ত তুব্বা বাদশাহ্ তাঁর সঙ্গে একদল লোক নিয়ে আখেরী যমানার নবীকে চিনবার উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন এবং এ সম্মানিত নগরীতে অবস্থান করলেন। সাথী সঙ্গীরা বাদশাহ্কে বললো, আমাদেরকে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করা থেকে পরিত্রাণ দিন। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে লব্ধ জ্ঞান মুতাবেক হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াত তখন তাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাই তারা এই অক্ষমতা প্রকাশ করলো)। অন্য এক বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, তারা ইমান অবশ্য আনেনি, তবে তাদের বংশধরেরা পরবর্তীতে নবীকরীম (সঃ) এর মান্যবর সাহাবী হয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর পবিত্র নূর (সঃ) আহলে কিতাবদের সামনে উদ্ভাসিত হলেন ঠিকই। কিন্তু তারা কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়ে গেলো। পথভ্রষ্ট রয়ে গেলো।

চারিত্রিক পবিত্রতা

عفت 'ইফফত' এর অর্থ হারাম থেকে বেঁচে থাকা। অভিধান গ্রন্থে ইফফত এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে العفة عما لا يحل ولايجمل 'আল ইফফাতু আম্মা লা ইয়াহিল্লু ওয়া লা ইয়াজমিলু' অর্থাৎ ইফফত এর অর্থ হচ্ছে যা হালাল এবং সুন্দর নয় তা থেকে বেঁচে থাকা। হুজুর আকরম (সঃ) এর ইফ্ফত বা চারিত্রিক গুণাবলী ও পবিত্রতার পূর্ণতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারে এমন ভাষা কার আছে? ইফফত বা চারিত্রিক হেফাযত যেখানে আছে সেখানে সবই আছে। হাদীছ শরীফে আছে, হুজুর পাক (সঃ) এমন কোনো রমণীর হাত জীবনে কখনও স্পর্শ করেন নি যার মালিক তিনি নন। তাঁর চারিত্রিক পূতপবিত্রতার স্বরূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিভাষাগত হিসেবে অবশ্য এ উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা 'ইফফত' এর হাকীকত বলতে যা বুঝায় তা হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। কেননা চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী

বলতে যা বুঝায় তিনি তো তা থেকে শত সহস্র গুণ ঊর্ধে। হুজুর পাক (সঃ) এর গুণাগুণ সমূহ, সত্যবাদীতা ইত্যাদি সম্পর্কে তো বার বার আলোচনা করা হয়েছে।

ন্যায়পরায়ণতা

عدل 'আদল' শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ যা-ই করা হোক অথবা আখলাখ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হোক— হুজুর পাক (সঃ) এর মহান সত্তার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদা হুজুর পাক (সঃ) কিছু মাল বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুলহুওয়ায়ত্তগরাহ্ তামিমী নামক এক ব্যক্তি হুজুর পাক (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললো, তিনি যেনো এক্ষেত্রে ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করেন। অথবা অন্য এক বর্ণনায় এরকম আছে, লোকটি বললো, আপনি যা করছেন তা ইনসাফের ভিত্তিতে হচ্ছে না।—হুজুর পাক (সঃ) একথা শুনে বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? ঘটনাটি বেশ দীর্ঘ। এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করে এটুকুই উল্লেখ করা হলো।

আবুল আব্বাস মুবাররাদ এলমে নাহু'র একজন ইমাম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, পারস্যের বাদশাহ্ কিসরা তার নিজের জন্য দিনসমূহ্ বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে রেখেছেন। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার দিনকে নির্ধারণ করেছেন ঘুমানোর জন্য। মেঘাচ্ছন্ন দিনকে নির্ধারণ করেছেন শিকার করার জন্য। বৃষ্টিবাদলের দিনকে নির্ধারণ করেছেন শরাব পান করার নিমিত্তে। আর যে দিন আকাশ মেঘমুক্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল থাকবে সেদিন মানুষের প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত ইমাম আরও বলেন যে, কিসরা তো শুধু রাজনৈতিক দিক দিয়েই প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে প্রজ্ঞাশীলতার কতটুকুই বা আশা করা যেতে পারে? কিন্তু আমাদের পয়গম্বর সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এর অবস্থা কিরকম? তিনি দিবসকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। দিনের এক অংশ আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের জন্য। এক অংশ পরিবার পরিজনের জন্য। আর এক অংশ নিজের জন্য। তারপর সেই এক তৃতীয়াংশকে আবার দুভাগে বিভক্ত করে একভাগ নিজের জন্য রাখতেন আর বাকি একভাগ মানুষের প্রয়োজনাদি মিটানোর নিমিত্তে নির্ধারণ করতেন।

আবু জাফর তিবরী সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমি আমার গোটা জীবদ্দশায় স্রেফ দু'বার জাহেরী যুগের আমলের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। দুই বারই আমার ও আমার ইচ্ছার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জীবনে আর কখনও এ ধরনের ইচ্ছা পোষণ করিনি। একবারতো এমন হয়েছিলো—আমি ও আমার সঙ্গী, যে আমার সাথে বকরী চরাতো তাকে এক রাত্রিতে বললাম, তুমি আমার বকরীগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখো। আমি একটু মক্কা মুকাররমা ঘুরে আসি। সেখানে যেয়ে একটু গল্পগুজব করে ও গল্পগুজব শুনে সময় কাটিয়ে আসি—যুবক বয়সীরা যেমন অবসর সময় গল্পগুজব করতে ও শুনতে ভালোবাসে। আমি সেখান থেকে মক্কা মুকাররমার এক সরাইখানায় চলে এলাম। এসে দেখি এখানে লোকেরা তীর ছুঁড়ে নিশানা সই করার খেলা খেলছে এবং তার সাথে দফ ও মেযমার বাদ্য বাজছে। এক বাড়িতে বিয়ের উল্লাসও চলছিলো। আমি তা শ্রবণ করার মানসে সেখানে বসে পড়লাম। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সেখানেই ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। বাস, ঘুম থেকে উঠেই সোজা সেখান থেকে চলে এলাম। এরকম ঘটনা আমার জীবদ্দশায় নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আরেকবার ঘটেছিলো। এরপর আমি আর কখনও এধরনের আকাংখা করিনি।

মর্যাদা, শান শওকত, নীরবতা ও ব্যক্তিত্ব

وقار 'ওয়াকার' শব্দের আভিধানিক অর্থ ধীরতা। তবে এর ভাবার্থ হচ্ছে মর্যাদাসূচক ভয় ভীতি ও শান শওকত। صمت 'সিমত' এর অর্থ নীরবতা। مروت 'মরুওয়াত' এর অর্থ ব্যক্তিত্ব।

হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যক্তিসত্তায় حلم 'হেলেম' (ধৈর্য) ও وقار 'ওয়াকার' (মর্যাদা) ছিলো। তাঁর চলা-ফিরা, উঠা-বসা ও স্থিরতায় ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতার মাত্রা এমন ছিলো যা আর কারও মধ্যেই ছিলো না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, তিনি যখন কোনো মজলিশে উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনিই হতেন সেখানকার সর্বাধিক ধীর ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সাধারণতঃ মানুষ চলাফেরা করার সময় যে রকম হাত পা নাড়া চাড়া করে হাঁটে, হুজুর (সঃ) এর বেলায় কিন্তু এরকম ছিলো

না। চলাফেরা করার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর শরীর মুবারকের বরাবর থাকতো। শরীরের পরিসীমার বাইরে কখনও হাত বা পা বেরিয়ে যেতোনা। অধিকাংশ সময় হুজুর পাক (সঃ) এহ্‌তেবা এর ভঙ্গিতে উপবেশন করতেন। এহ্‌তেবা বলা হয় দু'হাঁটু উঠিয়ে পায়ের গোড়ালীদ্বয় একত্রে মিলিয়ে নিতম্বের উপর বসাকে। হুজুর পাক (সঃ) এভাবে বসতেন। কখনও চাদর বিছিয়ে আবার কখনও চাদর ছাড়াও এমনিভাবে উপবেশন করতেন। আবার কখনও مربع 'মুরববা' অর্থাৎ চার জানু হয়েও বসতেন। ফজরের নামাজের পর এভাবে বসে ওযীফা কালাম ইত্যাদি আদায় করতেন। আবার কখনও তিনি قرفصا 'ফরুকসা' এর ভঙ্গিতেও বসতেন। 'ফরুকসা' এর ব্যাখ্যা এরকম করা হয়েছে যে, দু'জানু উঁচু করে তা পেটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে বসা। হুজুর (সঃ) যখন এভাবে উপবেশন করতেন, তখন দু'হাত মুবারক দিয়ে হাঁটুদ্বয়কে বেষ্টন করে নিতেন। আবার কেউ কেউ এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সঃ) উপরোক্ত নিয়মে যখন উপবেশন করতেন তখন হস্তদ্বয়কে বগলের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতেন।

হজরত কাইলা বিনতি মাখযামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর (সঃ) কে খুশু খুযুর হালতে 'ফরুকসা' এর ভঙ্গিতে বসা অবস্থায় দেখলাম। তাঁকে এমন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে আমার মধ্যে কম্পন এসে গিয়েছিলো। খুশু এর অর্থ হচ্ছে বিনয়ের সাথে চোখ বুঁজে বসা। খুযুর অর্থও প্রায় কাছাকাছি। কেউ কেউ বলেন, খুশু এর সম্পর্ক অঙ্গের সাথে আর খুযু এর সম্পর্ক আওয়ায ও চাহনির সাথে। কোনো কোনো হাদীছে আবার খুশুকে বাতেনী বিনয় আর খুযুকে যাহেরী বিনয়ের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

হুজুর আকরম (সঃ) খুব বেশী নীরবতাপ্রিয় ছিলেন। প্রয়োজনের সময়ই কেবল বাক্যালাপ করতেন। তাঁর সামনে কেউ কখনও অসুন্দর কথাবার্তা বলতে থাকলে তিনি তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। তাঁর কথা সর্বদাই সিদ্ধান্তমূলক হতো। ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে শব্দ খুব বেশী ব্যবহার করতেন না, আবার শব্দ এমন কমও হতো না যাতে বোধগম্য না হয়।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নির্গত শব্দগুলিকে গণনা করা সম্ভব হতো। হজরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, হুজুর আকরম (সঃ) তরতীল ও তরসীল এর সাথে কালাম করতেন। 'সাররাহ্' গ্রন্থে তরতীলের অর্থ করা হয়েছে, সহজসাধ্যভাবে ভারসাম্যময়

স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কোনোকিছু পাঠ করা। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, কুরআন পাঠ করো সহজসাধ্যভাবে, ভারসাম্যমন্ডিত স্বরে ও স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে। তরসীল এর অর্থও প্রায় এর কাছাকাছি।

হজরত ইবন আবী হালা (রাঃ) এর হাদীছে উল্লেখ আছে, হুজুর আকরম (সঃ) নীরবতাকে পছন্দ করতেন চার কারণে। (১) হেলেম বা সহিষ্ণুতা, (২) হাযার বা আল্লাহ্‌র ভয়, (৩) তাকদীর ও (৪) তাফাক্কুর। —হুজুর পাক (সঃ) এর হাসি সীমা অতিক্রম করতো না। তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের হাসিও তাঁর অনুকরণ অনুসরণ অনুযায়ীই হতো। হুজুর আকরম এর মজলিশ মুবারক ছিলো হেলেম, হায়া, খায়ের ও আমানতের মজলিশ, যে মজলিশে কখনো উচ্চ আওয়াজ ধ্বনিত হতো না। মন্দ কথা থেকে পরহেজ করা হতো। হুজুর পাক (সঃ) যখন কথা বলতেন, সাহাবাগণ তখন মস্তকসমূহ এমনভাবে অবনত করে রাখতেন, যেনো তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। মাথা একটু উঁচু করলেই যেনো সে পাখি উড়ে চলে যাবে। আশ্‌শেফা কিতাবের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত অবস্থা হুজুর পাক (সঃ) এর কথা বলার সময়ের জন্য নিদিষ্ট ছিলো। তবে অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত অবস্থা কেবল কথা বলার সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিলোনা। বরং হুজুর পাক (সঃ) এর সামনে সাহাবাগণ উপস্থিত থাকলে ওরকম অবস্থাতেই থাকতেন। চাই হুজুর (সঃ) তখন কথা বলুন বা নাই বলুন।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে, সাইয়্যেদুনা হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন হুজুর পাক (সঃ) এর মজলিশে বসতেন, তখন মুখ চাপা দিয়ে বসে থাকতেন, যাতে নির্গত শ্বাস বাইরে না ছড়ায় এবং কোনো কথা যাতে না বের হয়। তিনি জামালে মোহাম্মদী (সঃ) এর প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

হুজুর পাক (সঃ) এর চলার গতি কিরকম ছিলো তার বর্ণনা হুলিয়া মুবারকের বর্ণনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব বা সংযত আচরণের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, তিনি খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করতেন। সামনে যে খাবার রাখা হয়, তাই খাওয়ার জন্য হুকুম করতেন। মেসওয়াক করা, মুখ ও আঙ্গুলের ফাঁক ও জোড়াসমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য হুকুম করতেন।

হুজুর আকরম (সঃ) এর সীরাত মুবারক সর্বোত্তম সীরাত বা জীবনাদর্শ। হজরত ইবন মাসউদ (রাঃ) এর হাদীছে এরকম বর্ণনা এসেছে,

সর্বোত্তম কালাম আল্লাহ্পাকের কালাম আর সর্বোত্তম জীবনাদর্শ মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনাদর্শ।

নবী করীম (সঃ) সুগন্ধিময় পরিবেশ খুব ভালোবাসতেন। নিজে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং অপরকেও ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি এ মর্মে এরশাদ করেছেন, তোমাদের দুনিয়ার দুটি জিনিস আমার কাছে খুবই প্রিয়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নারী আর অপরটি হচ্ছে খুশবু। আর নামাজের মধ্যে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা। (অর্থাৎ নামাজের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে আমার চোখ জুড়ায়)। নবী করীম (সঃ) এর উক্ত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা উক্ত তিনটি বস্তুকে আমার নিকট পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এমন নয় যে, আমি নিজের অভ্যাস এবং ইচ্ছায় ও দুটি বস্তুকে পছন্দ করেছি। নামাজকে আমার চোখের জন্য শীতলতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) নামাজে আনন্দ, নূর, আন্তরিক সান্ত্বনা, স্বাদ ও আত্মিক দর্শন লাভ করতেন। যা অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে লাভ হতো না। قرة العين 'কুররাতুল আইন' কথা দ্বারা আত্মিক উৎফুল্লতা, কাম্য বিষয়ের অবহিতি এবং অদৃশ্যের ভেদ উন্মোচিত হওয়া ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। قرة 'কুররাহ' শব্দটির উৎপত্তি قر 'কাররুন' থেকে। যার অর্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া। যেহেতু নামাজের মাধ্যমে মাহবুবের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলীর আত্মিক দর্শন হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তির অনাবিল ধারা জারী হয়, তাই তাকে 'কুররাতুল আইন' বলা হয়েছে। হুজুর পাক (সঃ) আনন্দের সময় ডানে বামে নযর ফিরাতেন। আত্মার আনন্দিত অবস্থায় স্বস্থানে স্থির হয়ে যেতেন। স্বীয় মাহবুব ছাড়া অন্য কোনোকিছুর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে চাইতেন না। পেরেশান হয়ে যেতেন। এমনিভাবে যখন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তখনও এদিক সেদিক তাকাতেন এবং তাঁর মধ্যে মৃদু অস্থিরতা প্রকাশ পেতো। এছাড়া কুররাতুন শব্দটি কুররুন থেকে উদ্ভুত—এও হতে পারে। তখন তার অর্থ হবে শীতলতা। মাহবুবের দর্শনের মাধ্যমে চোখ শীতল হয় এবং আস্বাদ লাভ হয়। আর এ অর্থেই সন্তানকে 'কুররাতুল আইন' বলা হয়ে থাকে। হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে فى الصلوة 'ফিস্সালাতে' নামাজের মধ্যে চোখের শীতলতা। الصلوة 'আস্সালাত' অর্থাৎ নামাজই চোখের শীতলতা, এমন বলা হয়নি। এছাড়া একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে চোখের শীতলতা ও শান্তি হচ্ছে মুশাহাদায়ে হক (আল্লাহ্তায়ালার আত্মিক দর্শন)।

যেমন হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে كانك تراه 'কাআন্নাকা তারাহু' (যেনো তুমি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখছো।)

মুশাহাদায়ে হক নামাজের অবস্থায় হাসিল হয়। স্বয়ং নামাজ বা তার ছওয়াব ও পুরস্কারের মধ্যে এটা নিহিত নয়। নামাজ অবস্থায় যে মুশাহাদা হয়ে থাকে এবং তা থেকে যে আত্মিক প্রশান্তির সৃষ্টি হয় তা কিন্তু অন্যকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে রহিত হয়ে যায়। নামাজ কিন্তু আল্লাহ্ নয়। যদিও তা আল্লাহ্তায়ালার দান এবং অনুগ্রহ। আর আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত ও ফযলপ্রাপ্তিতে খুশী হওয়ার এটাই সুউন্নত মাধ্যম বটে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—হে রসূল (সঃ) আপনি বলে দিন তারা যেনো আল্লাহ্তায়ালার ফযল ও রহমতের মাধ্যমে খুশী হয়। ফযল এবং রহমতের মাকাম যাতে বারীতায়ালার মুশাহাদার মাকামের চেয়ে নিম্নে। রহমত ও ফযলের সঙ্গে খুশী ও আনন্দ জড়িত থাকে। হুজুর আকরম (সঃ) এর মাকাম তার চেয়ে আরও অধিকতর ঊর্ধে অবস্থিত। সে পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, তারা যেনো খুশী হয়। 'আপনি খুশী হন' এরূপ বলা হয়নি। আপনি খুশী হন বললে হুজুর (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়। অথচ হুজুর (সঃ) কে লক্ষ্য করে একাজটি করার জন্য বলা হয়নি। কারণ উম্মতের মাকাম বা মর্যাদা নবী (সঃ) এর মাকামের নিম্নে। কাজেই তাদের জন্য উপযোগী যে, তারা আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও ফযল পেয়ে আনন্দিত থাকবে। নবীগণের মর্যাদা বা মাকাম তদপেক্ষা ঊর্ধে, বিশেষ করে সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এর মাকাম তো সর্বাধিক উন্নত। কাজেই তাঁর খুশী ও আনন্দ তো নিহিত রয়েছে যাতে বারীতায়ালার মুশাহাদার মধ্যে। প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত বাক্য, حبب الى الطيب والنساء

وجعلت قرة عينى فى الصلوة

এই হাদীছের অংশ বিশেষ। মেশকাত শরীফের গ্রন্থকার বলেন এ হাদীছখানা ইমাম আহমদ ও নাসায়ী হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সাখাবী (রাঃ) 'মাকাসেদে হাসানা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিবরাণী এই হাদীছ 'আওসাত' ও 'অস্সগীর' কিতাবদ্বয়ে মরফু হিসাবে বিবৃত করেছেন। এই হাদীছ খতীব (রঃ) তাঁর কিতাব 'তারীখে বাগদাদ' ও ইবন আদ্দী 'আল কামেল' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। 'মুস্তাদরেক' কিতাবেও এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে جعلت 'জুয়িলাত' শব্দটির উল্লেখ নেই। 'মুস্তাদরেক' কিতাবে বলা হয়েছে যে, এ

হাদীছ ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ্। নাসায়ী শরীফে অন্য এক সনদের সূত্রে হজরত আনাস (রাঃ) এর মাধ্যমে এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে من الدنيا 'মিনাদ্দুন্ইয়া' কথাটি অতিরিক্ত আছে। অনেক মুহাদ্দেছীনে কেরামই উপরোক্ত তরীকায় এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবন কাইয়ুম বলেন, ইমাম আহমদ 'যুহ্দ' নামক কিতাবে এই হাদীছ একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। বাড়ানো অংশটুকু হচ্ছে —

اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن

অর্থাৎ আমি খানা পিনা বাদ দিয়েও থাকতে পারি, কিন্তু স্ত্রীগণকে বাদ দিয়ে থাকতে পারি না। (তার কারণ এই যে খানা পিনা হচ্ছে সত্তাগত হক। আর স্ত্রীগণের হক তো অন্যের হক (অর্থাৎ স্ত্রীগণেরই হক)। নিজের অধিকার তো নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাদ দেয়া যায়। কিন্তু অন্যের অধিকারের বেলায় নিজের ইচ্ছা খাটেনা। অন্যের হক আদায় করতেই হয়।-অনুবাদক।

সাখাবী (রঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে ثلاث 'ছালাছ' 'তিন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটির ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে দু'স্থানে তা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হলো, 'এহ্ইয়া' কিতাবে আর অপরটি তফসীরে কাশ্শাফের সূরা আল এমরানে। তবে এ শব্দটির অতিরিক্ততার ব্যাপার নিয়ে আমি খুব ভালোভাবে অন্বেষণ করেও দেখিনি। যারকাশী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীছ শরীফে 'ছালাছ' শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। হাদীছের অতিরিক্ত এ শব্দটি ধরলে অর্থের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হয়। কেননা নামাজ কাজটি দুনিয়াবী কাজের অন্তর্ভূত নয়। যদিও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। শায়খ ইবন হাজার আসকালানী (রঃ), রাফেয়ী (রঃ) এর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেন যে, 'ছালাছ' শব্দটি মানুষের মুখে মুখে বহুল প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আমি এ শব্দটি কোনো ছনদে পাই নি। ওলীউদ্দীন ইরাকী (রঃ) স্বীয় কিতাব 'আমাল' এ উল্লেখ করেছেন এই শব্দ কোনো হাদীছের কিতাবে নেই। আর নামাজ কাজটি কোনো দুনিয়াবী কাজও নয়। (উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে সাখাবী (রঃ)এর বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত)। কাজেই জানা গেলো যে, হাদীছের মতনে (ভাষ্য) হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, হাদীছ খানা হবে এরকম —

حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلوة

এ মতনের মাঝে কোনো সমস্যা নেই।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হুজুর আকরম (সঃ) এর স্বভাবে যুহ্‌দ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির পূর্ণতার বিবরণ বিভিন্ন হাদীছে পরিপূর্ণভাবে এসেছে। দুনিয়ার প্রতি লোভ থেকে তিনি সার্বিকভাবে মুক্ত ছিলেন। অথচ পূর্ণ চাকচিক্যের সাথে দুনিয়াকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। তিনি সেগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। প্রচুর গনীমতের মাল এসেছে। কিন্তু দেখা গেলো—হুজুর আকরম (সঃ) যখন দুনিয়া থেকে পর্দা করলেন, তখন তাঁর সম্পদ বলতে ছিলো একটি মাত্র যেরা যা কোনো এক ইহুদীর কাছে রক্ষিত ছিলো। ইন্তেকালের পর তা বিক্রি করে পরিবার পরিজনের খোরাকীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিলো। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমার বংশধরের জন্য জীবনধারণযোগ্য রিযিকের ব্যবস্থা করো। হুজুর পাক (সঃ) এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত যেরাখানা ইহুদীর কাছ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, যুহ্‌দ বা দুনিয়ার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনাসক্তি ছিলো।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) জীবনে কখনও এক সাথে তিন দিন উদর পূর্তি করে আহার করেন নি। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, একাধারে দু'দিন কখনও যবের রুটি দেখেননি। অথচ তিনি যদি কামনা করতেন, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে এতো পর্যাপ্ত পরিমাণ রিযিক দান করতেন, যা মানুষেরা কল্পনাও করতে পারে না। অন্য এক হাদীছে আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর পরিবার পরিজন কখনও উদরপূর্তি করে গমের রুটি খেতে পারতেন না।এমনি অবস্থা বিরাজিত ছিলো তাঁর ওফাত পর্যন্ত।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) না রেখে গেছেন কোনো দীনার দেরহাম না কোনো উট-বকরী। আমর ইবন হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) মীরাছ হিসাবে হাতিয়ার, ঘোড়া ও যীনপুশ ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। সেগুলিকেও বাইতুল মালে দান করে দিয়েছিলেন। সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) যখন দুনিয়া থেকে প্রস্থান করলেন, তখন

তাঁর গৃহে আধা কিলো যব ব্যতীত খাবারের যোগ্য অন্য কিছু ছিলো না। সেই আধা কিলো যব ঘরের এককোণে তাকের উপর রক্ষিত ছিলো। হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছিলো, আমি যদি চাই তাহলে মক্কার ওয়াদী পাহাড়কে আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেয়া হবে। আমি তখন আরয করলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এতটুকু দান করুন যাতে আমি একদিন উপবাস করে পরের দিন আহার করতে পারি। আর যেদিন উপবাসে থাকি সেদিন যেনো আপানার দরবারে রোনাযারী করতে পারি, আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, আর যেদিন আহার করতে পারি সেদিন যেন আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আপনার প্রশংসা ও গুণ-গান করতে পারি।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা হজরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সালাম জানিয়ে এরশাদ করেছেন, আপনি চাইলে পাহাড়সমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেবেন। আর আপনি যেস্থানে তশরীফ নিয়ে যাবেন পাহাড়গুলিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। হুজুর পাক (সঃ) ক্ষণিক মাথা নীচু করে চুপ থেকে বললেন, ওহে জিব্রাইল! দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার কোনো ঘর নেই। দুনিয়া ঐ লোকের সম্পদ যার কোনো সম্পদ নেই। আর দুনিয়াকে ঐ ব্যক্তিই জমা করতে পারে যার কোনো জ্ঞান নেই।-জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হে হাবীবে খোদা! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সুদৃঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

সাইয়েদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হুজুর আকরম (সঃ) এর পরিবার পরিজন। আমাদের অবস্থা এই যে, দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আমাদের ঘরে (খাদ্য পাকানোর জন্য) কোনো আগুন জ্বলতো না। খেজুর ও পানি ছাড়া ঐ সময় আমাদের কোনো খাবার থাকতো না। হজরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা হুজুর পাক (সঃ) এর নিকট একটি বড় পাত্র ভর্তি খানা আনা হলো। তিনি তা দেখে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন, ধ্বংস! রসূলে খোদা (সঃ) এবং তাঁর স্ত্রীগণ যবের রুটি দিয়েও তো কখনও উদরপূর্তি করে আহার করেন নি। হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে খোদা (সঃ) এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ একাধারে কয়েক রাত ধরে অনাহারে থাকতেন। ঐ সময় তাঁদের ঘরে খাবার থাকতো না।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) কখনও টেবিলে বা প্লেটে আহার করেন নি এবং তাঁর জন্য পাতলা চাপাতি রুটিও তৈয়ার করা হতোনা। খুব মোটাতাজা বকরীর গোশতও তাঁর সামনে কখনও দেখা যেতোনা। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) খানাপিনা করে পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন এরকম হতো না। আর এব্যাপারে কারও কাছে তিনি অভিযোগও করতেন না। হুজুর পাক (সঃ)-এর নিকট ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র অধিকতর পছন্দনীয় ছিলো। তিনি দারিদ্রের মধ্যেই দিনাতিপাত করতেন। রাত্রিবেলায় সমস্ত রাত্রি পেট মুবারকের উপর ক্ষুধা মালিশ করতেন। ক্ষুধা মালিশ করা এটি একটি রূপক কথা, যার অর্থ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর থাকা। রাত্রিবেলা এ অবস্থায় থাকার কারণে তিনি যে রোজা রাখা থেকে বিরত থাকতেন—তাও নয়। অথচ তিনি যদি পরওয়ার দিগারের কাছে চাইতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত ধন ভাণ্ডার, সমস্ত ফলফলাদি লাভ করতেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এর এমন অবস্থা দেখে মহব্বতের তাড়নায় আমার কান্না এসে যেতো। আমি তাঁর এমন অবস্থা দেখে কখনো কখনো আমার হাত দিয়ে তাঁর পেট মুবারক মালিশ করে দিতাম। ক্ষুধায় কাতর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলতাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার জন্য আমার জান কুরবান হোক। আপনার খানাপিনার জন্য এবং শরীরে শক্তি সঞ্চারের জন্য যতটুকু দরকার, ততোটুকু যদি আপনি দুনিয়া থেকে গ্রহণ করতেন!—একথা শুনে হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করতেন, হে আয়েশা! দুনিয়া দিয়ে আমি কি করবো? আমার ভ্রাতৃবর্গ যাঁরা উলুল আযম পয়গম্বর ছিলেন, তাঁরাতো এর চেয়ে বেশী কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করে গেছেন। এমনকি তাঁরা সে অবস্থায় থেকে নিজেদের অবস্থাকে অতিক্রম করে চলে গেছেন। আপন প্রতিপালক হকতায়ালার কাছে পৌঁছে গেছেন। সে অবস্থায় তাঁদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকে হকতায়ালা অনেক মূল্য দিয়েছেন। তাঁদেরকে অনেক ছাওয়াব দানে ধন্য করেছেন। তাঁদের সেই অবস্থাবলীর দিকে লক্ষ্য করে আমি যখন আমার নিজের দিকে তাকাই, তখন লজ্জিত হয়ে পড়ি। চিন্তা করি, আমি কি এরূপ জীবন যাপন করবো, যা আগামী কালই আমার কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হবে? কাজেই আমার কাছে আমার ভাইগণের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চাইতে অধিকতর প্রিয় আর কিছুই নেই। সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ ঘটনার পর হুজুর পাক (সঃ) এক মাসের অধিক এ দুনিয়াতে অবস্থান করেন নি।

সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর স্বতন্ত্র কোনো বিছানা ছিলো না। শুধু এমন একটি বিছানা ছিলো যাতে তুলার পরিবর্তে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো। হজরত হাফসা (রাঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র ঘরে দু'খানা সুতির বিছানা (কম্বল) ছিলো। যা দু' ভাঁজ করে বিছানো হতো। তিনি তাতে আরাম করতেন। এক রাত্রিতে আমি তা চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম যাতে বিছানাটি একটু নরোম হয়। পরদিন সকালে হুজুর (সঃ) বললেন, আজ রাতে তুমি আমার জন্য কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, যা দৈনিকই বিছানো হয়, তাই বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তবে আজ রাতে আমি বিছানাটি চার ভাঁজ করেছিলাম। তখন হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, পূর্বের অবস্থাই ভালো। কেননা নরোম বিছানা আমার রাতের নামাজ আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাঁর পবিত্র অভ্যাস এমন ছিলো যে, তিনি কখনও তক্তার উপর শুয়ে আরাম করতেন। আবার কখনও খেজুরের চাটাই এর উপর শয়ন করতেন। তাঁর দেহ মুবারকে চাটাই এর দাগ পড়ে যেতো।

আল্লাহ্পাকের ভয় ও ইবাদতে কঠোরতা

হুজুর আকরম (সঃ) এর খওফ বা আল্লাহ্ভীতি, হকতায়ালা শানুহুর আনুগত্য ও ইবাদত—এসব ছিলো আল্লাহ্তায়ালার এলেম ও মারেফত অনুসারে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এলেম এবং মারেফতের পরিমাণ অনুযায়ী আল্লাহভীতি এবং ইবাদতের যোগ্যতা লাভ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে তারাই আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করে যাঁরা আলেম।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি রোদন করতে।-তিরমিযী শরীফে এতোটুকু বেশী বলা হয়েছে, তোমরা যা কিছু দেখতে পাওনা আমি সে সবকিছু দেখি। তোমরা যাকিছু শুনতে পাওনা আমি সেসব শুনি। তিনি আরও বলেন, আকাশে এক বিশেষ ধরনের আওয়ায হয়ে থাকে, তাকে আতইয়াত বলা হয়—তাও আমি শুনতে পাই। ভার বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে উট যে কষ্টকর আওয়ায করে, তাকে আতইয়াত বলা হয়। আকাশের ফেরেশতাগণের আধিক্যের কারণে সেখানেও এক ধরনের আওয়ায হয়ে থাকে। আতইয়াত দ্বারা সে আওয়াযকে বুঝানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আকাশে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই যেখানে ফেরেশতাগণ কপাল রেখে যাতে বারীতায়ালাকে সেজদা করছে না।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুব কম হাসতে এবং খুব বেশী ক্রন্দন করতে। আর স্ত্রীগণের সঙ্গে শয়ন করার আগ্রহ পরিত্যাগ করতে। যমীন ও তার উঁচু উঁচু টিলার দিকে বেরিয়ে পড়তে। রাস্তার দিকে বেরিয়ে পড়তে। রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আর্তনাদ করে ক্রন্দন করতে। তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে। চিৎকার করে করে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে প্রার্থনা করতে। এর মমার্থ হচ্ছে এই যে, আমার এলেম থাকা সত্বেও ধৈর্যের মাধ্যমে সে ভার আমি বহন করছি। তোমরা জানলে কক্ষণও এই ভার বহন করতে পারতে না। হজরত আবু যর (রাঃ) যিনি এই হাদীছের রাবী, তিনি বলেন, আমি (এই হাদীছ শ্রবণ করার পর থেকে) সর্বদাই কামনা করি, আমি যদি গাছ হতাম আর আমাকে কেটে ফেলা হতো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম একদিন আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি পর্যবেক্ষণ করছেন? হুজুর (সঃ) বললেন, বেহেশত ও দোযখ দেখছি।

কাজেই হুজুর পাক (সঃ) এর যে আন্তরিক আল্লাহ্‌ভীতি ছিলো, আল্লাহ্‌তায়ালার আযমত কে সর্বদাই সত্তায় উপস্থিত রাখার মাধ্যমে। তাঁর এলমুল হীয়াকীন ও আইনুল ইয়াকীনের যে শান বা অবস্থা ছিলো অন্তরে, তাতো অন্য কারও মধ্যে থাকতেই পারেনা। হাদীছ শরীফে এসেছে, হুজুর পাক (সঃ) নামাজে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেতো। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম আরয করতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আপনি এতো কষ্ট স্বীকার করছেন কেনো? আল্লাহ্‌তায়ালা তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাই করে দিয়েছেন। আপনিতো ক্ষমাপ্রাপ্ত। তখন তিনি এরশাদ করতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে আমাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত বানিয়েছেন, এই যে তাঁর দয়া ও করম তার জন্য কি আমি শুকরিয়া আদায় করবোনা?

সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর যাবতীয় আমল স্থায়ী ছিলো। হুজুর আকরম (সঃ) আমল করতে যেয়ে যে রকম কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা সহ্য করার মতো আর কে আছে?

হজরত আউফ ইবন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে আমি হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন।

মিসওয়াক করার পর অজু করে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুজুর (সঃ) নামাজে সূরা বাকারা তেলাওয়াত শুরু করলেন। যেখানে রহমত সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করলেন, সেখানেই হুজুর (সঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট রহমতের আবেদন জানালেন। আর যখনই আযাব সংক্রান্ত কোনো আয়াত পাঠ করলেন, তখনই তিনি সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আযাব থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন। অতঃপর যেমন দীর্ঘ সময় দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন, ঐ রকম দীর্ঘ সময় রুকুতে কাটালেন। রুকু অবস্থায় তিনি এই দোয়া পড়লেন-

سبحان ذى الجبروت والعظمة والكبرياء

এর পর রুকু থেকে সোজা হয়ে ঐ পরিমাণ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেখানেও এই দোয়া পাঠ করলেন। অতঃপর সেজদা করলেন। এখানেও তাই দোয়াই পাঠ করলেন। অতঃপর দুই সেজদার মাঝে বসলেন। এখানেও তাই রকম দোয়া পাঠ করলেন। এরপর বাকি অন্যান্য রাকাতে সূরা আল এমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা তেলাওয়াত করলেন। আবার কখনও কখনও হুজুর পাক (সঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় একই আয়াত পাঠ করে করে সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। এক বিবরণে এসেছে, সেই আয়াতটি হচ্ছে— আপনি যদি তাদেরকে আযাব দেন তবুও তো তারা আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী ও হেকমতের অধিকারী। নামাজে উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্য উম্মতের অবস্থা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিকট পেশ করা এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের আবেদন করা। বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন তাঁর পেট মুবারকের ভিতর থেকে ফুটন্ত ডেক থেকে উত্থিত আওয়াযের মতো আওয়ায বের হতে থাকতো।

ইবন আবী হালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এর এমন অবস্থা হতো যে, অনবরত চিন্তা ও পর্যায়ক্রমিক মানসিক যন্ত্রণা চলতে থাকতো। হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে দৈনিক সত্তুরবার এস্তেগফার করে থাকি। অন্য এক বিবরণে আছে, একশ' বার। এরকম দুশ্চিন্তা ও এস্তেগফার সবকিছুই ছিলো তাঁর উম্মতের জন্য। এছাড়াও উলামায়ে কেরাম এর অন্যান্য কারণ উল্লেখ

করেছেন, 'মারাজুল বাহ্‌রাইন' নামক পুস্তিকাতে যার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে খোদা (সঃ) এর কাছে হকতায়ালার সঙ্গে মিলনের তরীকা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমার সম্মদের শিরোমণি হচ্ছে মারেফত। আমার দ্বীনের মূল হচ্ছে আকল। আর মহব্বত হচ্ছে তার ভিত্তি। শওক বা আত্মিক আগ্রহ হচ্ছে আমার বাহন। আল্লাহ্‌র জিকির আমার বন্ধু। ভালোবাসা আমার ভাণ্ডার। আর মানসিক চিন্তা-এ হচ্ছে আমার সাথী। এলেম আমার হাতিয়ার। ছবর আমার চাদর।রেযা বা সন্তুষ্টি হচ্ছে আমার গনীমত। ফকিরী হচ্ছে আমার অহংকার। যুহ্‌দ বা অনাসক্তি আমার পেশা। একীন হচ্ছে আমার শক্তি। সত্যবাদিতা আমার প্রিয়বন্ধু। আনুগত্য আমার ভালোবাসা। জেহাদ আমার সৌন্দর্য। চোখের শীতলতা ও প্রশান্তি হচ্ছে নামাজ। আমার অন্তরের ফল হচ্ছে আল্লাহ্‌র জিকির ও উম্মতের চিন্তা। আমার শওক বা আত্মীক আগ্রহ রব্বুল আলামীনের প্রতি।

কুরআনে পাকের দৃষ্টিতে উপরোক্ত গুণাবলী ও পবিত্র স্বভাবসমূহ

সহীহ্ বুখারী শরীফে হজরত আতা (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীছে নবীকরীম (সঃ) এর অধিকাংশ আখলাক সমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। আর ঐ সমস্ত গুণাবলী থেকে কতিপয় উন্নত মানের গুণাবলী কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এমর্মে হাদীছে কুদসীতে এসেছে, হে নবী (সঃ) আমি আপনাকে পূর্ববর্তী কাওম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানকারী, অনুগত সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী এবং উম্মী সম্প্রদায় অর্থাৎ আপনার কাওমের লোকদের জন্য আশ্রয়দাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি। 'সাররাহ' নামক গ্রন্থে حرز 'হেরয' শব্দের অর্থ করা হয়েছে সমতল ও উৎকৃষ্টস্থান। যেহেতু সমতল ও উৎকৃষ্ট স্থানে মানুষ বিপদের সময় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। হাদীছ শরীফে আরও এসেছে, আপনি আমার বিশেষ বান্দা। আবদিয়াতের মাকামের হাকীকত ও মর্তবা খাছ করে আপনার জন্যই। এর যথার্থ মাকাম ও মর্যাদা অন্য কারও জন্য সমীচীনই নয়। আমি আপনাকে সমস্ত মাখলুকের কাছে রসূল করে প্রেরণ করেছি। আমি আপনার নামকরণ করেছি মুতাক্কিল। যেহেতু আপনি আপনার যাবতীয় কাজকর্মের ভালোমন্দের ফলাফল আমার উপর সমর্পণ করেছেন। আপনার নিজস্ব শক্তি ও সামর্থকে অস্বীকার করেছেন। কাজেই আপনার যাবতীয় কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আমার এ খাছ বান্দা এমন যে, তাঁর কথায়

কোনোরকম কঠোরতা ও রুক্ষতা নেই। তিনি বাজারে উঁচু স্বরে কথা বলেন না। 'বাজারে' কথাটি কয়দে এত্তেফাকী। কারণ বাজারে সাধারণতঃ উঁচু স্বরে কথাবার্তা ও হট্টগোল হয়ে থাকে। এ কথার মর্ম এই যে, তিনি বাজারে আসা থেকে যতদূর সম্ভব বেঁচে থাকতেন। যেহেতু বাজার হচ্ছে পার্থিব কাজ কারবারের স্থান। তাই পরকালপ্রেমিকের জন্য বিনা প্রয়োজনে বাজারে যাওয়াটা তাঁর অবস্থার উপযোগী নয়।

তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করতেন না। কথার মর্মার্থ এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) মন্দকাজের বদলা মন্দ কাজের মাধ্যমে গ্রহণ করতেন না। এ কাজটি শরীয়তসম্মত, যদি সীমা অতিক্রম করা না হয়। কিন্তু তিনি অপরাধ ক্ষমা করতেন এবং ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করতেন। অনুগ্রহ করতেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি এরশাদ করেছেন, যা উত্তম তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো। আর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ) কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বক্র সম্প্রদায়কে সরল করে দেবেন এবং এ সম্প্রদায় কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে সরল সোজা হয়ে যাবে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা অন্ধকে দৃষ্টি দান করবেন। শ্রুতির বধিরতা দূর করে দেবেন ও কলবের পর্দাকে সরিয়ে দেবেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পূর্বোক্ত বর্ণনার সাথে এতটুকু বেশী যোগ করা হয়েছে,—আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমি তাঁকে যাবতীয় সৌন্দর্য ও সৎস্বভাবের দ্বারা সুন্দর করেছি। 'সাররাহ' নামক গ্রন্থে এর অর্থ করা হয়েছে, সঠিক কথা বলা এবং সঠিক কাজ করা। আমি তাঁকে যাবতীয় সম্মানিত স্বভাব দান করেছি। পরিয়েছি প্রশান্তির পোশাক। নেকী ও কল্যাণকে করেছি তাঁর নিদর্শন এবং পরহেজগারীকে করেছি তাঁর হৃদয়। যেহেতু পরহেজগারী হৃদয়সম্পৃক্ত ব্যাপার। এই পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর আকরম (সঃ) নিজের সীনার দিকে ইশারা করে এরশাদ করেছেন, তাকওয়া বা পরহেজগারী এখানে। সীনাকে এখানে যমীর বলা হয়েছে। কেননা, মনের ভিতর কোনো কথা লুকিয়ে রাখাকে বলা হয় اضمار 'এযমার'। 'ওয়ালহেকমাতু মাকুলাতুন' আমি হেকমতকে তাঁর বুদ্ধি বানিয়েছি। কোনো বস্তুর মধ্যে তার প্রকৃত যে অবস্থা থাকে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়াকে হেকমত বলা হয়। আবার সত্যকথা বলা বা সঠিক কাজ করা অর্থেও হেকমত শব্দ ব্যবহৃত হয়। সত্যবাদীতা ও প্রতিশ্রুতিপালনকে তাঁর স্বভাব বানিয়েছি। ক্ষমা করা ও ভালো কাজের আদেশ করাকে তাঁর চরিত্র বানিয়েছি। ন্যায়বিচার বা মধ্যপন্থাকে তাঁর জীবন, সত্যকে তাঁর শরীয়ত, হেদায়েতকে তাঁর ইমান আর ইসলামকে তাঁর মিল্লাত বানিয়েছি।

তাঁর সম্মানিত নাম হচ্ছে আহমদ। হুজুর আকরম (সঃ) অতীতের উম্মতগণের কাছে আহমদ ও মোহাম্মদ (সঃ) উভয় নামেই পরিচিত ছিলেন। পথভ্রষ্টতার পর আমি তাঁর ওসিলায় সঠিক পথ দেখিয়েছি। অজ্ঞতার পর আমি তাঁর ওসিলায় জ্ঞান প্রদান করেছি। আমি তাঁর মাধ্যমে মাখলুককে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উঠিয়েছি। অপরিচিতির পর আমি তাঁর ওসিলায় মাখলুককে পরিচিতির মাকামে উন্নীত করেছি।

স্বল্পতার পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে প্রাচুর্য দিয়েছি। দারিদ্র ও মুখাপেক্ষীতার পর আমি তাঁর ওসিলায় তাদেরকে সম্পদশালী করেছি। আমি তাঁর মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত অন্তরগুলিকে একাত্ম করেছি, বিভিন্ন চিন্তাধারাকে সমন্বিত করেছি। আর তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মতের তুলনায় উত্তম উম্মত বানিয়েছি, যাদেরকে সমগ্র মানব জাতির জন্য বিকশিত করা হয়েছে।

صلى الله عليه وسلم واله واصحابه اجمعين

তৃতীয় অধ্যায়

আয়াতে কুরআনী ও হাদীছের আলোকে মহানবী (সঃ) এর মর্যাদা

এই অধ্যায়ে হুজুর পাক (সঃ) এর এমন মর্যাদা, সম্মান ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং সহীহ্ হাদীছ সমূহের আলোকেপ্রাপ্ত। কুরআনুল কারীমে নবীকরীম (সঃ) এর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চ মর্যাদা, সম্মান ও প্রশংসায় বিভিন্ন বর্ণনা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম দলীল হচ্ছে 'শাহেদ'। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন انا ارسلنك شاهدا ইন্না আরসালনাকা শাহেদান। 'শাহেদ' শব্দের মর্মার্থ—উচ্চ মাকাম, সমুন্নত মর্যাদা, মহান শান এবং শিষ্টাচার সংরক্ষণ। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, কোনো বুজুর্গী এবং মর্যাদা তাঁর বুজুর্গী ও মর্যাদার সমকক্ষ হতে পারে না। এ কেমন মর্যাদা? স্বয়ং আরশের অধিপতি আল্লাহ্তায়ালা যার প্রশংসা করেছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, কুরআনে করীমে নবীকরীম (সঃ) এর গুণাবলী, মর্তবা ও মর্যাদার যে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তা সংখ্যার গণ্ডিতে সীমিত করা সম্ভব নয়। প্রথমে ঐ আয়াত সম্পর্কে আসা যাক যা হুজুর আকরম (সঃ) এর রেসালাত, হৃদয়জ প্রেম ও তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ্ সম্পর্কে জগদ্বাসীকে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একজন রসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের দুঃখ দুর্দশায় বড়ই ব্যথিত, তোমাদের সফলতার প্রবল আকাংখী। আর মুমিন মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ্প্রবণ-বড়ই দয়ালু। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তোমাদের কাছে এমন একজন নবীর আগমন ঘটেছে, যিনি তোমাদের স্বগোত্রীয় এবং তোমাদের স্বশ্রেণীভুক্ত। তিনি তোমাদের থেকে ভিন্ন কেউ নন! কাজেই তোমরা তাঁর আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদীতার মাকাম ও মর্তবা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবহিত আছো। তিনি তো কোনোদিন তোমাদের কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হননি। তোমরা শুধু তাঁর সম্পর্কেই অবহিত আছো এমনটি নয়, বরং তাঁর পিতা পিতামহ ও পূর্ব

পুরুষদেরকেও খুব ভালোভাবে জানো। তাঁরা তো সমগ্র আরব জাহানে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, উত্তম, উচ্চ মর্যাদাশালী ও পবিত্রজন ছিলেন। তাঁরা কেউ রক্তপ্রবাহিতকারী ছিলেন না। ছিলেন না ব্যাভিচারী বা অশ্লীল উক্তিকারী। মূর্খতার অপরিচ্ছন্নতা তাঁদেরকে কলংকিত করতে পারেনি। এমর্মে নবীকরীম (সঃ) স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠসমূহ থেকে পবিত্র গর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করে বাহ্যিক জগতে প্রকাশ করা হয়েছে।' — হে মক্কাবাসী! তোমরা তো তাঁর সত্তাগত মর্যাদা, প্রশংসনীয় গুণাবলী, মহান আখলাক, সুন্দর ও মনোরম কার্যাবলী নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছো। অধিকন্তু তাঁর কোনো কোনো গুণাবলী সম্পর্কে নিজেরাও বর্ণনা করেছো। এ অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সম্পর্কে বলছেন, তোমাদের দুঃখকষ্টে পতিত হওয়া তাঁর কাছে বড়ই মর্মবিদারক ব্যাপার। দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও আক্ষেপকারী হবে, এটা তাঁর কাছে অসহনীয়। তোমরা সঠিক পথে এসো, হেদায়েত গ্রহণ করো। এই বিষয়ে তাঁর বাসনা তীব্র এবং আত্মপ্রত্যয় অত্যধিক। তিনি মুসলমানগণের প্রতি পরিপূর্ণ দয়ার্দ্রতা, স্নেহশীলতা ও মায়ামমতা পোষণকারী। অন্য জায়গায় আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদেরই ভিতর থেকে তাদের জন্য রসূল প্রেরণ করার মাধ্যমে। আল্লাহ্পাক আরও বলেন, আল্লাহ্তায়ালা তো ঐ মহান সত্তা, যিনি উম্মীগণের ভিতর থেকে একজনকে তাদের জন্য রসূল হিশেবে প্রেরণ করেছেন। আরও বলেছেন, যেমন আমি তোমাদের ভিতর থেকেই তোমাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছি। স্বজাতী, স্বশ্রেণী, স্বগোত্র থেকে মানব জাতির জন্য রসূল প্রেরণ করাটা আল্লাহ্তায়ালার বিরাট অনুকম্পা। এর ফলে তাঁকে স্বীকার করা, তাঁর প্রতি ইমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে গেলো। অবোধগম্যতার বিপদ থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করলো।

সাইয়্যেদুনা ইমাম হজরত জাফর সাদেক (রঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় মারেফত ও ইবাদত থেকে মাখলুককে অক্ষম দেখলেন। তাই তিনি চাইলেন মাখলুকের কাছে স্বীয় মারেফত প্রদান করতে এবং তাদেরকে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করতে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন একজন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, যিনি তাদেরই স্বশ্রেণীভুক্ত। তাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় গুণাবলী থেকে রহমত ও মেহেরবানীর পোশাক পরিয়ে দিলেন। তাঁর নাম রাখলেন নবীয়ে সাদেক এবং রসূলে হক। এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাগণের পক্ষ থেকে তাঁর রসূলের প্রতি যে আনুগত্য করা হবে, তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য হিশেবে কবুল করে নিলেন। এ

পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক ঘোষণা দিয়েছেন, 'যে রসূলে কারীম (সঃ) এর আনুগত্য করে সে আল্লাহ্তায়ালারই আনুগত্য করে।' 'আপনাকে সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।' (ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বক্তব্য এখানেই শেষ)।

হকতায়ালা শানুহু স্বীয় সত্তার অস্তিত্ব ও তাঁর শামায়েল ও সিফত সমূহকে মাখলুকের প্রতি একটি রহমত রঞ্জিত সত্তা বানিয়ে দিলেন। সুতরাং সে রহমতের অংশ যাঁর ভাগ্যেই ঘটলো সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাত পেলো। এবং যাবতীয় অপকৃষ্টতা ও অপকর্ষতা থেকে রক্ষা পেলো। যার ফলে মানুষ মাহবুবে হাকীকীর সাথে মিলন লাভে ধন্য হতে এবং কৃতকার্য হতে সক্ষম হলো। এরকম বলা হয়েছে কিতাবুশ্‌শেফা গ্রন্থে। উপরোল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হুজুর আকরম (সঃ) মুমিনগণের জন্য রহমত হওয়ার মর্মার্থ হলো তিনি মাযহার ও মাযদারে রহমত। অর্থাৎ রহমতের উৎস ও প্রকাশস্থল। কেউ যদি এনকার, বিরুদ্ধাচরণ ও অহংকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুর্ভাগ্য, পথভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হয়, তাহলে সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করলো— তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত আলোচনাটি আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ — وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون এর মর্মার্থের অনুকূল। মুফাস্‌সিরে কেরাম বলেন, আল্লাহ্তায়ালা জ্বীন ও ইনসানকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, তারা ইবাদতের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ আছে। যেনো তাদের মধ্যে ইবাদত করার মত মুলাহিয়াত ও যোগ্যতা দিয়েই আল্লাহ্পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা যেনো এবিষয়টি তাদের জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে চিন্তা ফিকির করে দেখে। কামনা ও রোষের প্রাবল্য থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক। জ্ঞানই মানুষের জন্য ইবাদতের উপযোগী উপায় উপকরণ ও আঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যম। তাই হুজুর আকরম (সঃ) মুসলমানদের জন্য بالفعل 'বিলফেল' (কাজের মাধ্যমে), আর অন্যান্য মানুষের জন্য بالقوة (শক্তির মাধ্যমে) রহমত। কেউ কেউ আবার হুজুর পাক (সঃ) কে সকলের জন্যই 'বিলফেল' রহমত মনে করে থাকেন। তাঁরা একথাটির ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করে থাকেন যে, হুজুর পাক (সঃ) মুমিনদের জন্য রহমত হেদায়েতের মাধ্যমে। মুনাফেকদের জন্য রহমত হত্যা থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তির মাধ্যমে। কাফেরদের জন্য রহমত আযাব ও গযব বিলম্বিত হওয়ার মাধ্যমে। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, রসূলে পাক (সঃ) কে অমান্য করার কারণে দুনিয়াতে কাফেরদের উপর আযাব গযব তাড়াতাড়ি এসে যাওয়া, তাদেরকে হামলা করা, হত্যা করা, ফাসাদকারীদেরকে হালাক করে দেয়া— এটাও রহমত। কেননা, এজগতের শৃংখলা ও সংশোধন এরই উপর নির্ভরশীল। যেমন একটি বৃক্ষ থেকে খারাপ ও শুকনো ডালপালা কেটে ফেললে দেখা যাবে অন্যান্য ভালো ডালপালার জন্য এটা উপকারী হয়েছে। এতে করে উক্ত বৃক্ষে নতুন নতুন তাজা ডালপালা গজাবে এবং ফলদানে তা সহায়ক হবে।

হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) মুসলমানদের জন্য রহমত স্বরূপ। তেমনিভাবে কাফেরদের জন্যও রহমত সন্দেহ নেই। কাফেরদের জন্য রহমত এ হিসেবে যে, আগের জামানার কাফেরদের উপর যে সমস্ত আযাব ও গযব পতিত হতো, তা কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) যমানার কাফেরদের উপর পতিত হতো না।

হাদীছ শরীফে এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার রহমতের আশ আপনিও কি লাভ করেছেন? তিনি আরয করলেন, হাঁ। কেননা আমি সর্বাদাই আমার পরিণাম সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম। এখন আমি শংকামুক্ত হয়েছি। কেননা, হকতায়ালা শানুহু আপনার উপর যে কালাম নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে আমার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, জিব্রাইল (আঃ) শক্তির অধিকারী, তিনি আরশের অধিপতির নিকট অবস্থানকারী, অন্যান্য ফেরেশতাবৃন্দ তাঁর আনুগত্য করে থাকেন, সেখানে তিনি আমানতদার। হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর এই ভয় ভীতি ছিলো হকতায়ালা শানুহুর অমুখাপেক্ষীতার শানের প্রতি লক্ষ্য করে। হকতায়ালা শানুহুর নৈকট্যভাজনগণ এ ভয়ভীতি থেকে কখনও মুক্ত হতে পারেন না।

আহলে আরেফগণ বলেন, যে দিন ইবলীস মালউন আল্লাহ্তায়ালার দরবার থেকে বিতাড়িত হলো, সেদিন থেকে আলমে মালাকুতের অধিবাসীগণের নিশ্চিন্ততা দূর হয়ে গেলো। সেদিন থেকে তাঁরা সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আছেন। যদিও শান্তি ও নিশ্চিন্ততার সত্য অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ছিলেন নিরাপদ। তথাপিও তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যেমন সাহাবায়ে কেরামের বেলায় দেখা যায়। সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আখেরাতের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁরা কেউ এরকম বলতেন, হায়! আমি যদি একটা বৃক্ষ হতাম, আর আমাকে কেটে ফেলা হতো। আবার কেউ

বলতেন, হায় আফসোস্! আমি যদি একটা দুম্বা হতাম, মানুষেরা আমাকে জবেহ্ করে খেয়ে ফেলতো।

বড় বড় পয়গম্বরগণের উক্তি, তোমরা যে শরীক করো তার ভয় আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ্পাকের রেযামন্দীর উপর আমি নির্ভরশীল। আরও বলেছেন, এজগতে আমাদের সুরক্ষিত থাকার উপায় নেই, তবে আমাদের প্রভু যদি ইচ্ছা করেন। তাঁদের এসমস্ত কথাও উপরোক্ত পর্যায়ের।

তফসীরে কাশ্শাফ এর প্রণেতা যমখশরী ذی قوة عندذی العرش مكين আয়াতের অপব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে নবীকরীম (সঃ) এর চেয়ে অধিকতর মর্যাদাশালী হিসেবে দলীল পেশ করে থাকেন। কিন্তু তাঁর উক্ত দলীল নিতান্তই দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই। এই সহজ কথাটিও তাঁর বোধগম্যের বাইরে যে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর লব্ধ মর্যাদা হুজুর আকরম (সঃ) এর মাধ্যমেই লাভ হয়েছে। একথাটিও তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত আয়াত দ্বারা হজরত জিব্রাইল (আঃ) যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তা হুজুর পাক (সঃ) এর গুণাবলীর পূর্ণতার এক পার্শ্বতুল্যও নয়। সে তুলনায় তাঁর এহেন মর্যাদা নেহায়েতই নগণ্য। হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর গুণাবলীতো গণনাযোগ্য। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) এর গুণাবলী সংখ্যা ও গণনার মাধ্যমে সীমিত করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারটি এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে, কোনো এক ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ গুণ রয়েছে বলে এরকম চিন্তা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই যে, অপর ব্যক্তির মধ্যে উক্ত গুণটি বিদ্যমান নেই। হাঁ হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে খুব বেশী বলতে গেলে এরকম বলা যেতে পারে যে, তাঁর মর্যাদার কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, হুজুর পাক (সঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে কারীমে কি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে তো তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন উপাধি দেয়া হয়েছে। তিনি সমস্ত জগতের রহ্মত। ফেরেশতাকুলও তো একটা জগতের অধিবাসী। সুতরাং তিনি সে জগতের জন্যও রহমত সন্দেহ নেই। সুতরাং এটাই সাব্যস্ত হয় যে, হুজুর পাক (সঃ) এর মর্যাদা অধিক। উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে কোনো কোনো মুফাসসীর তো এরকম মত পেশ করে থাকেন যে, উক্ত আয়াত দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) এর শান ব্যক্ত করা হয়েছে। انه لقول رسول كريم (নিশ্চয় এটা একজন সম্মানিত রসূলের মাধ্যমে প্রচারিত বাণী) এই আয়াতের রসূল শব্দের দ্বারা তাঁরা মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বুঝিয়ে থাকেন।

হুজুর আকরম (সঃ) এর সত্তা থেকে সমস্ত জগতের অংশ সমূহ যে রহমতের ভাগ পেয়েছে এ সম্পর্কে কোনো কোনো উলামা এরকম বলে থাকেন যে, মাটি তাঁর মাধ্যমে রহমতের অংশ পেয়ে 'মুতাহির' অর্থাৎ পবিত্রকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পানি রহমতের ভাগ এভাবে পেয়েছে যে, তুফান থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাতাসের রহমতপ্রাপ্তির বিবরণ এরকম, শয়তানের রাস্তায়ও সে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে সক্ষম। আবার ঘনঘটা সাজিয়ে কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারেও সে ক্ষমতাবান। অগ্নি রহমতের হিস্সা এভাবে লাভ করেছে যে, হুজুর পাক (সঃ) এর জন্যই সদকার মাল জ্বালিয়ে দেয়ার মতো যুলুম থেকে সে বেঁচে গেছে। আকাশ রহমতের অংশ পেয়ে, আড়িপেতে শ্রবণকারী শয়তান থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে। এসবই লাভ হয়েছে হুজুর পাক (সঃ) এর কারণে।

শায়েখ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি এ অধমকে জিজ্ঞেস করলো, হুজুরপাক (সঃ) থেকে ইবলিস রহমতের কোন্ অংশ পেয়েছে? আমি জবাব দিয়েছি, হুজুর আকরম (সঃ) এর শান শওকত, হাদারাত ও হাক্কানিয়াতের আঘাতে, তদুপরি আল্লাহ্‌র বাণী فيدمغه فاذاهوزاهق ও جاء الحق وزهق الباطل এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবলিস মালউন ধ্বংস হয়ে যেতো। নিশ্চিহ্ন, নাস্তানাবুদ হয়ে যেতো। কিন্তু হুজুরপাক (সঃ) এর রহমতের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে গেলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত আযাবের অপেক্ষা করার সুযোগ লাভ করলো। এটা তার জন্য আপাতত রহমত বলা যেতে পারে। এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে হুজুর আকরম (সঃ) এর খাতিরে।

নূর ও অনির্বাণ প্রদীপ

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে সীমাহীন উজ্জ্বল মুনাওয়ার হওয়ার কারণে নাম দিয়েছেন নূর ও সীরাজুম্মুনীর। তাঁর এই নামকরণের যৌক্তিকতা এ স্বার্থকতা অবশ্যই আছে। যেহেতু জগৎবাসী তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য ও মিলনের পথ পেয়েছে। তাঁর জামাল ও কামালের মাধ্যমেই জগৎবাসী দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এমর্মে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নূর ও নিশ্চিত কিতাব এসেছে।' আল্লাহ্‌তায়ালা আরও এরশাদ করেন, 'হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসাবে, সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী

রূপে, আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলোকে প্রদানকারী প্রদীপ করে।'

উলামায়ে কেরাম বলেন, হকতায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে প্রদীপের সাথে উপমা দিয়েছেন। উপমাগত ভাবে প্রদীপের চেয়ে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে উজ্বলতা বেশী। অথচ আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে প্রদীপের সাথে উপমা দিয়েছেন। এর হেকমত এই যে, হুজুরপাক (সঃ) এর মৌলিক সত্তা পৃথিবীস্পৃষ্ট। তাই পৃথিবীর বস্তুর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হেকমত এই যে, প্রদীপ তার প্রতিনিধি রাখতে পারে। এক প্রদীপ থেকে লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে। এর বিপরীতে চন্দ্র বা সূর্যের ব্যাপার চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তারা যত বড় গুণের অধিকারীই হোক না কেনো, প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপও বলা যায়, আল্লাহ্তায়ালা যে প্রদীপের সঙ্গে তাঁর উপমা দিয়েছেন, সে প্রদীপ মানে সূর্য—এরূপ বলা হলেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূর্যকে প্রদীপও বলেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আকাশে উজ্জ্বলকারী প্রদীপ (সূর্য) ও চন্দ্র সৃজন করেছেন। আরও বলেছেন, আমি চমকিত প্রদীপ অর্থাৎ সূর্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং সূর্য যেমন তার নূর বিচ্ছুরিত করে জড় জগতের উপকার করছে অথচ নিজে কোনো কিছু থেকে উপকার গ্রহণ করছে না, তেমনি হুজুর আকরম (সঃ) এর পূত পবিত্র সত্তা সমগ্র মানবকুলের জন্য স্বীয় আকলী নূর সমূহের মাধ্যমে ফায়দা প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্তায়ালার যাতে পাক ব্যতীত অন্য কিছু থেকে কখনও ফায়দা গ্রহণ করেননি। হুজুর আকরম (সঃ) কে যদি চন্দ্রের সাথে উপমা দেয়া হয়, তাহলেও তা যথাযথ উপমা হবে সন্দেহ নেই। কেননা, চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে থাকে, তেমনি হুজুর পাক (সঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট থেকে নূর লাভ করেছেন। যেমন কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা আসমান ও যমীনের নূর। এই আয়াতে কারীমা থেকে ধারণা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা আসমান ও যমীনের মধ্যে নূর-এমনটি নয়। অর্থাৎ সে নূর আসমান ও যমীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ নূর আসমান ও যমীন সহ সমস্ত অস্তিত্বে ব্যাপৃত। আর সে নূর হচ্ছে সমগ্র বস্তুর অস্তিত্বের উৎস ও সবকিছুর হায়াতের মালিক। হুজুর পাক (সঃ)এর জামাল ও কামাল উপরোক্ত নূরে এলাহীর পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল এবং সে নূরের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। সুতরাং مثل نوره 'মাছালুনূরিহী' আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে মুফাস্সেরীনে

কেরাম বলেন, মোহাম্মদ (সঃ) এর কলবে স্থিত ইমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ দীপাধার যার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অনির্বাণ দীপশিখা। অর্থাৎ পবিত্র হৃদয় হচ্ছে দীপাধার আর ইমান হচ্ছে দীপশিখা। মেশকাত বা দীপাধার বলতে বুঝানো হয়েছে হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র বক্ষ। আর 'যুজাজা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে পূতপবিত্র কলব। আয়াতের মেসবাহ্ শব্দের অর্থ হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র কলবে অবস্থিত ইমান ও মারেফতের নূর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ ফরমান, 'আমি কি আপনার পবিত্র বক্ষকে সম্প্রসারিত করিনি?' সীনা সম্প্রসারিত করার মধ্যে যে সুমহান নেয়ামত রয়েছে তা প্রকাশ করণার্থেই আল্লাহ্পাক প্রশ্নের আকারে তাঁর হাবীব (সঃ) এর কাছে কথাটি বলেছেন। এই 'শরহে সদর' এর অর্থ হচ্ছে হুজুর আকরম (সঃ) এর সীনা মুবারককে প্রসারিত করে দেয়া। তাঁর 'বক্ষ সম্প্রসারণ' হাসিল হয়েছে হকতায়ালার কাছে কৃত যাবতীয় মুনাজাত ও মাখলুকাতকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে। মারেফতের নূর ও এলেম, তওহীদের এলেম, বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম মারেফত লাভের মাধ্যমে তাঁর বক্ষ সম্প্রসারিত হয়েছে। তাছাড়া মূর্খতা, ঘৃণিত কাজের সংকীর্ণতা ও সত্যবিমুখতার প্রতিকূল তিনি যে ধৈর্য ধারণ করেছেন তার মাধ্যমেও তাঁর বক্ষ সম্প্রসারিত হয়েছে। গায়রুল্লাহ্ থেকে সম্পর্ক ছেদের দ্বারাও শরহে সদর হাসিল হয়েছে। কখনও কখনও ওহী নাযিলের স্বাচ্ছন্দ্যতার মাধ্যমেও তা অর্জিত হয়েছে। দ্বীনের প্রচার ও রেসালতের কঠিন ভার বহন করার যে কষ্ট তিনি বরদাশত করেছেন এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে যে শক্তি সামর্থ যুগিয়েছেন—এ সমূহের মাধ্যমেও হুজুর আকরম (সঃ) এর সীনা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'আমি আপনার উপর থেকে ঐ বোঝাকে সরিয়ে দিয়েছি যা আপনার মেরুদন্ডকে ভেঙে দিচ্ছিলো।' শরহে সদর বা বক্ষসম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বুকের মধ্যে নূর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যার কারণে বান্দার অন্তর্লোক আলোকিত হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, নূর যখন কলবে প্রবেশ করে তখন তা সম্প্রসারিত হয়। প্রশস্ত হয়। আর সেই নূরের প্রতিক্রিয়া এই যে, এই নূর অন্তরকে মন্দ স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে দেয়। নূরের প্রভাবে হৃদয়ে যে গুণাবলীর আবির্ভাব হয় তার পরিপূর্ণ, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তমটিই ছিলো সৃষ্টির গৌরব মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর অধিকারে। তাছাড়া তাঁর অনুসরণকারীগণও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও মহব্বতের পরিমাণ অনুসারে নূর বা গুণাবলীর অংশ পেয়ে থাকেন। এ নূরের প্রসঙ্গটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'মফরুস্সাআদাত' নামক কিতাব ও কতিপয় ফার্সী

পুস্তিকায়। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, আমি আপনার নাম ও আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ করে দিয়েছি। তা পৃথিবীতে করেছি নবুওয়াত দান করে আর আখেরাতে করেছি শাফাআতের ক্ষমতা দিয়ে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর পবিত্র নামখানাকে তাঁর স্বীয় বুজুর্গ নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ইসলামের কালেমা, আযান, নামাজ ও সমস্ত খোৎবা সমূহে। এমন কোনো খোৎবা দানকারী নেই, এমন কোনো তাশাহ্‌হুদ পাঠকারী নেই এবং এমন কোনো নামাজ আদায়কারী নেই যে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সঙ্গে আশহাদু আন্না মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ পাঠ করেনা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে—রসূল (সঃ) বলেছেন, একদা হজরত জিব্রাইল (আঃ) এসে আরয করলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা জিজ্ঞেস করেছেন, কোন জিনিসের সাথে আপনার নামকে বুলন্দ করা হয়েছে? আমি বললাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বাধিক অবহিত। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বললেন, اذا ذكرت معى 'ইযা যুকিরতা যুকিরতা মায়ী' অর্থাৎ আপনার নাম আমার নামের সঙ্গে উচ্চারিত হবে। তাই ইমানকেও নির্ভরশীল করেছি আমার নামের সঙ্গে আপনার নাম উচ্চারণের বিধান দিয়ে। অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ বলা ব্যতীত ইমান শুদ্ধ হবেনা। শুধু তাই নয়, আপনার জিকিরকে আমার জিকির এবং আপনার আনুগত্যকে আমার আনুগত্য নির্ধারণ করেছি। সুতরাং কেউ যদি আপনার জিকির করে তবে সে আমারই জিকির করবে। কেউ যদি আপনার আনুগত্য করে, তবে আমারই আনুগত্য করবে। 'যে রসূলের আনুগত্য করলো সেতো আল্লাহ্ তায়ালারই আনুগত্য করলো।' (আল কুরআন)। বান্দার জন্য আপনার এত্তেবাকে আমার মহব্বতপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত করে দিয়েছি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসূল (সঃ) কে বলতে বলেন—তোমরা আমার অনুগত হও, তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।

গুণবাচক নামের আহ্বান

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হুজুর আকরম (সঃ) এর সম্মান ও মর্যাদা এরকম ছিলো যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে কখনও 'ইয়া মোহাম্মদ' বলে আহ্বান বা সম্বোধন করেন নি। বরং সম্বোধন ও আহবান করার প্রয়োজন যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানে তিনি তাঁর হাবীব (সঃ) কে নবুওয়াত বা রেসালতের গুণবাচক শব্দের মাধ্যমে আহ্বান করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা আহ্বান

করেছেন ইয়াআইয়্যুহান্নাবিয়্যু বা ইয়াআইয়্যুহার রসূলু এরূপ বলে। তিনি ব্যতীত অন্যান্য নবীগণকে কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সরাসরি নাম ধরে আহ্বান করেছেন। যেমন বলেছেন ইয়া আদামু, ইয়া নূহ্, ইয়া মূসা, ইয়া ঈসা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে ডাক দিয়েছেন ইয়াআইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল এবং ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্ছির বলে। এ ধরনের প্রেমাপ্লুত শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা যওক ও মহব্বতের নিদর্শন।

আবু নঈম হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আদম (আঃ) কে যখন ভারতবর্ষের মাটিতে অবতরণ করানো হলো, তখন তিনি খুব বিচলিত বোধ করলেন। এমতাবস্থা দেখে হজরত জিব্রাইল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং আযান দিতে শুরু করলেন। আযানের মধ্যে তিনি আল্লাহু আকবার আল্লাহুআকবার দু'বার বললেন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দু'বার বললেন। আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্ দু'বার বললেন।-আলহাদীছ।

নবীকরীম (সঃ) এর ইসমে শরীফ আরশের উপর, প্রতিটি আকাশের উপর, জান্নাতের প্রত্যেকটি জায়গায়, এমনকি হুরগণের কাঁধে কাঁধে পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। জান্নাতে এমন কোনো বৃক্ষ নেই যার পাতায় পাতায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' লিপিবদ্ধ নেই।

বায্যার (রঃ) হজরত ইবন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে যখন আকাশে নিয়ে আসা হলো, তখন প্রত্যেক আকাশে আমার নাম লিপিবদ্ধ দেখলাম। সর্বত্রই লেখা রয়েছে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আপন মহিমান্বিত নাম থেকে হুজুর আকরম (সঃ) এর 'মোহাম্মদ' নাম খানা নিঃসৃত করেছেন। যেমন কবি হজরত হাসসান ইবন ছাবিত (রাঃ) এর পংক্তি—আরশের অধিপতি যিনি তাঁর নাম মাহমুদ আর তাঁর হাবীব (সঃ) এর নাম মোহাম্মদ। আল্লাহ্তায়ালার যতো আসমাউল হুসনা আছে তাঁর মধ্যে সত্তুরখানা নাম নিয়ে হুজর আকরম (সঃ) এর নামকরণ করেছেন। আসমায়ে শরীফা অধ্যায়ে তার বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

হুজুর আকরম (সঃ) এর শানে আল্লাহ্তায়ালার কসম করা প্রসঙ্গে

হুজুর আকরম (সঃ) এর মহিমান্বিত মর্যাদার মধ্যে এটিও অন্যতম যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বন্ধুর মর্যাদা, শান ও মহত্বের স্মরণে কসম করেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'আপনার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই এরা আপন আপন নেশায় মত্ত।' এই আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তাফসীরকারকদের মত

এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াত দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) এর জীবদ্দশার শপথ করেছেন। এই কসমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বন্ধুর প্রতি সীমাহীন সম্মান ও চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহ ও বুজুর্গী প্রকাশ করেছেন। ব্যাপারটি এরকম, যেমন কোনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কসম দিয়ে বলে থাকে তোমার মাথার কসম, তোমার জিন্দেগীর কসম ইত্যাদি।

সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হুজুর আকরম (সঃ) এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান কাউকে সৃষ্টি করেননি। তিনি হলেন তাঁর নিকট সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বন্ধুর পবিত্র হায়াতের কসম দিয়েছেন। অন্য কারো নামে আল্লাহ্‌পাক কসম প্রদান করেননি।

আবুল হাওয়ায, যিনি বুজুর্গতম তাবেয়ীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, হকতায়ালা সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ এর সত্তা ব্যতীত অন্য কারও শানে কসম করেছেন এমনটি ঘটেনি। কেননা, তাঁর সত্তা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।

আল্লামা কুরতুবী (রঃ) বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র হায়াতের শানে আল্লাহ্‌তায়ালার কসম প্রদান করাটা সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে। কাজেই তাঁর হায়াতের শানে আমাদের কসম করা কি জায়েয হতে পারে?

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর হায়াত মুবারকের কসম করে, তাহলে তা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এ ধরনের কসম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, হুজুর পাক (সঃ) এর সত্তা ইমানের শাহাদতের দু'টি রুকনের অন্যতম। (শাহাদতের দু'টি রুকন বা অংশ আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আর অপরটি হচ্ছে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্। আবার কেউ কেউ এরকম বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর মহিমান্বিত সত্তার কসম দেয়ার প্রচলন অতীতকাল থেকে চালু হয়ে এখনো চলমান। মদীনাবাসীরা সর্বদাই হুজুর আকরম (সঃ) এর কসম করতো। তাদের কসমের ধরন ছিলো এরকম—ঐ মহান সত্তার কসম যিনি এহেন রওজায়ে আনওয়ারে শায়িত আছেন। 'ঐ মহান সত্তার কসম যিনি এই জ্যোর্তিময় সমাধিতে আড়াল গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা তাঁরা হুজুর আকরম (সঃ) কে বুঝাতেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা এক জায়গায় তাঁর রবুবিয়াতকে হুজুর আকরম (সঃ) এর দিকে সম্পর্কিত করে কসম করেছেন। যেমন বলেছেন, আপনার রবের কসম।

‘বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম’ এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মত ‘ইয়াসীন’ হুজুর আকরম (সঃ) এর মহিমান্বিত নাম সমূহের মধ্যে অন্যতম নাম। যেমন ‘তাহা’ ও একটি নাম।

সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ‘ইয়াসীন’ শব্দ দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সরদার। কারও কারও মতে ‘বনী তাই’ এর লুগাত অনুসারে ‘ইয়াসীন’ এর অর্থ হচ্ছে (হে ব্যক্তি বা হে মানুষ।) যাই হোক এদ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো কসম হিসাবে আর না হয় নেদা বা সম্বোধন হিসাবে। এটাও তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও বিরাট সম্মানের পরিচায়ক। ‘ইয়াসীন’ এর পরে ওয়ালকুরআনিল হাকীম আয়াতে কুরআনে কারীমের কসম করা হয়েছে। তাছাড়া হুজুর আকরম (সঃ) এর রেসালতের উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তাকে সুদৃঢ় করা হয়েছে এবং তাঁর হেদায়েতের উপর পূর্ণ স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তিনি নিঃসন্দেহে সরল সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। এপথে কোনো বক্রতা এবং আবিলতা নেই। এ পথ সত্য। স্খলনমুক্ত।

শহরে হারামের কসম

উলামায়ে কেরাম বলেন, নবীকরীম (সঃ) ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালা অন্য কোনো নবী সম্পর্কে আসমানী কিতাবে শপথবাণী উচ্চারণ করেননি। পবিত্র কুরআনে আছে ‘কাফেররা যে রকম ধারণা করেছে ও রকম নয়, আমি কসম করছি এ শহরের, আর আপনি এ শহরের বৈধ নাগরিক।’ এই আয়াতে রসূলে কারীম (সঃ) এর সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হকতায়ালা এমন এক শহরের কসম করে বলছেন, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে শহরে হারাম বা শহরে আমীন বলে। উক্ত শহর অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারার ভাগ্যে এহেন মর্যাদা ইতিপূর্বে ছিলোনা। নবীকরীম (সঃ) যখন এই শহরে তাশরীফ আনয়ন করলেন, তারপর থেকেই এ শহরের ভাগ্যে এই পবিত্র নাম সংযোজিত হলো। সাথে সাথে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটও এই শহর সম্মানিত হয়ে গেলো। উল্লেখিত প্রেক্ষাপট থেকেই এই প্রবাদটির প্রসিদ্ধি—জায়গার মর্যাদা সূচিত হয় তার অধিবাসীর মাধ্যমে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ‘কসম জন্মদাতা ও তার সন্তানের’। এই আয়াতেও যে কসম করা হয়েছে তাতে হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা ওয়ালেদ (জন্ম দাতা) শব্দ দ্বারা যদি হজরত আদম

(আঃ) কে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে মা ওয়ালাদ (সন্তান) দ্বারা আদম (আঃ) এর বংশ নবীকরীম (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তিনি সাধারণভাবে আদম (আঃ) এর বংশেরই একজন। আর যদি ওয়ালেদ দ্বারা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে মা ওয়ালাদ দ্বারা তাঁর বংশধর হুজুর আকরম (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, এই সূরায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর কসম দু'বার ব্যক্ত করেছেন।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একদা আমি হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার উদ্দেশ্যে কুরবান হোক! আপনার শান, মর্যাদা আল্লাহ্তায়ালার নিকট এরকম যে, আল্লাহ্তায়ালা আপনার জিন্দেগীর কসম পর্যন্ত করেছেন। অথচ আর কোনো নবীর জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা কসম করেননি। হক্তায়ালার নিকট আপনার মর্যাদা এতদূর যে, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, আমি কসম করছি এই শহরের। অর্থাৎ এটি এমন শহর যার মৃত্তিকা আপনার পদস্পর্শে ধন্য, তাই তো এ শহরের কসম। 'এই শহরের কসম' একথার অর্থ এমন দাঁড়ায়— হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র পদযুগলে যে মাটি লেগেছে আল্লাহ্পাক সেই মাটির কসম করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে কথাটি আল্লাহ্পাকের শানে ব্যবহার করাটা কেমন বেমানান মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে তার সমাধান সহজেই করা সম্ভব। কেননা, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিটি ধূলিকণা যার হাকীকত হচ্ছে পাকপবিত্র হওয়া। আর আল্লাহ্তায়ালা সেই পবিত্র জিনিসের কসম করেছেন, যা পবিত্র কদমের সংস্পর্শ পেয়েছে। ব্যাপারটির সূক্ষ্মতা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর স্বীয় যাত ও সিফাত ব্যতীত অন্য যতো বস্তুর নামে কসম করেছেন, সেগুলির উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য বস্তু থেকে উক্ত বস্তুর আভিজাত্য ও মর্যাদাকে স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত করা। এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত বস্তু আল্লাহ্তায়ালার চাইতে শ্রেষ্ঠ যে কারণে আল্লাহ্তায়ালা তার কসম করেছেন। এসব ক্ষেত্রে বস্তুটির স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করাই কসমের উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ বস্তুর মহিমা ও সম্মান সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বস্তুর নামে কসম করেছেন। কখনও তিনি স্বীয় জাত ও সিফাতের কসম করেছেন। কখনও আবার কোনো কোনো সৃষ্টবস্তুর কসম করেছেন, যেগুলি আল্লাহ্তায়ালারই জাত ও সিফাতের মহত্ব প্রকাশক। যেমন, আকাশ, পৃথিবী, দিন, রাত ইত্যাদি। এগুলি হচ্ছে আল্লাহ্পাকের মহান নিদর্শন ও তার অসীম কুদরতের প্রমাণ।

এছাড়া আল্লাহ্পাক তারকা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির শপথও করেছেন। এগুলি হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নূরের বিকাশস্থল। তাদের বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্য জগতকে উজ্জ্বল করা এবং মানবীয় বংশধারার কল্যাণকে সুদৃঢ় করা ও প্রকৃত পথ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অবলম্বন ও কারণ। তাছাড়া আকাশ জগতে শয়তানকে বিতাড়িত করারও মাধ্যম—আবার কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্তায়ালা এমনকিছুর কসম করেছেন, যে সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাচেতনা বিমূঢ়। এজাতীয় বস্তুর কসমও আল্লাহ্তায়ালা পেশ করেছেন—যেমন তীন, যায়তুন। কে জানে, আল্লাহ্তায়ালা এ সমস্ত বস্তুর শপথের মধ্যে কি বিশাল রহস্য রেখে দিয়েছেন? তবে এটা নিশ্চিত যে, এ সমস্ত শপথের মাধ্যমে শপথকৃত বস্তুর স্বতন্ত্র মর্যাদা চিহ্নিত করাই উদ্দেশ্য। মানুষের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ মহানবী (সঃ) এর শানে যে শপথ বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে এরকমই মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

সময়ের কসম

আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেন, 'কালের কসম, মানুষ নিঃসন্দেহে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' (সূরা আছর)। 'আছর' শব্দটির তফসীর সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের ভিতর মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন আছরের অর্থ যমানা বা কাল। তবে সাররাহ্ নামক কিতাবে বলা হয়েছে দিবারাত্রির আবর্তন বিবর্তনের নাম হচ্ছে আছর। আর এরকম আবর্তন বিবর্তনকেই এককথায় দাহর বা যুগ বলা হয়। সূক্ষ্ম ও আশ্চর্যজনক ঘটনাকেও আবার দাহর বলা হয়, যার বর্ণনা প্রদান ও সংখ্যা নিরূপণ করতে রসনা অক্ষম। আল্লাহ্পাক বলেন, 'যমানাকে গালি দিওনা। কেননা যমানা আমি।' এই হাদীছে কুদসীর আলোকে সূচিত হয় যে যমানা বা কালেরও মর্যাদা আছে। সময় ও প্রকৃতিতে রয়েছে লাভ-লোকসান, সুস্থতা-অসুস্থতা, বিপদাপদ-শান্তি ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে—তাঁরা নয়।

আল্লাহ্তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে সময়ের কসম করেছেন। যেমন 'লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ' দ্বারা শহরের কসম করেছেন এবং 'লাভজনক' দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) এর জীবনের কসম করেছেন।

'আলিফ লাম মীম' এর ভাবার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে কয়েকটি মত আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—আলিফ এর অর্থ আল্লাহ্, লামের অর্থ জিব্রাইল (আঃ)

এবং মীমের অর্থ মোহাম্মদ (সঃ)। এমনিভাবে এর ভাবার্থ হচ্ছে قوت قلب محمد অর্থাৎ মোহাম্মদ (সঃ) এর কলবের শক্তি। والنجم اذا هوى এর তাবীলও এরকমই। 'নজম' এর অর্থ মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কলব। اذا هوى এর অর্থ انشراح صدر بالانوار অর্থাৎ নূরের মাধ্যমে সীনা সম্প্রসারিত হওয়া এবং আরেক অর্থ انقطاع عن غير الله অর্থাৎ গায়রুল্লাহ্ থেকে কলব বিচ্ছিন্ন হওয়া। আবার هوى 'হাওয়া' এর আরেক অর্থ উদিত হওয়া।

সূরা ওয়াল ফাজরিতে 'ওয়াল ফাজার' দ্বারা কসম করা হয়েছে প্রত্যুষের আলোকরশ্মির। এ তাবীল সম্পর্কে মুফাস্সিরে কেরাম বলেন, ফজরের অর্থ মোহাম্মদ (সঃ) যাঁর কাছ থেকে নূরের ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আল্লাহ্তায়ালার বাণী, 'আপনি কি জানেন? রাতের আগন্তুক কে? তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা।' এই আয়াতে রাতের অতিথি বা উজ্জ্বল তারকা দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে। রাত দ্বারা আরবের পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে। সে অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো হুজুর পাক (সঃ) আরবের আকাশে উদিত হলেন। 'কসম কলমের এবং সে যা লিখে তার কসম' এই আয়াত দ্বারা হকতায়ালা শানুহু শপথ করে বলছেন, হুজুর পাক (সঃ) তাঁর প্রভু থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের (ইসলাম/কুরআন) ব্যাপারে উদাসীন নন। এরপর আল্লাহ্ হুজুর পাক (সঃ) এর সীমাহীন পুরস্কারপ্রাপ্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন, '(নিশ্চয়ই আপনার জন্য রয়েছে সীমাহীন অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। 'নূন' আরবী বর্ণমালার একটি বর্ণ। যেমন বর্ণমালার মাঝে রয়েছে 'আলিফ লাম মীম' অথবা এও হতে পারে যে 'নূন' এটি সূরার নাম। অথবা আল্লাহ্তায়ালার নামও হতে পারে। হরফে মুকাত্তাআত এর তাবীল ও তাফসীরের ক্ষেত্রে এরূপ মত গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে নূন একটি মাছের নাম। আল্লাহ্তায়ালা সে মাছের কসম করেছেন। উক্ত মাছটির পৃষ্ঠদেশে রয়েছে দুনিয়া। সে মাছটির নাম হচ্ছে 'বাহমুত'।

সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'নূন' এর অর্থ দোয়াত। কেননা, দোয়াত কলম আর তাদের সাহায্যে যা লিখা হয় তার উপকারিতা অপরিসীম। এসম্পর্কে আরেক মত এরকমও আছে যে, নূন অর্থ নূরের একটি ফলক। যে ফলকে ফেরেশতাবৃন্দ আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় হুকুম লিপিবদ্ধ করে রাখে। হাদীছ শরীফে এসেছে,

কলম হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্তায়ালা কলম সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাধ্যমে মাখলুকাতের তকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।

যে কলমের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার দেয়া শরীয়ত ও ওহী লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নমুনা হচ্ছে এজগতের সৃষ্ট কলম। এ কলমের মাধ্যমে দ্বীন ও মিল্লাতকে সীমাবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এর সাহায্যেই এলেম সমূহকে হস্তগত ও আয়ত্ব করা হয়ে থাকে। অতীতের ইতিহাস এবং বক্তব্য কলমের সাহায্যেই গ্রন্থবদ্ধ করা হয়ে থাকে। অবতারিত কিতাব সমূহ ও সহীফা সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। কলমের সৃষ্টি না হলে দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়াদি স্থিতিশীলতা লাভ করতোনা।

তফসীরে কাশ্শাফ এর গ্রন্থকার সূরা ইকরা এর আয়াত আল্লামা বিল কালাম এর তফসীর সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যদি তাঁর সূক্ষ্ম হেকমত ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিকৌশলের দলীল হিসাবে কলম ও লেখা এর বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনোকিছুর বর্ণনা নাও দিতেন তবুও যথেষ্ট হতো। কলমের বিশেষত্ব ও মর্যাদার কারণ এটাই যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও রসূল কারীম (সঃ) এর প্রশস্তি, কিতাবুল্লাহ্র তফসীর ও হাদীছে নব্বী (সঃ) এর ব্যাখ্যা, আওলিয়ায়ে কেরাম (রঃ) এর অমূল্য বাণী এবং নসীহতসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া কোনো বিষয়ে অর্থাৎ দ্বীন বহির্ভূত কোনো লেখার কাজে যদি কলম ব্যবহৃত হয় তাতে তার কোনো সার্থকতা নেই। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ ধ্বংস ও আক্ষেপ তাদের জন্য যারা স্বহস্তে কিতাব লিখে বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করে থাকে। তারা স্বহস্তে যা লিখে ও অর্জন করে, তার জন্য ধ্বংস ও অনুশোচনা। এগুলি লিখে তারা বলে, এসব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, অথচ তা আদৌ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

মক্কার কাফের সম্প্রদায় চূড়ান্ত মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও অহংকারের কারণে হুজুর আকরম (সঃ) কে পাগল বলে মন্তব্য করতো। অথচ প্রকৃত অবস্থা ছিলো এই যে, মক্কার সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা হুজুর আকরম (সঃ) এর মুকাবেলা করতে অক্ষম ছিলো। হাবীবে খোদা (সঃ) তো আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু শিখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন— সমস্ত জ্ঞানীদের পক্ষেও যা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিলো না। তিনি এমন কিতাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সমস্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা যার মোকাবেলা করতে অক্ষম। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে যে সমস্ত

পুরস্কার দান করেছিলেন তার মধ্যে সর্ববৃহৎ পুরস্কারটির প্রশংসা করে বলছেন, নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন। —আর হুজুর পাক (সঃ) এর মহান চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর নবুওয়াতের সর্ববৃহৎ নিদর্শন। সাইয়্যেদা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 'খুলুকুন' আযীম এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর চরিত্র হচ্ছে পবিত্র কুরআন।

আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক সম্মান প্রদর্শন, পবিত্রতা বর্ণনা ও নেয়ামত দানের অঙ্গীকার।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার দেয়া সর্ববৃহৎ মর্যাদা ও সম্মান হচ্ছে তাঁর তাযীম, তাকরীম— তাঁর পবিত্রতার বর্ণনা। এগুলি তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত ও রহমতের নিদর্শন। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে আরও অধিক সীমাহীন নেয়ামত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সূরা ওয়াদ্দুহায় আল্লাহ্তায়ালা দিন ও রাত্রির কসম করেছেন। আর এ দিন রাত্রি আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের নিদর্শনের প্রকাশস্থল। এই সূরায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে তাঁর দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছেন। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, হে হাবীব! আপনাকে আপনার প্রভু পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনাকে দুশমনও মনে করেন না।

মুফাস্সেরীনে কেরাম 'দোহা' ও 'লাইল' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, 'দোহা' মানে হচ্ছে হুজুর আকরম (সঃ) এর সুরভিত কুন্তলরাজি। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এই সূরার শানে নযুল সম্পর্কে বলেন, একদা কিছুকাল পর্যন্ত হুজুর পাক (সঃ) এর উপর ওহী অবতরণ বন্ধ ছিলো। কোনো কারণ বা মুসলেহাতের পরিপ্রেক্ষিতেই বন্ধ ছিলো। এতে মুশরেকরা বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদকে তার প্রভু পরিত্যাগ করেছে—তাঁর প্রতি বৈরী হয়েছে। (মাআযাল্লাহ্)। আল্লাহ্তায়ালা তখন দোহা ও লাইলের শপথসহ ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন, না আপনার প্রভু আপনাকে বর্জন করেন নি—আপনার প্রতি বৈরীও হননি। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে ভবিষ্যতের সুসংবাদ শুনিয়ে বলেন, 'আপনার অতীত জীবন থেকে ভবিষত জীবন অধিকতর উত্তম হবে সন্দেহ নেই।' উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবে পাক (সঃ) এর জন্য যে মর্তবা, উচ্চ মর্যাদা এবং নেয়ামতসমূহ দুনিয়াতে দান করে যাচ্ছেন তার চেয়ে উন্নততর নেয়ামত আখেরাতে তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, যেমন

শাফাআতের অধিকার দেয়া, মাকামে মাহ্মুদ প্রদান করা ইত্যাদি। সেগুলিকে আখেরাতের জন্য নির্ধারণ করে রাখার কারণ হলো, দুনিয়া তার সংকীর্ণতার দরুন নেয়ামতগুলি গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে না। ঐ সমস্ত নেয়ামতের আরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে, 'আপনি যখন দৃষ্টিপাত করবেন, তখন দেখতে পাবেন সেখানে অসংখ্য নেয়ামতসমূহ আর বিশাল রাজত্ব।'

অথবা এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াতী জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থার তুলনায় তার শেষাবস্থা অবশ্যই ভালো হবে। যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ণ মর্তবা ও ফয়েজপ্রাপ্তির ক্রমোন্নতিতে ভরপুর। তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনেই আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে লাভ করেছেন দয়া-মহানুভবতা, দান ও ক্ষমা, বিভিন্ন মোজেজা ও সৌভাগ্যশীলতা। তারই যথাযথ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে উপরোক্ত আয়াতে কারীমায়। এমর্মে আল্লাহপাক আরও বলেন, 'অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে এতো বেশী দান করবেন যে, আপনি আনন্দিত হবেন।' মোটকথা, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর হাবীব (সঃ) কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, আমি আপনাকে এতবেশী দান করবো যে, আপনি খুশী না হয়ে পারবেন না।আমার সেই দান এমন হবে যে, তা সংখ্যা ও গণনার আওতায় আনা সম্ভব হবে না। 'আশশেফা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন আহলে বায়াত এরকম বর্ণনা করেছেন, হুজুর পাক (সঃ) কে সন্তুষ্ট করা সংক্রান্ত কুরআনে মজীদের আয়াত সমূহের মধ্যে উপরোক্ত আয়াত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অর্থবহ। সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন উম্মতও দোযখে অবস্থান করবে, ততক্ষণ হুজুর পাক (সঃ) সন্তুষ্ট হবেন না।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ্তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত গোনাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন।' —এই আয়াতখানাও সীমাহীন মাগফেরাতের আশা প্রদানকারী। তবে সকলের মতে এই আয়াত খানা গোনাহ্খাতা মাফ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর 'ওয়ালাসাউফা ইউতিকা রববুকা ফাতারদা' আয়াতখানা সম্মান লাভ ও উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তির আশা প্রদানকারী।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত বক্তব্য বিস্ময়কর। তিনি বলেন "যে সমস্ত মূর্খ লোকেরা হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালা হুজুর আকরম (সঃ) এর কোনো উম্মতকে দোযখে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। এটা শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত ধোঁকা বৈ

কিছু নয়। শয়তান এ ধরনের বক্তব্য প্রদানকারীদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা যে কাজে সন্তুষ্ট, হুজুর আকরম (সঃ)ও সে সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট। হকতায়ালা গোনাহ্গারদেরকে দোযখে দেবেন। আর এদিক দিয়ে রসূল (সঃ) আল্লাহ্তায়ালার এরকম কাজের উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন এবং এসম্পর্কে বলবেন যে, আমার কোনো উম্মতকে দোযখে দেয়া হোক বা দোযখে তার ঠিকানা বানানো হোক, এতে আমি সন্তুষ্ট নই। এটাতো হতেই পারে না। বরং আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করবেন। কাজেই আল্লাহ্তায়ালা যাদের ব্যাপারে চাইবেন হুজুর (সঃ) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।" (এপর্যন্ত হচ্ছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার ভাষ্য)।

এটা অতি স্পষ্ট কথা যে, শাফাআত সংক্রান্ত হাদীছসমূহে এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) বিভিন্ন প্রকারের গোনাহ্গার, যেমন, চোর, যেনাকারী, শরাব পানকারী ইত্যাদি লোকদের জন্য শাফাআত করবেন। এরপরও এমন কিছু গোনাহ্গার দোযখে থেকে যাবে, যাদের অন্তঃকরণে সরিষা পরিমাণ ইমান ব্যতীত নেকী বলতে কিছুই নেই। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, এরাও আমার বান্দা।আমি এদের জন্য আমার নিজের পক্ষ থেকে নিজের কাছেই শাফাআত করলাম। অতঃপর তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং দোযখ থেকে নিষ্ক্রান্ত করা হবে। এসবই হুজুর পাক (সঃ) এর মহা-শাফাআতের নিদর্শন।

এটা সুস্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ্তায়ালার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কোনো শাফাআতই কিয়ামতের ময়দানে হবেনা। তবে আল্লাহ্তায়ালা যে তাঁর হাবীব (সঃ) কে সন্তুষ্ট করবেন বলে কথা দিয়েছেন, সে পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি থাকবে হুজুর (সঃ) এর শাফাআতে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবের উদ্ধৃতিটি হুজুর পাক (সঃ) এর উম্মতের চিরকালের জন্য দোযখে অবস্থান সম্পর্কিত। অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে হুজুর (সঃ) সন্তুষ্ট থাকবেন না। আর এটাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কোনো গোনাহ্গারই চিরকাল দোযখ ভোগ করবেনা। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থকারের বক্তব্যের দুটি দিক হতে পারে। প্রথমটি হুজুর (সঃ) এর কোনো উম্মত দোযখে প্রবেশ করুক এতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। আর অপরটি হচ্ছে, তাঁর কোনো উম্মত দোযখে স্থায়ী অবস্থান করুক এতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। দ্বিতীয়টিকে বুঝানোই তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এরপর সূরা ওয়াদ্দুহায় ঐ সমস্ত নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা হুজুর পাক (সঃ) এর প্রাথমিক অবস্থার অনুকূলে প্রদান করা হয়েছিলো। এবর্ণনা

দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তীতেও ঠিক ঐ পূর্বের মতো আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতসমূহ প্রদান করা হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তায়ালা অতীতেও অনেক অনুগ্রহ করেছেন। বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও ঠিক তদ্রূপ অনুগ্রহ করবেন। মর্মার্থ এই যে, সকলের দয়া ও সহযোগিতার হস্ত সংকুচিত হয়ে গেলে এতীম ও নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পরও তিনি আল্লাহ্তায়ালার করুণা ও স্নেহমমতার ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

রসূলে পাক (সঃ) এর এতীম হওয়া সম্পর্কে কেউ কেউ অবশ্য এরকম বলেন যে, এতীম হওয়া মানে একক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া, অনন্যোদাহরণ হওয়া। মক্কার মূর্খরা মূর্খতার কর্দমে এবং গোমরাহীর গহ্বরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে তাদের ভিতর থেকে বের করে এনে এলেম ও হেদায়েতের মাকামের পরিমন্ডলে প্রবিষ্ট করিয়ে নিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নূরানী কলবকে কেনাআত ও অমুখাপেক্ষীতার মহান দৌলতে পরিপূর্ণ করে দেয়ার পর মাল ও গনীমতের দৌলতেও ধনী করে দিয়েছেন। প্রেমময় প্রভু প্রতিপালক তাঁকে বাল্যবয়সে নিঃস্ব, এতীম এবং বঞ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন। নবুওয়াত ও রেসালত দান করার পরও কি তিনি তাঁকে আগের অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন? আল্লাহ্র বাণী 'তুমি তোমার প্রভুর নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বলো।' তাই নেয়ামত প্রকাশ করা এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করাও নেয়ামতের শুকরিয়ার শামিল। শরীয়ত ও তার আহ্কাম জানা ও তা মানুষকে শিক্ষা দেয়া, তার আলোকে হেদায়েত করা—এ সমস্ত কাজও নেয়ামত প্রকাশক।

সূরা ওয়ান্নজম

হুজুর আকরম (সঃ) এর মর্যাদা, আভিজাত্য ও তার নিদর্শন সম্পর্কে সূরা ওয়ান্নজমে এতো অধিক বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে—যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তন্মধ্যে কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর শানের গুরুত্ব প্রদানার্থে 'নজম' এর কসম করেছেন। 'নজম' শব্দের অর্থ তারকারাজির সঞ্চরণশীলতা অথবা 'সুরাইয়া' নামক নক্ষত্র। অধিকাংশ মুফাস্সীরগণ 'নজম' বলতে উদ্ভিদ বুঝিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা 'নাজমান নাজমান' (অল্প অল্প করে নাযিল হওয়া) হিসাবে কুরআনে পাকেরই নাম। অথবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মেরাজরাত্রিতে আকাশ থেকে নিম্নজগতে অবতরণ করেছিলেন—তার

নাম নজম। অথবা মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কলব যা নূরের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছিলো এবং গায়রুল্লাহ্ থেকে তাঁর কলব সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলো, তার নাম নজম। যার ফলে তিনি কুদুসী (পবিত্র) আসমান থেকে উম্মা (আকর্ষণীয়) যমীনে অবতরণ করলেন এবং হেদায়েতের নীতিমালা বর্ণনা করলেন। যে কারণে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে প্রবৃত্তির অপ-আকাংখা থেকে পবিত্র করে দিলেন এবং হক ও সত্যবাদিতায় সুসজ্জিত করে দিলেন। এই আয়াতে কারীমা তার সাক্ষ্য বহন করছে। কলব থেকেই এরাদার উৎপত্তি। আর কলবই হচ্ছে সত্যবাদিতা ও হেদায়েতের মূল মহল। কাজেই কলবের কসম দেয়া হয়েছে। এটাই সবচেয়ে সমীচীন। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, মোহাম্মদ (সঃ) নিজের প্রবৃত্তি প্রসূত কোনো কথা বলেন না। তিনি তা-ই বলেন, যা তাঁর কাছে ওহী করা হয়।' এই ওহীর অর্থ হবে কুরআন। আর ওহী দ্বারা হাদীছ যাকে ওহীয়ে খফী বলা হয়, যদি তাকে বুঝানো হয়, তাহলে তিনটি বিষয়কে উক্ত কালামের উদ্দেশ্য থেকে বাদ দিতে হবে। (১) বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে রসূল (সঃ)এর নির্দেশ। (২) মারিয়ায়ে কিবতিয়া ও মধু পান ঘটনা। (৩) খেজুর বৃক্ষের তাবীর করার ঘটনা। এ তিনটি ঘটনা থেকে এই আয়াত বিচ্ছিন্নযোগ্য। কেননা, এ তিনটি ব্যাপার সম্পর্কে প্রকৃত করণীয় কি, সে সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো রসূল (সঃ) কে। আবার এর অর্থ এ-ও হতে পারে, আল্লাহ্তায়ালা বলছেন, আমার বন্ধু যা বলেন এগুলি তাঁর কথা নয়। এগুলি ওহী। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বলা হয়েছে, আয়াতের মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা কুরআনকে বুঝানোর চেয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিকে বুঝানো অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিই ওহী। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আপনার উপর কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছি। কিতাবের অর্থ কুরআন মজীদ আর হেকমতের অর্থ সুন্নতে রসূল (সঃ)। ইমাম আউযায়ী হজরত হাস্সান ইবন আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হজরত জিব্রাইল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে সুন্নাহ্ নিয়ে এমনভাবে আগমন করতেন যেমন আগমন করতেন কুরআন নিয়ে। এবং সুন্নাতসমূহ্ নিয়ে এসে তিনি হুজুর পাক (সঃ) কে তার তালীম প্রদান করতেন। কাজেই এই বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে 'ইয়ানতিকু' দ্বারা শুধু কুরআন বুঝায় না, হাদীছও বুঝায়। এবং হুজুর পাক (সঃ) এর এজতেহাদও ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূরা ওয়ান্‌নজম এ উক্ত আয়াতে কারীমার পর আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর মেরাজের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সে

বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুজুর পাক (সঃ) সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছলেন। এই মাকামটি মাখলুকের জ্ঞানের শেষ সীমা। সে মাকাম অতিক্রম করে তিনি পরওয়াদিগারের দীদারে চলে গেলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর দৃষ্টিশক্তিকে এরকম সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করে দিলেন যে, তাঁর নয়নযুগলে কোনোরূপ বিচ্যুতি আসেনি এবং সীমা লঙ্ঘন করেনি। উক্ত সফরে হুজুর আকরম (সঃ) যা কিছু দর্শন করলেন, জাবারুত ও লাহুত জগতের, মাকামসমূহ তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হলো, আলমে মালাকুতের যে সমস্ত অভূতপূর্ব দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলেন, সেগুলির বর্ণনা কোনো শব্দের সীমানায় আনা সম্ভব নয়। জ্ঞান ও বুঝের এতটুকু শক্তি নেই যে, সে সম্পর্কে সামান্যতম বর্ণনাও শ্রবণ করে তা বরদাশত করতে পারে। কাজেই এহেন বিস্ময়কর ও সঙ্গীন পরিস্থিতির বর্ণনা আল্লাহ্তায়ালা শুধু ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেই প্রদান করেছেন, যা হুজুর পাক (সঃ) এর মাহাত্ম ও সম্মানের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসূল (সঃ) এর কাছে ওহী প্রদান করলেন, যা প্রদান করার ছিলো।

আহলে এলেম হজরতগণ বলেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব (সঃ) এর সাথে তিন প্রকারের কালাম করেছেন। এক প্রকার কালাম আরবী ভাষায় প্রচলিত কুরআন ও হাদীছে বিবৃত রয়েছে। এর প্রকাশ্য অর্থ মাখলুকের বোধগম্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রকার কালাম যা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে কারীমের হরফে মুকাত্তাআত। যাকে বুঝা ও তাহকীক বা বিশ্লেষণ করা কারও ক্ষমতা ও যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। তৃতীয় প্রকার কালাম যা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। তার ভেদ বা রহস্য উদঘাটন করতে কোনোরকম ধারণা বা খেয়াল করাও সম্ভবপর নয়। সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে— ফাআউহা ইলা আবদিহি মা আউহা।

কালাম প্রসঙ্গের পর এখন বাকী রইল রুইয়াত বা দর্শন প্রসঙ্গ। রুইয়াতে বারীতায়ালার স্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে এই আয়াতে, (নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখেছেন আর একবার)। এই আয়াতের তারাহু শব্দটিতে যে হু সর্বনাম রয়েছে এই 'হু' দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ হুজুর (সঃ) তাঁকে মানে জিব্রাইল (আঃ) কে দেখেছেন, নাকি তাঁকে মানে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন। তার পরও মতানৈক্য রয়েছে—সে দর্শন অন্তরের ছিলো? না চোখের। এ সমস্ত মতানৈক্যের পর সুসাব্যস্ত মত এই যে, হুজুর পাক (সঃ) এর চর্মচোখেই

দীদারে বারীতায়ালা সংঘটিত হয়েছিলো—এতে সন্দেহ নেই। হজরত কাআবে আহবার বর্ণনা করেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দীদার ও কালামকে হজরত সাইয়্যেদুল কাউনাইন (সঃ) এবং হজরত মুসা (আঃ) এর মধ্যে বন্টন করেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে দুবার কালাম করেছিলেন এবং হুজুর আকরম (সঃ) কে দু'বার দীদার দান করেছিলেন। হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) ও অধিকাংশ সাহাবীগণের মত এটাই। তবে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এ মাসআলাটির ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মোটকথা, সূরা ওয়ান্নজম এর মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর মর্যাদা ও পূর্ণতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যা তিনি ব্যতীত অন্য কোনো নবীর ভাগ্যে ঘটেনি। সূরা ইযাশ্শামছু কুব্বিরাত এর আয়াতের মাধ্যমেও তার সীমাহীন মর্যাদাকে তুলে ধরা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরগণ এই আয়াত দ্বারা যে হুজুর পাক (সঃ) এর মুবারক সত্তাকে বুঝানো হয়েছে বলে মত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর মধ্যে আয়াতে উল্লেখিত যাবতীয় গুণাবলী, সমস্ত মর্যাদা ও কামালাতের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো, যেমন বলা হয়েছে সূরা আলহাক্কাহ্ এর এই আয়াতে– انه لقول رسول كريم এই আয়াত দ্বারাও হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যক্তি সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

সূরা তাহা ও ইয়াসীন

আল্লাহ্তায়ালা হুজুর আকরম (সঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, ইয়াসীন–হে আমার হাবীব, আমি আপনার উপর কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে আপনি তার কারণে দুরাবস্থায় পড়ে যাবেন।

সূরা তাহা নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন নাযিল হওয়ার পর সূরা তাহা নাযিল হয়। সূরা ইয়াসীনে বলা হলো— ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ, নিশ্চয়ই আপনি রসূলগণের অন্তর্গত। এরপর সূরা তাহা নাযিল করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুত, আপনার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, আপনি কোনোরকম দুঃখ কষ্টে নিপতিত হন, আল্লাহ্পাক সে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেন নি। 'তাহা' হুজুর পাক (সঃ) এর নাম সমূহের মধ্যেও অন্যতম নাম। আবার এ 'তাহা' শব্দ দ্বারা ইনসান বা পুরুষ—এরূপ অর্থও করা হয়ে থাকে। যেমন 'ইয়াসীন' দ্বারা ইয়া সাইয়্যেদ অর্থ করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে 'তাহা' দ্বারা ইয়া তাহের, ইয়া হাদী অর্থ লওয়া হয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ এ শব্দটির ব্যাখ্যা এরকমও করে থাকেন যে, আবজাদী সংখ্যা অনুসারে ط বর্ণ দ্বারা নয়টি সংখ্যা আর ه বর্ণ দ্বারা পাঁচটি সংখ্যা, সর্বমোট চৌদ্দটি সংখ্যা বুঝাবে, এবং এ চৌদ্দ সংখ্যার মানে হচ্ছে চৌদ্দতম তারিখের রাতের চাঁদ অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। তবে মুফাসসেরীনে কেরাম এ ধরনের তফসীর ও তাবীলকে বেদআত মনে করেন। তারা 'তাহা' কে আল্লাহ্তায়ালার নাম হিসেবে গণ্য করে থাকেন। সে যাই হোক উভয় সূরার মধ্যেই হুজুর পাক (সঃ) এর প্রশংসার বাণী উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যেমন কবির ভাষায় বলা হয়েছে— তুরাইযযুলাউলাকা তুমকি বাসাস্ত, ছানায়েতু তাহা ওয়া ইয়াসীঁ বাসাস্ত।

সূরা ইয়াসীনে নবীকরীম (সঃ) এর সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর সূরা 'তাহা' এর মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা সহযোগে নবীকরীম (সঃ) কে ইজ্জত সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। হুজুর আকরম (সঃ) ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদ আদায় ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে যখন কঠিন কষ্ট করতে লাগলেন; যার ফলে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেতো এবং সেজন্য কখনও কখনও এক পায়ে দাঁড়িয়ে কিয়ামে লাইল যাপন করতেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা নাযিল করলেন, 'তাহা' আপনি দুঃখকষ্টে নিপাতিত হবেন এজন্যতো আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করিনি।

'তাহা' শব্দটি যদি হুজুর পাক (সঃ) এর নাম হয় তাহলে নেদা বা আহ্বান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'তাহা' হবে মুনাদা (আহ্বানকৃত) আর তার পূর্বে হরফে নেদা (আহবানকারী অব্যয়) ধরতে হবে। আর যদি 'তাহা' আল্লাহ্তায়ালার নাম হয়, তবে কসম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে হবে। 'তাহা' শব্দটি হুজুর আকরম (সঃ) এর নাম ধরা হলেও কসম হিসাবে ব্যবহার করা বৈধ হবে। পরপর দুখানা আয়াতে কারীমায় এ এলতেফাত (কথায় মোড় পরিবর্তন) দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা, প্রথম আয়াতে আলাইকা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার তার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'কিন্তু কুরআন হচ্ছে নসীহত ঐ ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে'। এখানে 'লিমান' 'ঐ ব্যক্তি' বলে নাম পুরুষের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এধরনের এলতেফাতের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুজুর আকরম (সঃ) যখন রাত জেগে ইবাদত করতেন, তখন রশি দিয়ে সীনা মুবারক বেঁধে নিতেন। যাতে নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। এমনিভাবে সমস্ত রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী

করতেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার এটাকে কিয়াম বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন। ওয়াল্লাহুআ'লাম।

কেউ কেউ আবার এরকম বলেন যে, এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ এই যে, হুজুর পাক (সঃ) যেনো নিজেকে কষ্টে নিপতিত না করেন, কাফেরদের কুফুরী ও অস্বীকৃতির কারণে মর্মাহত ও দুঃখিত হয়ে যেনো তিনি নিজেকে তকলীফের মধ্যে ফেলে না দেন। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তো কুরআন মজীদ তাঁর হাবীব (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি এর মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করবেন। তাদের কাছে কুরআনের প্রচার করবেন। যারা ইমান আনবে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই আনবে, আর যারা কুফুরীর উপর হঠকারীতা করবে, তা তারা নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই করবে। হুজুর আকরম (সঃ) এর কর্তব্য তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। এর বেশী নয়। এ ধরনের মেহেরবানী ও স্নেহশীলতার বাণী অন্য জায়গায় উচ্চারণ করা হয়েছে যেমন, 'সম্ভবত আপনি আপনার জীবনকে হালাক করে ফেলবেন তাদের কার্যকলাপ দেখে আক্ষেপ করে করে।'-'তারা যদি এ কথা (কুরআন) এর উপর ইমান না আনে' আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর দুশ্চিন্তা দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, হে আমার হাবীব; এরা যদি ইমান না আনে তাহলে কি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের জন্য আপনার জীবনকে ধ্বংস করে ফেলবেন? আলহাদীছ এর অর্থ কুরআন মজীদ। আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ ফরমান, 'নিশ্চয়ই আমি জানি যে তাদের কথায় আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায়। এরা আপনার উপর এবং আল্লাহ্তায়ালার উপর অপবাদ রটায়। আপনাকে যাদুকর বলে, পাগল বলে, আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে শরীক নির্ধারণ করে এবং কুরআনের উপর কটুক্তি করে। কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কেননা কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। আপনি প্রফুল্লচিত্ত থাকুন। পরিশেষে আপনার জন্যই সাহায্য আসবে। আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কুরআন নাযিল করিনি যে, সর্বদাই আপনি এর কারণে চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন। যেমন অতীতের সমস্ত আম্বিয়া কেরাম ছিলেন। শরহে ছুদর (বক্ষ সম্প্রসারণ) করা সত্ত্বেও দরকে ছুদর (বক্ষ সংকোচন) সম্ভবত আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্ন করেন, আপনি এরূপ ব্যাকুল হবেন কেনো? আমি কি আপনার বক্ষকে সম্প্রসারিত করে দেইনি?

এক্ষেত্রে এরকমও হতে পারে যে, উপরোক্ত পরিস্থিতি হয়তো হুজুর পাক (সঃ) এর শরহে ছুদর হাসিল হওয়ার পূর্বে হয়েছিলো।

কোনো কোনো হৃদয়বান রসিকজন এরকম বলে থাকেন যে, হুজুর আকরম (সঃ) ইবাদত বন্দেগী ও শরীয়তের কার্যাবলী আদায় করার ক্ষেত্রে সীমাহীন ভালোবাসা ও আত্মিক আগ্রহের কারণে যে কঠোরতা ও কৃচ্ছতা অবলম্বন করতেন তার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে, প্রেমাস্পদ সাধারণত শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে, আর প্রেমিক বেচারা সর্বদাই হয়ে থাকে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন। প্রেমাস্পদ যদি আপন প্রেমিককে বগলের নীচে ফেলে চেপে ধরে তাহলে এক্ষেত্রে এহেন দুর্বল প্রেমিক বেচারার গতিইবা কি থাকতে পারে? সে তো এক বিশেষ ধরনের কষ্ট অনুভব করবেই। কিন্তু তার সাথে সাথে এক চরম ও পরম সুখানুভূতিও তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। এরকম কষ্টের ভিতর কিরকম পুলকানুভূতি রয়েছে তার অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞজনেরই জানা থাকা সম্ভব।

নবীকরীম (সঃ) এর উপর দরুদ ও সালাম

আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে নবীকরীম (সঃ) এর প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, ফযীলত ও বারকাতের বহিঃপ্রকাশ এবং সুমহান মর্তবা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ নবী (সঃ) এর উপর দরুদ প্রেরণ করেন। হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো।

হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য করো এবং ফেরেশতাবৃন্দের অনুরূপ আচরণ করো, নবীকরীম (সঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করো। তোমাদের এবং ফেরেশতাবৃন্দের দরুদ পাঠ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে, তোমরা আপন পরওয়ারদেগারের নিকট এই দোয়া করো তিনি যেনো তাঁর হাবীব (সঃ) এর উপর দরুদ ও রহমত প্রেরণ করেন। এছাড়া তোমাদের সে শক্তি ও সামর্থ কোথায়—যে তোমরা তাঁর যথাযোগ্য দরুদ পাঠ করবে? আর তোমাদের এতো জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যাই বা কোথায় যে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে থাকবে? এবং সে মুতাবেক তাঁর শানে দরুদ পাঠ করবে? তবে হাঁ পরওয়ারদেগারে আলম তাঁর যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত আছেন। যেমন এই দরুদ শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা উর্ধ ও নিম্ন—উভয় জগতকে হুজুর পাক (সঃ) এর দোয়া ও ছানার সঙ্গে সমন্বিত করে তাঁর ফযীলত ও মর্যাদার ঘোষণা করে দিলেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের কাছে। পূর্ব পশ্চিম, জল, স্থল, সমুদ্র হিমাচল, আসমান যমীন, আরশ কুরসী সর্বত্রই তাঁর প্রশংসার বাণী বিস্তৃত করে

১২—

দিলেন। মুসলমানদের অন্তঃকরণে তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসা এমনভাবে গেঁথে দিলেন যে, তাঁর নাম স্মরণের মাধ্যমে তারা আপন আপন অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে। তাঁর নাম শুনলে মুসলমানদের হৃদয়ে এমন পুলকানুভূতির সৃষ্টি হয় যে, সে নাম স্মরণ করতে ভালো লাগে। তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। হকতায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, আমার হাবীবের আনুগত্যের কারণে আমি সমস্ত মওজুদাতকে এমনভাবে আমার রহমত দিয়ে প্লাবিত করে দেবো, তারা যেনো আরো বেশী তাঁর প্রশংসা ও আনুগত্য করতে পারে। এবং তাঁর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে পারে। ফরজ নামাজ সমূহের মধ্যে এমন কোনো ফরজ নেই যাকে হুজুর পাক (সঃ) সুন্নত বানাননি। কথাটির অর্থ এই যে, ফরজ আদায় করাটাও হুজুর পাক (সঃ) এর একটি সুন্নত পুরা করা। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, বান্দার জন্য যা ফরজ তা আমার হুকুমে ফরজ হয়েছে আর আমার বন্ধুর হুকুমে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা সুন্নত। প্রকৃতপক্ষে উভয়টির সঙ্গেই আমাদের দু'জনের অর্থাৎ আমি আল্লাহ্তায়ালা এবং আমার রসূল মোহাম্মদ (সঃ) এর হুকুম বিজড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফরজের মধ্যে আমার হুকুমের সঙ্গে আমার হাবীব (সঃ) এর হুকুম অন্তর্ভুত আছে। আল্লাহ্পাক আরও বলেন, আমার বন্ধুর অনুসরণ আমার। অনুসরণই আমি আমার বন্ধুর হাতে কৃত বায়আতকে আমার সাথে কৃত বায়আত হিসাবে সাব্যস্ত করেছি। আপনার নির্দেশের শব্দসমূহ আমি সংরক্ষণ করবো। মুফাসসিরগণ আমার কুরআনের তাফসীর করবেন আপনার মাধ্যমে। ওয়ায়েযগণ আপনার নসীহতের বাণীসমূহ মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেবে। শাহানশাহ্ সুলতান, ফকীর দরবেশ, মিসকীনগণ দূরদূরান্ত থেকে সফর করে আপনার দরবারে হাদিয়া পেশ করে সালাম প্রদান করবে। আপনার রওজায়ে আনওয়ারের পবিত্র মাটি মুখমন্ডলে লাগাবে এবং আপনার শাফাআতের আকাংখী হবে। আপনার মাহাত্ম ও আভিজাত্য সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। ওয়ালহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম হুজুর পাক (সঃ) এর এরশাদ (নামাজে আমার শান্তি রয়েছে) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এই হাদীছের মর্মার্থ হচ্ছে, হুজুর পাক (সঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করা। সালাত মানে দরুদ, অর্থাৎ দরুদ শরীফের মধ্যে হুজুর পাক (সঃ) এর চোখের প্রশান্তি রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ সকলেই তাঁর উপর দরুদ পাঠ করে। তবে সুসাব্যস্ত কথা এটাই যে, সালাতের অর্থ একানে হবে নামাজ। যেমন "হোসেন হুদা" ও "সীসাতে হুজুর পাক (সঃ)" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা ফাতহ্

আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি পরিপূর্ণ নেয়ামতরাজী, পূর্ণ কামালীয়াতময় বুযর্গী, কারামাত, বারকাত ও মর্যাদার বর্ণনা এসেছে সূরা ফাতহ্ এর বিবরণে। এখানে আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর প্রশংসায় যে ভূমিকা পেশ করছেন তা এইরূপ انا فتحنا لك فتحا مبينا - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويتم يعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি এজন্য যে, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিবিচ্যুতি সমূহ্ আল্লাহ্তায়ালা মাফ করে দিবেন এবং তাঁর নেয়ামতসম্ভার আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দিবেন। আর আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে প্রবল সাহায্য প্রদান করবেন। এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর যে সমস্ত আকৃতিগত ও আকৃতিবিহীন বিজয় ও ফয়েযসমূহ, যাহেরী ও বাতেনী কামালাত ও বারকাত বর্ষিত হয়েছে তা সীমাহীন, সংখ্যা ও গণনাবহির্ভূত। এ সমস্ত ফয়েয ও নেয়ামত লাভের একটি দিক হচ্ছে শহর বন্দর সমূহ্ জয় করা। আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করানো, গনীমত সমূহ্ অর্জন, দ্বীনের দৃঢ়তা অর্জন, উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইসলামের নির্দেশাদির প্রসার ও সর্বোপরি মক্কা মুআযযমা বিজয়। কেননা মক্কা বিজয়ের পরেই দেখা গেলো, আরবের বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জনপদের লোকেরা দলে দলে এসে আল্লাহ্র দ্বীনে দাখিল হতে লাগলো। এবং হুজুর আকরম (সঃ) এর দিকে সকলেই ধাবিত হতে লাগলো। এই সূরায় উক্ত প্রতিশ্রুতিবাণী নবীকরীম (সঃ)কে শুনানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী একথা বুঝানোর উদ্দেশ্য ফেলে মাযী বা অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এবং সন্দেহাতীত বিজয়কে বুঝানোর উদ্দেশ্যে ফাতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু এ বিজয় প্রকাশ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং ইসলামের শান শওকত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা ছিলো একটি নিশ্চিত বিজয়। তাই আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এর নাম দেয়া হয়েছে ফাতহে মুবীন। ফাতহে মুবীন এর আরেক অর্থ সম্মান ও মহিমা প্রকাশকারী ও দ্বীন ইসলামকে প্রবলকারী বিজয়।

আয়াতে কারীমা

لیغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر

এর তফসীর ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মত ও বক্তব্য রয়েছে। তম্মধ্যে একটি মত এইরূপ—হুজুর পাক এর ক্রটিবিচ্যুতি মাফ করার অর্থ তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে জাহেলী যমানার যা সংঘটিত হয়েছিলো। ইমাম সুবকী বলেন, একথাটি পরিত্যাজ্য। কেননা হুজুর পাক (সঃ) এর জাহেলী যুগে জাহেলী কাজকর্ম করা তো দূরের কথা জাহেলী হাওয়া পর্যন্ত তাঁর শরীর স্পর্শ করতে পারেনি। এটা সত্য যে, তিনি নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায়ই মাসুম (নিষ্পাপ) ছিলেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, মাতাকাদ্দামা থেকে মারিয়ায়ে কিবতিয়ার (রাঃ) এর ঘটনা এবং মাতায়াখ্‌খারা থেকে হজরত যায়েদ (রাঃ) এর স্ত্রীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করার ঘটনা বুঝতে হবে, যা আল্লাহ্‌পাক মাফ করে দিয়েছেন। ইমাম সুবকী বলেন, একথাটিও বাতিল। কেননা মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রাঃ) এর ঘটনা এবং যায়েদ (রাঃ)এর স্ত্রী সম্পর্কে মূলত কোনো গোনাহ্‌ই হয়নি। তাঁদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর পাক (সঃ) গোনাহ্‌ করেছিলেন বলে যারা আকীদা পোষণ করে, তারা অন্যায় করে থাকে। তফসীরে কাশ্‌শাফে যমখশরী ও তাবইয়্যত কিতাবে ইমাম বায়াযাভী বলেছেন, এর অর্থ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইমাম সুবকী (রঃ) বলেন, একথাটিও পরিত্যাজ্য। কেননা আম্বিয়া কেরামের ইসমত হওয়ার ব্যাপারটি সুসাব্যস্ত। তবে হাঁ, মিন যাম্বিকা থেকে উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, এমন সগীরা গোনাহ্‌ যা শান ও মর্তবাকে লাঘব করে না। এমতটি নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায় এমন কি, অনেক অমুতাযিলাও এ মতের সমর্থন করেছেন। আবার কারও কারও নিকট পছন্দনীয় মত এটাই যে, সগীরা গোনাহ্‌ও হুজুর পাক (সঃ) এর শানে নিষিদ্ধ। কেননা আম্বিয়া কেরামের কথা ও কাজের পায়রুবী করার জন্য আমাদেরকে হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তাঁদের মাধ্যমে এমন কাজ কেমন করে সংঘটিত হতে পারে যা অশালীন ও অসুন্দর?

হাশভীয়া সম্প্রদায় আম্বিয়া কেরাম সম্পর্কে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে থাকে। তারা কোনোরকম কয়েদ বা সীমাবদ্ধতা ব্যতীতই আম্বিয়া কেরাম থেকে গোনাহ্‌ সংঘটিত হওয়া বৈধ মনে করে থাকে। ঐ সমস্ত হাশভীয়াদের নিকট উহা যদিও বৈধ হয়ে থাকে, তবুও তা বিশুদ্ধতার যোগ্যতা রাখে না। কেননা উম্মতের এজমা রয়েছে এ মতের বিপরীতে। আম্বিয়া কেরামগণের জন্য সগীরা গোনাহ্‌ করা জায়েয বলে যারা মনে করে থাকে, তাদের নিকট কিন্তু কোনো পথও নেই, কোনো দলীলও নেই। বরং তারা এই আয়াতকে

বা এজাতীয় অন্য কোনো আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকে। আর বৈধতার ক্ষেত্রে এই আয়াতকেই যদি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার উপযুক্ত উত্তর তো অতি সুন্দরভাবেই দেয়া হয়েছে।

সগীরা গোনাহ্ যা রযীলা বা নিকৃষ্ট ধরনের নয়, এমন গোনাহ্ নবীগণের জন্য বৈধ কি না? এসম্পর্কে ইবন আতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেন, নিকৃষ্ট নয় এমন সগীরা গোনাহ্ হুজুর পাক (সঃ) থেকে সংঘটিত হয়েছিলো কি? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এখতেলাফও করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত এটাই দিয়েছেন যে, ঐ জাতীয় গোনাহ্ থেকে কিছুই সংঘটিত হয়নি। ইমাম সুবকী (রঃ) বলেন যে, হুজুর পাক (সঃ) এ জাতীয় কোনো গোনাহ্ করেননি, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল ইযযত বলেছেন ماينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى । কাজেই বাণী ও অবস্থার বিপরীত কোনো ধারণা বা সন্দেহ কেমন করে করা যেতে পারে?

এখন হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের এজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, সকলেই তাঁর অভ্যাস ও আচরণকে হুবহু অনুকরণ করতেন। হুজুর পাক (সঃ) থেকে যে কোনো কাজ প্রকাশ হতো চাই তা ছোট হোক বা বড়—অল্প হোক বা অধিক—সাহাবাগণ তার অনুকরণ করতেন। এমনকি হুজুর পাক (সঃ) নির্জন নিরিবিলিতে যা করতেন, সে সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম লালায়িত হয়ে থাকতেন এবং তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন। চাই হুজুর পাক (সঃ) সে ব্যাপারে অবহিত হতেন বা নাই হতেন। হুজুর পাক (সঃ) এর অনুকরণে সাহাবায়ে কেরাম যা করতেন, সে সমস্ত কাজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করলে চমৎকারভাবে হুজুর পাক (সঃ) এর আমল এর প্রকৃতি সম্পর্কে জানা সম্ভব। আর যখন কোনো ব্যক্তি হুজুর আকরম (সঃ) আহ্ওয়াল মুবারকা সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবহিত হয়ে যাবে এবং তার মুশাহাদা হাসিল হয়ে যাবে, তাখন সে ব্যক্তির পক্ষে হুজুর পাক (সঃ) সম্পর্কে উক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করা বা ধারণা করা আদৌ সম্ভব হবে না। এ ধরনের বাক্যপ্রয়োগ করতে বা সেরূপ কল্পনা করতেও সে লজ্জাবোধ করবে।

ইমাম সুবকী (রঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) কর্তৃক গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো আলোচনা যদি না হতো তা হলে আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাই করতাম না। উপরোক্ত আয়াতের তফসীর সম্পর্কে যমখশরী যে উক্তি করেছেন, আমি তাতে শুধু অসন্তুষ্টই নই, বরং তার জন্য

আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে ইনসাফ চাই। উপরোক্ত কথাগুলি যমখশরীর কথাকে খন্ডন করার জন্য ইমাম সুবকী (রঃ) বলেছেন। আর তা আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) আপন গ্রন্থসমূহে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি যমখশরীর প্রতিবাদে আরও কথা বলেছেন। উক্ত প্রতিবাদমূলক বক্তব্যের সংখ্যা এগারোটি, বরং তার চেয়েও অধিক হবে। আর এগুলিকে ইমাম সুবকী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন আয়াতে কারীমা ليغفرلك الله নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, তার পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করি, তখন একটি মাত্র কারণ ছাড়া আর কোনো কারণ আমি দেখতে পাইনা যে, আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীব (সঃ) এর শানে একথা কেনো বললেন? সে কারণটি হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর তাকরীম করেছেন। এছাড়া ওখানে কোনো গোনাহ্ বলে আমি কিছু কল্পনা করতে পারিনা। ইমাম সুবকী (রঃ) বলেন, আমি যখন উক্ত আয়াতের মর্মার্থ এইরূপ বুঝতে পারলাম, তখন ইবন আতিয়াকেও আমার এই মতের প্রবক্তা দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ তার হুকুম সহকারে হুজুর পাক (সঃ) এর শরাফত বুযুর্গী প্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখনে গোনাহ্ বলতে কিছু কল্পনাই করা যায় না। ইবন আতিয়া (রঃ) যে এইরূপ যথার্থ মন্তব্য করতে পেরেছেন, তা কেবল আল্লাহ্তায়ালার তৌফিকেই সম্ভব হয়েছে।

উপরোক্ত মতামতটি সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত ব্যাখ্যা হবে এরকম, কোনো মনীব যদি তাঁর গোলামদেরকে কোনো খাছ ও নৈকট্যভাজন লোকের মাধ্যমে ক্ষমা করতে চান এবং তাদেরকে কিছু পুরস্কার দিতে চান, তখন মনীব সে নৈকট্যভাজন লোকদেরকে এইরূপ বলে থাকেন যে, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমাদের পূর্বাপর সমস্ত অপরাধ মাফ করে দিলাম। অথচ মনীবের খুব ভালোভাবেই জানা আছে যে, ঐ নৈকট্যভাজন লোকগুলি কোনোকালেই কোনো গোনাহ্ বা অন্যায় অপরাধ করেনি এবং করবেও না। মনীবের এভাবে কথা বলা দ্বারা গোলামদের মর্যাদা বৃদ্ধির ও গৌরবের কারণ হবে সন্দেহ নেই।

কোনো কোনো মুফাসসেরীন এরকম বলেন, এই আয়াতে মাগফেরাত শব্দের কেনারা স্বরূপ অর্থ হবে ইসমত। তখন তার অর্থ হবে

ليعصمك الله فيما تقدم من عمرك وفيما تاخر منه

অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে আপনার অতীত ও ভবিষ্যত জীবনকে মাসুম রাখার জন্য ফতহে মুবীন দান করেছেন। এরূপ বক্তব্য অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ের শিষ্টাচারসম্ভূত।

বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ কুরআনে পাকের রীতিপদ্ধতিকে বালাগতের পর্যায়ভুক্ত হিসাবে পরিগণিত করেছেন। বালাগত শাস্ত্রের রীতি অনুসারে কোনো জিনিসের গুরুত্বহীনতা ও অপ্রতুলতা বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মাগফেরাত। ক্ষমা এবং তওবা ইত্যাদি শব্দ। যেমন কিয়ামে লাইলের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌পাক বলেন, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌তায়ালা জেনেছেন যে, তোমরা কক্ষণও রাতের গণনা করতে পারোনা, কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালা মেহেরবানী করে তোমাদের উপর মনোনিবেশ করেছেন (অর্থাৎ কিয়ামে লাইলকে মাফ করে দিয়েছেন)। এখন কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সম্ভব হয় নামাজে ততটুকুই পাঠ করো।

নবীকরীম (সঃ) এর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য হাদিয়া দেয়ার বিধান করা হয়েছিলো। সাহাবাগণের পক্ষে অনেকের জন্য তা কঠিন হয়ে যাওয়ায় তার হুকুম রহিত করা হলো। সাহাবাগণের অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা 'তাবা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, যখন তোমরা (হাদিয়া দান করতে) পারলেনা, কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালা দয়া করে তা মাফ করে দিয়েছেন। আগে ভাগে হাদিয়া প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দিলেন। রমজান মাসে রাতের বেলা স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ ছিলো। সাহাবা কেরামগণ তার উপর আমল করতে পারছিলেন না। কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালা তার হুকুমকে রহিত করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, এখন থেকে রমজান মাসে রাত্রিবেলা স্ত্রী সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো। সুতরাং তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, এখন তোমরা তাঁদের সাথে সহবাস করতে পারো।

মুফাস্‌সেরীন কেরাম এরকমও বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআনে পাকে যেখানে কোনো নবীর তওবা ও মাগফেরাতের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তাঁদের থেকে প্রকাশিত ত্রুটি সমূহের উল্লেখও করে দিয়েছেন। যেমন হজরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, আদম (আঃ) স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করলেন। হজরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, আমিই তোমাকে নসীহত করছি, তুমিতো ছিলে অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুত। হজরত ইউনুস (আঃ) এর ঘটনায় বলা হয়েছে, সে তো ধারণা করেছিলো আমি বুঝি কক্ষণও তার উপর সক্ষম হবো না। হজরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, তুমি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। হজরত মূসা (আঃ) এর ঘটনায় বলা হয়েছে فوكزه موسى ইত্যাদি। কিন্তু সাইয়্যেদুল

মুরসালীন (সঃ) এর ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে, আল্লাহ্তায়ালা ফাতাহ্ বা বিজয় কথাটি অগ্রে উল্লেখ করেছেন এবং এরপর অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ্ মাফের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে গোনাহ্টি কি তা কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা অপ্রকাশিত রেখে দিয়েছেন।

শায়েখ আযীযুদ্দীন আব্দুস সালাম স্বীয় কিতাব নেহায়াতুস সুউল ফীমা সেখিম্মিন তাফাদ্দুলির রসূল এ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের নবী পাক (সঃ) কে অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উপর অনেক দিক দিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এরপর তিনি সে দিক সমূহের মধ্যে থেকে একটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমেই হুজুর পাক (সঃ) এর ভবিষ্যত ও অতীতের সমস্ত গোনাহ্ খাতা মাফ করে দিয়েছেন বলে খবর দিয়েছেন। অথচ দেখা যায় আল্লাহ্তায়ালা আর অন্য কোনো নবীকেই এরকম কোনো খবর প্রদান করেননি। বরং এটা স্পষ্ট কথা যে, তাঁদেরকে পূর্বে কোনো প্রকারেই অবহিত করা হয়নি। হাশরের ময়দানে যখন তাঁদের উম্মতগণ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কাছে শাফাআতের জন্য ধর্না দিবে, তখন তাঁরা আপন আপন ভুলভ্রান্তির কথা প্রকাশ করবেন। আর সে স্থানের ভয়াবহতার কারণে তখন কেউ শাফাআত করার মতো কোনোরূপ ইচ্ছা ও আগ্রহ্ প্রকাশ করবেন না। অবশেষে সমস্ত মানুষ যখন উক্ত মাকামে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে শাফাআত করার জন্য দরখাস্ত নিয়ে আসবে, তখন তিনি বলবেন, হাঁ, এটা আমারই কাজ।

উক্ত আয়াতে কারীমার বিস্তারিত অর্থ এই যে, হকতায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর জন্য প্রথমে ফাতহে মুবীনকে সাব্যস্ত করে নিলেন। এরপর গোনাহ্র মাগফেরাতের উল্লেখ করলেন। অতঃপর নেয়ামতসমূহ্ পরিপূর্ণ করে দেয়া, সীরাতুল মুস্তাকিমের হেদায়েত প্রদান করা, নসরে আযীয বা প্রবল বিজয় দান করা সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। সুতরাং এসমস্ত থেকে এটাই সাব্যস্ত হলো যে, আয়াতের বর্ণনার উদ্দেশ্য গোনাহ্ মাফ করা নয়, বরং তার বিপরীত (অর্থাৎ গোনাহ্ সংঘটিত হতে না দেয়া)। বুঝ ও আল্লাহ্তায়ালার কাছে সার্বিক বুঝের জন্য তওফীক চাও। এসবই আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) আলোচনা করেছেন। এরপর আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তাঁর নেয়ামতসমূহ্ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য বিজয় দান করেছি। এখানে অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয় যে, ফাযায়েল, কামালাত, কারামাত ও বারকাত এর যত প্রকার রয়েছে, তা সবই এই আয়াতে সন্নিবেশিত আছে। আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হুজুর পাক (সঃ) কে দেয়া খাছ ও আম নেয়ামতসমূহের মধ্যে যতটুকু আলোচনা করা যায় বা কল্পনা

ও খেয়াল করা যায়, তা কেবল কল্পনা ও ধারণাই করা যাবে। সংখ্যায় গণনা করা যাবেনা। উক্ত নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ বা বর্ণনায় যতটুকু পাওয়া যায়, তাতো মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত এক অবস্থা মাত্র। তার তফসীল বা বিস্তারিত বর্ণনা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যেমন কবি বুসিরীর ভাষায়—

فان فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفم

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর ফযীলত ও মর্যাদার এমন কোনো সীমা নেই যা কোনো ভাষাভাষী তার ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারে। এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, হে রসূল! আপনি বলে দিন যে, সাগরের জলরাশি যদি কালি হয় আমার রবের কলেমা লিপিবদ্ধ করতে, তাহ্লে সে সাগর শুকিয়ে যাবে কিন্তু আমার প্রভুর কলেমা লেখা শেষ হবে না। এর সঙ্গে যদি পুনরায় ঐ পরিমাণ সাগরও বানিয়ে নেয়া হয়, তবু সম্ভব হবে না। যমীনে যত বৃক্ষ আছে সব যদি কলম হয় আর সাত সাগরের জলরাশি যদি কালি হয় (আর তা দিয়ে আল্লাহ্তায়ালার কলেমা লিপিবদ্ধ করা হয়) আল্লাহ্র কলেমা সমাপ্ত হবে না।

মুহাক্কেকীনগণের নিকট উক্ত কালেমার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে যে সমস্ত ফযীলত, কামালাত, হাকীকত ও মারেফত পবিত্র দরবারের বান্দাগণের নিকট বর্ষিত হয়। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে সাইয়্যেদে আম্বিয়া ও সনদে আসফিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর উপর যা বর্ষিত হয়। উক্ত কলেমার অর্থ তাই। নতুবা আল্লাহ্তায়ালার যত সীফাত ও শুয়ুনাত রয়েছে তার তো কোনো মিছাল হতে পারে না। দৃষ্টান্ত হওয়া থেকে তা সম্পূর্ণ পবিত্র। তার কোনো দৃষ্টান্ত হতেই পারে না। আম নেয়ামতের বর্ণনা করে তারপর দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বিত নেয়ামত সমূহের বর্ণনা করলেন আল্লাহ্পাক। এরপর তিনি বিশেষত্বের সাথে দু'টি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে একটি হলো সীরাতে মুস্তাকিমের হেদায়েত। আর এটি হচ্ছে নেয়ামতের মূলসমূহের অন্যতম এবং সার্বিক কৃতকার্যতার ফলদানকারী। কেননা রেসালতের মূল উদ্দেশ্য এটাই। আর অপর নেয়ামতটি হচ্ছে দুনিয়াবী। অবশ্য এটার উদ্দেশ্যও আগেরটির মতো দ্বীনই। আর এ নেয়ামতটি জগতকে সংশোধিত রাখা এবং শৃঙ্খলার সাথে সৃষ্টজগত পরিচালনা করার জন্য জরুরী। সুতরাং এমর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, (ফতহে মুবীন

দান করলেন) আপনাকে সীরাতে মুস্তাকীম প্রদর্শন করার জন্য এবং আল্লাহ্তায়ালা এজন্য আপনাকে এক প্রবল সাহায্য দান করবেন। ইবন আতা বলেন, ঐ অবস্থায় হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্য বিভিন্ন বড় বড় নেয়ামতসমূহ সমন্বিত করা হয়েছিলো। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকাশ্য বিজয় যা আল্লাহ্পাকের দরবারে হুজুর পাক (সঃ) এর প্রার্থনা কবুলের নিদর্শনস্বরূপ হয়েছিলো। দ্বিতীয়—মাগফেরাত যা মহব্বতের আলামত সমূহের অন্যতম। তৃতীয়—নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়া, যা কাউকে বিশেষিত করার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। চতুর্থ—হেদায়েত প্রদান করা যা বেলায়েতের নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। সুতরাং মাগফেরাত কথাটি সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পবিত্র করার দিকে ইঙ্গিত বহন করে থাকে। আর সেখানে নেয়ামত পরিপূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে রেসালাতের প্রচার প্রসার পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা দান করা। হেদায়েত ও মুশাহাদার দিকে দাওয়াত দেয়ার যোগ্যতা প্রদান করা। এর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর শান এতো বুলন্দ করে দিলেন যে, হক তায়ালার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে এতো উঁচু মর্যাদা আর কারও বেলায় কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এতো উঁচু স্তরে নিয়ে গেলেন যেখানে আল্লাহ্পাক এরূপ ঘোষণা প্রদান করলেন—

ان اللذين يبايعونك انما يبايعون الله
يد الله فوق ايديهم

'যাঁরা আপনার কাছে বায়াত হয়েছে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্পাকের কাছে বায়াত হয়েছে।' আল্লাহ্তায়ালার হাত (কুদরত, রহমত) তাঁদের হাতের উপর। আল্লাহ্তায়ালা এরূপ আরও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রসূল (সঃ) এর আনুগত্য করলো, সে যেনো আল্লাহ্তায়ালারই আনুগত্য করলো। যদিও উক্ত আয়াতের মর্মার্থকে আহলে আরব রূপক অর্থ হিসাবে ধরে থাকেন। তবে আহলে হাকীকত যারা তাঁরা অবশ্য জানেন এই আয়াতের মধ্যে কি রহস্য বিদ্যমান। আল্লাহ্পাক অধিক অবগত।

উপরোক্ত নেয়ামতসমূহের বর্ণনার পর আল্লাহ্তায়ালা মুমিনগণের উপর যে আত্মিক প্রশান্তি ও স্বস্তি নাযিল করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। সূরার শেষের দিকে হুজুর আকরম (সঃ) এর সোহবতের ফযিলতে যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ধন্য হয়েছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। মহব্বতের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এরকমই। সাহাবায়ে কেরাম কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, তাদের মত ও পথের বিরুদ্ধে চলেছেন। আর মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে যে প্রেমপ্রীতি ও মহব্বতের

আচরণ করেছেন তাতো ছিলো দ্বীন ও মিল্লাতের শৃংখলার জন্যই। কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে 'ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহ্' 'আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে মহব্বত করেন আর তাঁরাও আল্লাহ্‌তায়ালাকে মহব্বত করেন' আয়াতের আলোকে সুস্পষ্ট করেছেন। তাঁদের প্রশংসায় সূরা মায়েদাতেও উল্লেখ হয়েছে, 'তাঁরা মুমিনগণের প্রতি বিনম্র আর কাফেরদের প্রতি কঠোর।' তাঁদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মাগফেরাত ও মহান পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এসব কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ ও হুজুর পাক (সঃ) এর ফযীলত ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা কাউছার

আল্লাহ্ রব্বুল ইযযতের তরফ থেকে হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি যতো প্রকারের ফযীলত, কামালাত, কারামাত ও বারকাতের বর্ষণ হয়েছে, তার সবকিছুর বর্ণনা করা হয়েছে একখানি সমষ্টীভূত বাক্যে। তাহ্‌চ্ছে এই, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ ফরমান, 'হে আমার মাহবুব! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি।' কাউছার শব্দের অর্থ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের অসংখ্য কল্যাণ। এই আয়াতখানা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও উপরোক্ত রহস্যের কথাটি প্রকাশ করেছে। সারা জাহানের আলেম ও আরেফগণও যদি এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করে, তবুও তার হক আদায় হবেনা। কাউছার বা অসংখ্য কল্যাণ যে কি জিনিস, তার হাকীকত একমাত্র আল্লাহ্ তায়াআলাই ভালো জানেন। তা সত্বেও উপস্থিত আমার জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে যা আসছে তা আমি লিপিবদ্ধ করছি। আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ, আমি আপনাকে অধিক কল্যাণ বা নেয়ামত দান করেছি। আর সে নেয়ামতের অবস্থা এই যে, এক একটি নেয়ামত যা দুনিয়ার চেয়েও বড়—আমি যখন আপনাকে এরূপ কল্যাণ ও সৌন্দর্য দান করলাম তখন আপনি আপনার রবের জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার দুশমন যারা তারাই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

ইবাদত দু' প্রকার (১) এবাদতে বদনী বা শারীরিক ইবাদত (২) ইবাদতে মালী বা মালদ্বারা ইবাদত। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর এরশাদ ফাসাল্লিলি রাব্বিকা দ্বারা ইবাদতে বদনীর দিকে ইশারা করেছেন আর ওয়ানহার দ্বারা ইবাদতে মালীর দিকে ইশারা করেছেন। আবার আল্লাহ্‌তায়ালা ইন্না আ'তাইনা '(নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি)' বাক্যে অতীত কাল ব্যবহার করেছেন। এখানে ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহার করেন নি

এবং '(অচিরেই আমি আপনাকে দান করবো)' এরূপ বলেননি। যাবতীয় দান ও কল্যাণ হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো এ জড় জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্ব থেকেই—একথাটি বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এভাবে বলা হয়েছে। যেমন হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমি ঐ সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম রুহ্ ও দেহের মধ্যে ছিলেন।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা এই রকম, যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলছেন, হে মোহাম্মদ (সঃ)! আপনার জন্য সমস্ত সৌভাগ্যের সামগ্রী আপনার অস্তিত্বের বৃত্তে প্রবেশ করার পূর্বেই আমি আপনাকে দান করে দিয়েছি। এখন অস্তিত্বলাভের পর আপনাকে তা থেকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি? আপনি যে ইবাদতে মশগুল থাকেন এটা তো আমার ফযল। আনুগত্য ও নির্দেশের বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে তা আমি আপনাকে দেইনি। বরং ওজুব ও উপকরণবিহীন ইবাদত শুধুই আমার ফযল, শুধুই আমার এহছান। আর এজতেবা (মনোনীতকরণ) এর অর্থ দ্বারা তাই পাওয়া যায়। কেউ যদি এরকম বলে যে, সমস্ত নবীগণকে, এমনকি সমস্ত মানব জাতিকে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, তা হুজুর পাক (সঃ) এর জড়জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে। উক্তরূপ প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এরকম প্রশ্নও আসতে পারে যে, ফযিলত তো তাঁর মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক, যাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রদান করা হয়েছে। সকলের পূর্বে কিছু প্রদান করা হয়েছে এর মধ্যে কোনোরূপ ফযিলত তো থাকা উচিত নয়। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর নবুওয়াত ও তার কামালাততো আলমে আরওয়াহতে প্রকাশ করা হয়েছিলো। সেখানে তো সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এর পবিত্র আত্মাসমূহ তাঁর নিকট থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছিলো। যেমন, কুন্তুনাবিয়্যান হাদীছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐসময় অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের নবুওয়াত তো আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। বাস্তবে তো ছিলো না।

এক বর্ণনায় আছে, কাউছার মানে জান্নাতের একটি নহর। উক্ত নহরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সে নহরের নাম বলা হয়েছে কাউছার একারণে যে, অধিকসংখ্যক লোক সেখানে গমন করবে। সাইয়্যেদুনা হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—একদা নবীকরীম (সঃ) জান্নাতে ভ্রমণের বিষয়ে এরশাদ করলেন যে, আমি একদা জান্নাতে ভ্রমণ করছি, এমন সময় হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো একটি নহরের উপর। দেখলাম, সে নহরের সবদিক দিয়েই কেবল গম্বুজ আর গম্বুজ। গম্বুজগুলি মোতি দ্বারা খোদাই করা হয়েছে। আর তার মাটি হচ্ছে সুগন্ধিময়

মেশকের। আমি হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তিনি বললেন, এর নাম কাউছার। এটা আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 'ইন্না আতইনা কাল কাউছার' এর তাফসীর সলফে সালেহীনের নিকট এটাই মশহুর। এবং তারা এ ধরনের তাফসীর থেকেই উপকৃত হয়েছেন।

আবার কেউ কেউ এরকমও বলেছেন যে, কাউছার এর অর্থ হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র আউলাদ। কেননা এই সূরাতো নাযিল হয়েছিলো ঐ সমস্ত লোকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য, যারা হুজুর পাক (সঃ) কে সন্তানহীন বলে তিরস্কার করতো। সে পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি আপনাকে এমন আউলাদই দান করলাম যারা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

কেউ কেউ বলেন, কাউছার এর অর্থ অধিক কল্যাণ। অভিধানে কাউছার শব্দের অর্থ করা হয়েছে অধিক মাত্রায় দরুদ পাঠ করা। তা একারণে হতে পারে যে, যেহেতু কাফেররা হুজুর পাক (সঃ)কে আবতার বা সন্তানহীন বলে তিরস্কার করতো, তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কাফেররা আপনাকে আবতার বলে তিরস্কারের উপযোগী মনে করে, আর আমি আপনাকে অধিক দরুদ পাওয়ার উপযোগী বানিয়ে দিলাম।

আইনুল মাআনী কিতাবে বলা হয়েছে, কাউছার কাউয়াল এর ওযনে, অর্থ অধিকসংখ্যক হওয়া যেমন তাফাল শব্দ থেকে তাউফাল এবং জাহ্র শব্দ থেকে জাউহার ইত্যাদি। আর কাউছারের বিরুদ্ধতার পরিণাম কি— সে সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে 'যারা আপনাকে নির্বংশ বলে দোষারোপ করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তারাই নির্বংশ।' আবতার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার কোনো বংশধর থাকে না। তফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে, কাউছার কাউআল এর ওযনে, অর্থ অধিক সংখ্যক হওয়া। তবে এক্ষেত্রে অর্থের মধ্যে মুবালাগা বা আধিক্য থাকবে। তখন তার অর্থ হবে বহু বহু। আরব দেশে প্রচলিত আছে, কোনো বেদুইনপুত্র সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পুত্রের অবস্থা কি? তখন সে জবাব দেয়, 'বহু বহু কল্যাণ সহকারে আগমন করেছে।'

হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কাউছার এর অর্থ করেছেন অধিক কল্যাণ। এতে হজরত সাঈদ ইবন জুবায়র (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, লোকেরা বলে কাউছার মানে জান্নাতের একটা নহর, অথচ আপনি বলেন কাউছার মানে অধিক কল্যাণ। তিনি জবাব দিলেন

এটাও অধিক কল্যাণের একটি প্রকার। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্পাক বলছেন, হে মোহাম্মদ (সঃ) আমি আপনাকে উভয় জগতের এতো কল্যাণ দান করেছি যার কোনো সীমা নেই। আর এরূপ কল্যাণ আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি প্রদান করিনি। আর এরকম প্রভূত কল্যাণ প্রদানকারী তো আমিই, যিনি তামাম জাহানের মালিক ও রব। সুতরাং আপনাকে সর্বাধিক বুযুর্গী দানকারী, সর্বাধিক দানে ধন্যকারী, সর্বাধিক বখশিশকারী, মহানতম অনুগ্রহ প্রদানকারী তো আমিই। অন্য কেউ নয়। কাজেই 'ফাসাল্লিলি রব্বিকা' আপনি আপনার রবের নিমিত্তে সালাত আদায় করুন। আপনার রব আপনাকে তাঁর দানের উপযোগী বানিয়ে ঐ সমস্ত লোকের সাহায্য থেকে আপনাকে হেফাযতে রেখেছেন যারা নিজ নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে গায়রুল্লাহ্র পূজা করে থাকে। কাজেই 'ওয়ানহার'—আপনি আল্লাহ্র নামে কুরবানী করুন। এবং এর মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করুন যারা মূর্তির নামে যবেহ্ করে থাকে। 'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার' এর অর্থ নিঃসন্দেহে নির্দ্বিধায় বলা যায় আপনার কাওম থেকে যে কেউ আপনার সঙ্গে দুশমনী করবে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সেই হবে প্রকৃত আবতার—নির্বংশ ও বরকতহীন। আপনি হবেন না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানের ঘরে ঘরে যতো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই আপনারই রুহানী ফরযন্দ—আপনারই রুহানী উত্তরসূরী। মিম্বরে মিম্বরে মিনারে মিনারে আপনার নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মুখে মুখে উচ্চারিত হবে আপনার নাম, পৃথিবীব্যাপী মানুষ প্রারম্ভে আল্লাহ্তায়ালার নাম নিবে। তারপর নাম নিবে আপনার। আর আখেরাতে আপনার প্রতি যে দয়া ও মেহেরবানী হবে তাতো বর্ণনা-শক্তি বহির্ভূত। দুনিয়াতে যারা আপনাকে আবতার বলেছে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই আবতার হয়ে গিয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের নাম উচ্চারণ করার কেউ থাকবে না। হাঁ, যদি কদাচিৎ কেউ তাদের নাম নেয়ও তবু তা অভিসম্পাতের সাথে নেবে।

আবু বকর ইবন আইয়্যাশ (রঃ) বলেন, কাউছার এর অর্থ উম্মতের সংখ্যাধিক্য। হজরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, কাউছার এর অর্থ কুরআন মজীদ। হজরত ইকরামার মতে নবুওয়াত, হজরত মুগীরার মতে ইসলাম এবং হজরত হুসায়েন ইবনুল ফযলের মতে কুরআনের সহজসরলতা এবং শরীয়তের সহজসাধ্যতা। কাউছার শব্দের ভাবার্থ নিয়ে আরও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কারও মতে অধিকাংশ উম্মতের জন্য শাফাআতের

ক্ষমতা, কারও মতে নবুওয়াতের মোজেযা। কারও মতে নবুওয়াত ও কুরআন, কারও মতে জিকরে আজীম, কারও মতে দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্তি, আবার কেউ কেউ উলামায়ে উম্মতও বলেছেন। কেননা আল উলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া–আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। ইমাম আহ্মদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী এরকম বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ কাউছার এর অর্থ করেছেন এলেম। তাঁরা প্রমাণ বা যুক্তি গ্রহণ করেছেন পরবর্তী আয়াত ফাসাল্লিলি রব্বিকা থেকে। কেননা সাল্লি শব্দ দ্বারা যে ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে, তার পূর্বে এসেছে কাউছার। আর ইবাদত করতে হলে তার পূর্বে এলেমের প্রয়োজন। আল্লাহ্পাক তাই তাঁকে প্রদান করেছেন। এলেমের মধ্যে যে প্রতুলতা ও প্রশস্ততার বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা আর অন্য কোনোকিছুর মধ্যে নেই। কেউ বলেন, কাউছার মানে খুলুকে হাসান বা সৎচ্চরিত্র। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, কাউছার দ্বারা সমস্ত পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যকে বুঝাবে। এটা কোনো বিশেষ বস্তু বা গুণের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খায়রে কাছীর বা অধিক কলাণ অর্থটিই যথাযথ হয়।

পরস্পরে বাহাছ মুবাহাছা করার পরিপ্রেক্ষিতে যাদের নাম উপরে উল্লেখ করা হলো, অই সমস্ত হজরতগণ উপরোল্লিখিত অর্থ বর্ণনা করার পরও আরও কিছু কথাবার্তা আলোচনা করেছেন। ইবন আতা বলেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, হে আমার মাহবুব! আমি আপনাকে আমার রবুবিয়াতের মারেফাত, আমার ওয়াহ্দানিয়াতের এককত্ব এবং আমার কুদরত ও মালিয়াতের মারেফত দান করেছি। সহল এশায়ী (রঃ) বলেন, আমি আপনাকে ওয়াহ্দাতের সাথে কাছরত অর্থাৎ এককত্বের সাথে আধিক্য, এলমে তওহীদের বিস্তারণ এবং স্বীয় উপমাবিহীন তাজাল্লির সাথে আইনে কাছরের মধ্যে এককত্বের দর্শন এর মারেফত দান করেছি। আর এ তাজাল্লী জান্নাতেব ঐ নহর সদৃশ, যে নহর থেকে কেউ একবার পান করলে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। ফাসাল্লিলি রব্বিকা এর তাৎপর্য এই যে, যখন মুশাহাদা আইনে কাছরত—অধিকতার মধ্যে এককত্বকে অর্জন করেছেন, এখন নামাজের দৃঢ়তার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে শহুদে রুহ (আত্মিক দর্শন), হুজুরে কলব, এনকেয়াদে নফস (নফসের আনুগত্য), এবং শারীরিক বাধ্যতার সাহায্যে বারংবার ইবাদতের কাঠামো তৈরী করে লুৎফ বা আত্মিক স্বাদ অর্জন করুন। কেননা এ নামাজই হচ্ছে পরিপূর্ণতা, জমা (একীভূতি) ও তফশীল (বিস্তৃতি)। এর হক সমূহ আদায় করার তরীকা–ওয়ানহার। অর্থাৎ আনানিয়াত বা আমিত্বের উট বা গরুটিকে

যবেহ্ করে ফেলুন, যাতে আপনার শুহুদ বা দর্শনের ক্ষেত্রে এই আনানিয়াত বা আমিত্বটি অস্থিরচিত্ততার আকারে আত্মপ্রকাশ না করে এবং আপনা থেকে এসকানের মাকামকে ছলব বা রহিত না করে। এবং আপনি হকতায়ালার নিছক ইচ্ছার সাথে অবস্থান করুন। তিনি যেভাবে আপনাকে অবশিষ্ট রাখবেন সেইভাবে অবশ্য অবশ্যই আপনি অবশিষ্ট থাকুন যাতে করে আপনার বেসালে হক ও আপনার হালের মধ্যে এবং আপনার সাথে আপনার যে উম্মতের সম্মিলন এবং বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে তাতে কোনোপ্রকার বিশৃংখলা প্রকাশ না পায়। নিঃসন্দেহে আপনার সাথে শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি হক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অভিশপ্ত। আর তারাই হচ্ছে প্রকৃত আবতার বা নির্বংশ। আপনি নন।

মাওলানা তাজুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আলবুখারী 'হাকায়েকুল হাদায়েক' নামক কিতাবে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অসংখ্য ও অগণিত অত্যধিক সৌন্দর্য এবং যাবতীয় প্রকারের অসংখ্য ফযীলতসমূহ দান করেছি।

মোটকথা 'কাউছার' শব্দের তফছীর সম্পর্কে বড় বড় ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্য ও ব্যাখ্যা রয়েছে। যিনি বাতেনী নূর দ্বারা যে পরিমাণ দেখেছেন, তিনি সেই রকমই ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এটা সত্য যে সমস্ত মাখলুকাতের এলেম যদি একত্র করা হয়, তবু তা 'কাউছার' শব্দের গুঢ় রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেনা। এ সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য ও বিস্তারিত আলোচনা যদি একটি দফতরে ধারণ করা হয়, তবে এ দফতরটি হবে কাউছারের হাকীকতের তুলনায় একটি অক্ষর তুল্য। আর 'কাউছার' হবে একটি নহর তুল্য আর যাবতীয় আলোচনা যেনো সেই নহরের একফোঁটা পানি।

আয়াতে মীছাক

আয়াতে মীছাক হুজুর আকরম (সঃ) এর চূড়ান্ত পর্যায়ের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণকারী। আয়াতখানি একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সমস্ত নবীগণের সরদার। আর সমস্ত নবীগণই তাঁর উম্মতের হুকুম রাখেন। আয়াতে মীছাকের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'হে বন্ধু! আপনি স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি যখন তোমাদিগকে কিতাব ও হেকমত দান করবো, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের নিকট যা আছে তাকে সত্যায়িত করেন।

অবশ্যই তোমরা তখন তাঁর উপর ইমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। 'তখন আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছিলেন, 'তোমরা কি একথা স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা স্বীকার করলাম।' আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর যে ব্যক্তি ফিরে যাবে, তারাই হচ্ছে ফাছেক।' এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হজরত আদম (আঃ) থেকে নবীকরীম (সঃ) পর্যন্ত যতো নবী রসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আল্লাহ্তায়ালা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন— এ সম্পর্কে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। বিখ্যাত তফসীরকারকগণের মত এটাই যে, আয়াতে কারীমার উল্লেখিত 'রসূল' শব্দটি দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আগমন করেননি যাঁর কাছে হুজুর আকরম (সঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়নি এবং গুণাবলী বর্ণনার পর তাঁর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি। ঐ অঙ্গীকারে বলা ছিলো যে, তুমি যখন শেষ নবীর যমানা পাবে, তখন অবশ্যই তাঁর উপর ইমান আনবে। নবীগণের কাছ থেকে যখন উক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হলো, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের উম্মতগণ থেকেও উক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু আম্বিয়া কেরাম হলেন উম্মতের জন্য মূল এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি। কাজেই আয়াতে কারীমায় সে মূলের আলোচনা করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। উম্মতের কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে নাই।

সাইয়্যেদুনা হজরত আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) ও সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করেননি, যাঁদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, তোমরা যদি মোহাম্মদ (সঃ) কে পাও তাহলে অবশ্যই তাঁর উপর ইমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। কেউ কেউ এরকমও বলেন যে, উক্ত আয়াতে কারীমার অর্থ শুধু উপরোক্ত মত অনুযায়ীই নয় বরং তার মর্ম এই, আল্লাহ্তায়ালা নবীগণ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যেনো আপন আপন উম্মতের কাছ থেকেও এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, মোহাম্মদ (সঃ) যখন আবির্ভূত হবেন, তখন তোমরা সকলেই তাঁর উপর অবশ্যই ইমান আনবে এবং সার্বিকভাবে তাঁর সাহায্য করবে। এমনিভাবে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের কাছেও যেনো তারা এমনি ধারাবাহিকভাবে অঙ্গীকার গ্রহণের কাজ চালিয়ে যায়।

এই অঙ্গীকার গ্রহণের প্রক্রিয়া হুজুর পাক (সঃ) এর যমানায় আহলে কিতাবদের কাছ পর্যন্ত জারী হলো। হুজুর পাক (সঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করলেন, তখন মদীনার ইহুদীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো। ঐ সময় তাদেরকে সেই পূর্বের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্তায়ালা উক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল করলেন, "আল্লাহ্তায়ালা নবীগণের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলেন, তারা যেনো আপন আপন উম্মত থেকে উক্তরূপ ওয়াদা গ্রহণ করেন।" অঙ্গীকার সম্পাদনের ক্ষেত্রে যারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁদের স্বপক্ষে যুক্তি হলো এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর আবির্ভাবের পর আহলে কিতাবদের উপর তো ফরজ হয়ে গিয়েছিলো তাঁর উপর ইমান আনা। অথচ হুজুর আকরম (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বেই আম্বিয়ায়ে কেরাম সকলেই এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন।

সাইয়্যেদ যাঁরা তাঁরা তো কখনও মুকাল্লাফ হতে পারেন না। সুতরাং নবীগণের অনুসারী উম্মত যারা তাদের উপরই এই অঙ্গীকার গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায়। আর উক্ত মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করছে এই আয়াতে করীমা—এহেন ওয়াদা অঙ্গীকার থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তারাই ফাছেক। —আর এ ফাছেক শব্দের ব্যবহারটা নবীগণের শানে হতে পারেনা। ফাছেক যদি হয় তো সে হবে উম্মত। তার উত্তর এভাবেও প্রদান করা হয়েছে যে, আয়াতে ফাছেক হওয়া সম্পর্কে যা বলা হলো, তা ফরযান বলা হয়েছে। কথাটির মর্ম এই, ধরে নেয়া হোক কোনো নবী যদি জীবিত থাকেন, আর সে অবস্থায় মোহাম্মদ (সঃ) এর আগমন ঘটে, তবে তাঁকে অবশ্যই তাঁর উপর ইমান আনতে হবে। কোনো নবী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাঁর আবির্ভাব হওয়া সম্পর্কে কোনোরূপ সংবাদ প্রদান এখানে বুঝানো হয়নি। এরকম বহু ব্যাপার রয়েছে যেখানে 'ফরযান' দিক অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন কুরআনে পাকে এসেছে, 'ধরে নেয়া যাক আপনি যদি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে।' 'ধরে নেয়া যাক আপনি যদি আমার উপর কোনো বানোয়াট কথা বলেন।' 'ধরে নেয়া যাক কেউ যদি বলে নিশ্চয়ই আমি ইলাহ্'—এ আয়াতগুলি 'ফরযান' (ধরে নেয়া যাক) এর উদাহরণ।

হুজুর আকরম (সঃ) এর ফযীলত, মর্যাদা ও অলৌকিকত্ব বুঝানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এখানে কালামের ভিত্তি যখন ফরযান হিসাবে, তখন হকতায়ালার এরশাদে ফাছেক শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক। অধিকন্তু আরেক ব্যাপার সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার রাখতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা যখন

নবীগণের প্রতিশ্রুতি নিলেন এবং হুকুম করলেন নবীকরীম (সঃ) এর প্রতি ইমান আনতে ও তাঁকে সাহায্য করতে তা তাঁদের জীবদ্দশায়। জীবদ্দশায় কোনো নবীর জন্য যা হুকুম সে হুকুম তো সে নবীর উম্মতের জন্য বতরীকে আউলা প্রমাণিত হবে। অতএব এই আয়াতের সম্পর্ক হবে উম্মতের সঙ্গে। তবে অঙ্গীকার নবীগণ থেকে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাতে গুরুত্ব ও দৃঢ়ত্ব বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম সুবকী (রঃ) বলেন, আয়াতে মীছাক এদিকে ইশারা করছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর নবুওয়াত সমস্ত নবীগণের জীবদ্দশায় তাঁদের সময়ে বিদ্যমান ছিলো। কাজেই তাঁর নবুওয়াত ও রেসালত সাধারণভাবে আদম (আঃ) এর যমানা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মাখলুকের জন্য। সমস্ত নবীগণ ও তাঁদের উম্মতসমূহ সকলেই তাঁর উম্মত। হুজুর পাক (সঃ) এরকম এরশাদ করেছেন যে, 'আমি সমস্ত মানবকুলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম, 'আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতিই প্রেরণ করেছি।' এসকল এরশাদসমূহ একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁর নবুওয়াত শুধু তাঁর জীবদ্দশা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ নয়, বরং তাঁর পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরাও তাঁর নবুওয়াতের অধীন।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে আম্বিয়া কেরামগণ থেকে আল্লাহ্তায়ালা কেনো অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তার উত্তর এই, অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এজন্য যে, তাঁদের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে মহান, সম্মানিত ও অগ্রগণ্য এই ব্যাপারটা তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। এবং তিনি যে তাঁদের সকলের নবী ও রসূল তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে। সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! তোমরা ইনসাফের সাথে চিন্তাফিকির করো, আল্লাহ্তায়ালার তাযীম ও তকরীম নবীকরীম (সঃ) এর প্রতি কতো মহান। গভীরভাবে ভাবলেই এটা জানা সম্ভব হবে যে, তাঁরা সকলেই বনী মোহাম্মদ (সঃ)। আর তিনি হলেন নবীউল আম্বিয়া। এখান থেকেই এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, কিয়ামতের দিন আদম (আঃ) ও তাঁর সমস্ত আওলাদ হুজুর আকরম (সঃ) এর ঝান্ডার নীচে অবস্থান করবেন। যেমন তিনি এরশাদ ফরমান, আদম (আঃ) ও তারপর যাঁরা, তাঁরা সকলেই আমার পতাকাতলে অবস্থান করবেন। ধরে নেয়া যেতে পারে, যে, সমস্ত নবীগণ যদি হুজুর আকরম (সঃ) এর সঙ্গেই তাঁর জীবদ্দশায় দুনিয়াতে আসতেন, তাহলে তাঁরা সকলেই তাঁর উপর ইমান আনতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন।

তাই নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, মুসা (আঃ) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে তাঁর কোনো উপায় থাকতো না। আর এই অনুসরণ ঐ মীছাক বা অঙ্গীকার অনুসারেই হতো যা তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছিলো। সুতরাং হজরত ঈসা (আঃ) আখেরী যমানায় হুজুর পাক (সঃ) এর শরীয়তের উপরই দুনিয়াতে তশরীফ আনয়ন করবেন। অথচ তিনি যে স্বীয় নবুওয়াতমূলক ইযযত কারামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং তা থেকে সামান্যও ঘাটতি হবে না। অন্যান্য নবীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁরা আপন আপন নবুওয়াত ও তাঁদের উম্মত থাকা সত্ত্বেও হুজুর আকরম (সঃ) এর উম্মত। সুতরাং হুজুর আকরম (সঃ) এর নবুওয়াত অধিকতর ব্যাপক। অধিকতর সম্মিলিত এবং মহান। কথাটির তাৎপর্য গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। যেমন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, নবীকরীম (সঃ) এর কারণে অনান্য আম্বিয়া কেরামের নবুওয়াত ও রেসালত রহিত হয়ে গেছে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার গ্রন্থকার এরকমই বলেছেন। যা কিছু বলা হলো, তার চেয়ে অধিক তিনি এর তাহ্‌কীক ও তাফসীলমূলক আলোচনা করেছেন।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ শায়েখ মোহাক্কেক শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, প্রকাশ্য নিদর্শন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করবো। আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তজা (রাঃ) এবং সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর ইমান আনবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, তার অর্থ তাঁর দ্বীনের আনুরূপ্য করা, প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখা অথবা সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করা যা আলমে ওজুদে এসেছে। এরকম বহুলোক আছে যাঁরা হুজুর আকরম (সঃ) এর ওজুদে আনসারী বা জড়জগতের অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তাঁর উপর ইমান এনেছিলেন। যেমন হজরত হাবীব নাজ্জার ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী যামানার অনেক লোক হুজুর আকরম (সঃ) এর ফাযায়েল, কামালাত এবং নবুওয়াতের সংবাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

হুজুর আকরম (সঃ) যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সকল উম্মতের নবী তার জন্য এ প্রমাণটিই যথেষ্ট যে, মেরাজ রজনীতে হুজুর আকরম (সঃ) এবং তামাম আম্বিয়া কেরাম সকলেই একস্থানে সমবেত হয়েছিলেন।

হুজুর পাক (সঃ) তাঁদের ইমামতী করলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁর মুক্তাদী হয়েছিলেন। ঐ সময় তাঁরা সকলেই তাঁর উপর ইমান এনেছিলেন। যেহেতু আম্বিয়া কেরামের প্রকৃত জীবন ও পার্থিব জীবন উভয়ের সাথেই তাঁরা সংশ্লিষ্ট। এতে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। যদিও আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের আপন আপন উম্মতগণ থেকে আখেরী যমানার পয়গম্বরের প্রতি ইমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, এ অঙ্গীকারও কিন্তু ছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর মহিমা ও আভিজাত্যের কারণেই। তবে আল্লাহ্তায়ালা যে নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো অধিকতর সম্মানের এবং অধিকতর মহত্বের। ফাফ্হাম্ ওয়া বিল্লাহিত্তাওফীক।

রসূলগণের পারস্পরিক মর্যাদা

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, 'ঐ রসূলগণ, আমি তাঁদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছি।' 'অন্য জায়গায় এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি কোনো কোনো নবীকে কোনো কোনো নবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি।' এই দু'খানা আয়াতই নবীগণের পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্যের স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁরা একজন আরেকজনের তুলনায় মর্যাদাশীল। একথাটি দ্বারা মুতাযিলাদের মতকে খন্ডন করা হয়েছে। তারা নবীগণের পারস্পরিক পদমর্যাদার তারতম্য হওয়ার বিরোধী। তাদের মতে তাঁরা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। একদল এরকম বলে থাকে যে, হজরত আদম (আঃ) পিতা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ। তবে এমতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আলোচনা তো হচ্ছে নবুওয়াতের দিক দিয়ে উত্তম হওয়া প্রসঙ্গে। আলোচনার প্রসঙ্গ তো পিতা হওয়ার দিক দিয়ে নয়।

অনেক সময় দেখা যায় পিতার তুলনায় পুত্র অধিক কামালাত ও ফযীলতপূর্ণ হয়ে থাকে। যদিও পিতা পিতৃত্বের দিক দিয়ে তাঁর যথাযথ হকের অধিকারী। আবার আরেক দল এরকম বলে থাকে যে, এক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করাই সমীচীন। এই মতের ব্যাপারেও আশ্চর্য হতে হয়। কেননা নস্সে কুরআনী যেখানে পরিষ্কারভাবে আম্বীয়ায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। সেখানে নীরবতা অবলম্বন করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, নবীগণের মধ্যে কতিপয় এমন আছেন, যাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা কালাম করেছেন—মুফাসসেরীনে কেরাম বলেন, এর দ্বারা হজরত মুসা (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকেই কথোপকথন

করেছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, উক্ত আয়াতের বৈশিষ্ট্য দ্বারা হজরত মুসা (আঃ) কে, খাছ করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা এটা তো সুসাব্যস্ত কথা যে, হুজুর সাইয়্যেদুলমুরসালীন (সঃ) এর সাথে আল্লাহ্‌তায়ালা শবে মেরাজে কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়াই কথা বলেছেন। তবে মুসা (আঃ) এর সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম করাটা বিশেষভাবে সংঘটিত হয়েছে। আর সম্ভবত উক্ত বিশেষত্বের এবং নেয়ামত অর্জন করার কারণেই তিনি কলীম হিসাবে খ্যাত হয়েছেন।

যে সময় সাইয়্যেদে আলম (সঃ) আরশের উপরে গেলেন এবং এমনস্থানে পৌছলেন, যেখানে মাখলুকের জ্ঞান পৌছেনা। হুজুর পাক (সঃ) যে পর্যন্ত পৌছলেন, ঐ পর্যন্ত অন্য কারও পৌছাও সম্ভব হয়নি। যেখানে পৌছে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে যে কালাম করলেন, তাতো অন্যান্যগণকে যে মর্যাদা ও পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বের। অনেক পরিপূর্ণতার। সেদিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'তিনি তাঁদের কারও মর্যাদাকে কয়েকগুণ উন্নত করে দিয়েছেন।' মুফাসসেরীনে কেরাম এব্যাপারে একমত যে, এই আয়াত দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে, এ ব্যাপারটি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। এ দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) এর তাযীম, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা বুঝানোই উদ্দেশ্য। কালামের তরীকা বা ভাষার অলংকারের এলেম যাঁর আছে তাঁর নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আম্বিয়া কেরামের জন্য যে সম্মান ও মর্যাদার কথা আলোচিত হয়েছে, তা তিন প্রকার। (১) কোনো নবীর নবুওয়াতের নিদর্শন ও মোজেজা এই পরিমাণ অধিক স্পষ্ট, বিখ্যাত, শক্তিশালী এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকে যে পরিমাণ তাঁর উম্মত অধিকতর পরিচ্ছন্ন জ্ঞানী, সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকে। (২) অথবা যে নবীর ব্যক্তিত্ব অধিকতর উত্তম, পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট হবে। ব্যক্তিগত উৎকৃষ্টতা ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে, যাতে নবীর মোজেজা, উঁচু মর্যাদা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। (৩) অথবা সে নবী গোপন মিলন বা দর্শনের মতো উপহার দ্বারা ধন্য হবেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের নবীকরীম (সঃ) এর মোজেজা সমূহ ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী অত্যধিক স্পষ্ট, পরিপূর্ণ উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিলো। তাঁর পদ মর্যাদা ছিলো সর্বাধিক উন্নত, এবং শান শওকত ছিলো অধিকতর মহান ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর উম্মত হচ্ছে সর্বাধিক পবিত্র, জ্ঞানী

ও সংখ্যাগুরু। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদ প্রমাণ করে, 'তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত।' সমন্বিত ফাযায়েল ও কামালাত বলতে যা বুঝায় তাদ্বারা ভূষিত হয়েছেন হুজুর আকরম (সঃ) এর উম্মত। নবীকরীম (সঃ) এর পবিত্র সত্তা অধিকতর পরিপূর্ণ ও পবিত্র। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ, কারামত ও কামালতসমূহ সুমহান, প্রসিদ্ধ, অধিকতর স্পষ্ট। তাঁর মর্যাদা সমস্ত রসূলগণের মর্যাদার চেয়ে উন্নত, সমস্ত মাখলুকের চেয়ে পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট ও উত্তম।

শাফাআত সংক্রান্ত হাদীছখানার প্রতি চিন্তা করা উচিত। হাশরের দিনে আল্লাহ্র সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়ে শাফাআতকারীর অন্বেষণ করতে থাকবে। তারা হজরত আদম (আঃ), হজরত নূহ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মূসা (আঃ) এবং হজরত ঈসা (আঃ) এর নিকটে যাবে এবং তাদের জন্য বারীতায়ালার কাছে শাফাআত প্রার্থনা করবে। সকলেই এই মাকামের জিম্মাদারী কবুল করার ব্যাপারে নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, এ কাজ আমার নয়। পরিশেষে সমস্ত মাখলুক সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সঃ) এর কাছে এসে উপস্থিত হবে। তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ, এ কাজ, আমার কাজ। এরপর তিনি আল্লাহ্তায়ালার বারেগাহে হাজির হবেন। (হাদীছের শেষ পর্যন্ত)। এই হাদীছ, ছাড়াও নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি বনী আদমের সরদার', আরো বলেছেন, 'আমি বনী আদমের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত।' কেউ কেউ বলেন, 'আদম সন্তান' বলতে মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে; যার মধ্যে হজরত আদম (আঃ)ও দাখিল আছেন। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, 'আমি কিয়ামতের দিনে মানবজাতির সরদার হবো'—সবচাইতে উত্তম দলীল হচ্ছে এই হাদীছ, 'আদম (আঃ) এবং তিনি ব্যতীত যতো লোক; সকলেই আমার পতাকাতলে অবস্থান করবে।' কেউ কেউ আবার হুজুর আকরম (সঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বকে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে থাকেন 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত— সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভূত করা হয়েছে।' এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে দ্বীনের পরিপূর্ণতার উপর। আর দ্বীনের পরিপূর্ণতা তো নবীর পূর্ণতার অনুগামী, যে নবীর আনুগত্য করে উম্মতেরা।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে নবীকরীম (সঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের দলীল গ্রহণ করে থাকেন। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন প্রশংসনীয় গুণাবলীর মাধ্যমে। আয়াতে নবীগণ সম্পর্কে মোহাম্মদ (সঃ) কে বলা হলো, অই হজরতগণ আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, সুতরাং

আপনি তাদের রাস্তায় চলুন। আয়াতে কারীমার মর্মানুসারে বুঝা গেলো হুজুর পাক (সঃ) কে তাঁদের রাস্তায় চলার জন্য হুকুম করা হয়েছে। কাজেই উক্ত হুকুম বাস্তবায়ন করা তাঁর উপর ওয়াজিব হয়ে গেলো। তিনি উক্ত হুকুম প্রতিপালন করলে পূর্বের সমস্ত আম্বিয়াগণের যাবতীয় সৌন্দর্য ও কামালাত হুজুর পাক (সঃ)এর মধ্যে সন্নিবেশিত হলো। সমস্ত সৌন্দর্য ও কামালাত যা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো তা এক জায়গায় সঞ্চিত হলো। কাজেই তিনি এর মাধ্যমে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। এই দলীলখানা বেশ সূক্ষ্ম। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এরকম ধারণার সৃষ্টি হয়—এর দ্বারা হুজুর আকরম (সঃ) শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হয়েছে। কেননা তাঁকে পূর্ববতী আম্বিয়া কেরামের অনুসরণ ও আনুগত্য করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এস্থানে অনুসরণ ও আনুগত্য দ্বারা মুআফেকাত, আনুকূল্য বা আনুরূপ্য বুঝানো হয়েছে। আম্বিয়া কেরামগণ সকলেই যখন তাঁর পূর্বে অতিক্রম করে গিয়েছেন এবং তিনি সকলের পরে এসেছেন, এজন্য এখানে 'একতেদা' (অনুসরণ) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। হুজুর পাক (সঃ) কে যেখানে মিল্লাতে ইব্রাহীমের আনুগত্য করার জন্য হুকুম করা হয়েছে, সেখানেও এরকম অর্থ বুঝে নিতে হবে। অধিকন্তু হুজুর আকরম (সঃ) এর দাওয়াত অন্যান্য সমস্ত নবীগণের সকলের দাওয়াতের তুলনায় অনেক বেশী এলাকায় পৌছেছে। কাজেই পৃথিবীর মানুষ অন্যান্য নবীগণ কর্তৃক দাওয়াতের তুলনায় হুজুর পাক (সঃ) এর দাওয়াতের মাধ্যমে বেশী উপকৃত হয়েছে। কাজেই হুজুর আকরম (সঃ) সমস্ত নবীগণের তুলনায় অধিকতর পূর্ণ সন্দেহ নেই। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে উপকৃত করে।

ফাযায়েলে সাহাবা এর অধ্যায়ে একখানা হাদীছ আছে। সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) একদিন দরোজা দিয়ে বের হলেন। তাঁকে দেখে হুজুর আকরম (সঃ) বললেন, 'এ ব্যক্তি আরবের সরদার'। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আরবের সরদার নন? হুজুর এরশাদ ফরমালেন — انا سيد العلمين على سيد العرب 'আমি হলাম সমগ্র আলমের সরদার আর আলী আরবের সরদার'।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে হাকিমের মত—হাদীছখানা সহীহ্। তবে কেউ কেউ এ হাদীছকে যয়ীফ বলে থাকেন। যাহাবী অবশ্য এই হাদীছকে মওযু হিসাবে পরিগণিত করেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এতক্ষণ যা আলোচনা হলো, তা হুজুর আকরম (সঃ)—এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। তবে এর বিরুদ্ধেও কিছু কিছু দলীল পাওয়া যায়। যেমন কুরআনে কারীমে এসেছে। 'আমি নবীগণের কারও মধ্যেই কোনো পার্থক্য করিনা।' সহীহাদীছে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় 'আমাকে নবীগণের মধ্যে প্রাধান্য দিওনা। আবার আরেক বর্ণনায় আছে নবীগণের মধ্যে কোনো প্রাধান্য দিও না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে নবীগণের মধ্যে কাউকে পৃথক করো না। হজরত বিন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে, তোমরা কোনো বান্দাকে বিশেষিত করো না, যাতে সে বলতে লাগে যে আমি ইউনুস ইবন মুতই (আঃ) এর চেয়ে উত্তম। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যা বললো।

আরও বর্ণিত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ বলে যে, আমি ইউনুস ইবন মুতই (আঃ) এর চেয়ে উত্তম। তাহলে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যা বললো। খন্ডনকারী উপরোক্ত দলীলগুলির উত্তর এই যে, আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ, আমরা ইমানের ক্ষেত্রে কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। তার মানে আমরা এমন নই যে আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে আমরা কারও কারও উপর ইমান আনি, আর কারও কারও উপর ইমান আনিনা। যেমন এই শ্রেণীর লোকদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের সাথে কুফুরী করে।

'এবং তারা ইচ্ছা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে।

'তারা বলে যে, আমরা কারও কারও প্রতি ইমান আনি আর কারও কারও প্রতি কুফুরী করি।'

এক্ষেত্রে হাকীকত এই যে, কোনো একজন রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা মূলতঃ সমস্ত রসূলগণকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। উক্ত মতটির সপক্ষে ওলামায়ে কেরাম দলীল দিয়ে থাকেন এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে, তাহলে আপনার পূর্বের সমস্ত রসূলগণকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সমস্ত নবী রসূলগণের প্রতি সমানভাবে ইমান রাখার দ্বারা এটা সূচিত হয় না যে, তাঁদের মধ্যে পদ মর্যাদার তারতম্য হতে পারবেনা। এরপর আসা যাক উল্লেখিত হাদীছ সমূহের আলোচনায়।

ঐ সমস্ত হাদীছ সমূহের জবাব মুহাদ্দেছীনে কেরাম বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, লাতুফাদ্দেলু ওয়ালাতুখাইয়েরু শব্দ দ্বারা যে কোনো নবীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দিতে বা পছন্দ করতে নিষেধ

করা হয়েছে তা ওহীর মাধ্যমে হুজুর পাক (সঃ) যে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া আফযালুল বাশার সাইয়্যেদু বুলদে আদাম এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বে ছিলো। এ মত যদি গ্রহণ করা হয় তবে অবশ্য একটা ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হবে যে, এক্ষেত্রে কোনটি পূর্বের ও কোনটি পরের। আবার কেউ কেউ এরকম মত পোষণ করেন, নবীগণের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে, যাঁর উপর প্রাধান্য দেয়া হলো তাঁকে কোনোরূপ অবমাননা করা না হয়।

কেউ কেউ এরকম বলেন, কোনো নবীকে অপর নবীর উপর মর্যাদা প্রদান করার নিষিদ্ধতা নবুওয়াত ও রেসালতের মূল। কেননা সমস্ত নবীগণই নবুওয়াতের মূলের দিক দিয়ে একই সীমায় সীমাবদ্ধ। তবে তাঁদের মধ্যে যে পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য এটা নবুওয়াতের দিক দিয়ে নয়। বরং ফযীলত বা মর্যাদা। এটা নবুওয়াতের উপর অতিরিক্ত জিনিস। যেমন কেউ কেউ রসূল। আবার কেউ নবী। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ উলুল আযম পয়গম্বর। তবে এ ধরনের মত পোষণ করলে ভুল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

একথাগুলির বিস্তারিত বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কেউ এরকম বলেন যে, আমি ঐ নবী বা রসূলকে ফযীলত প্রদান করি আল্লাহ্তায়ালা যাঁকে নৈকট্যের বৈশিষ্ট্য দ্বারা উন্নত করে দিয়েছেন। তাঁরা উম্মত নিয়ামত প্রদান করা, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, দ্বীনের উপর ধৈর্য ধারণ করা, রেসালতের দায়িত্ব আদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়েত করার জন্য সর্বদাই আকাঙ্খিত হয়ে থাকা ইত্যাদির ব্যাপারে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে কারো উপরে কোনোরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়। কেননা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষমতার সীমা অনুসারে স্বীয় চেষ্টা সাধনা ও শক্তি প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা যে যতটুকু করেছেন তার চেয়ে বেশী দায়িত্ব আল্লাহ্ তাঁদের উপর আরোপ করেননি। কাজেই ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন যে, আমরা এরকম বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্তায়ালা নবীগণকে একে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছেন সাধারণভাবে। তবে আমরা আল্লাহ্র সৃষ্ট বান্দা যারা আপন সত্তাগত অভিমতের মাধ্যমে একে অপরের উপর ফযীলত প্রদান করা থেকে বিরত থাকি। কেননা আমরা তো কারও ফযীলত স্বীয় জ্ঞান অনুসারে বর্ণনা করতে অক্ষম বরং কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতে রসূলুল্লাহ্ই কেবল তা করতে সক্ষম। যেমন আলোচনার প্রথম দিকে দলীল হিসাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবন আবী জুমরাহ্ (রঃ) যিনি মালেকী মযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন, তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছে ইউনুস ইবন মুতই সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত হাদীছের মাধ্যমে হুজুর পাক (সঃ) এর উদ্দেশ্য ছিলো হক সুবহানাহু তায়ালার দিক, সীমা ও অবস্থাকে রহিত করণ। তাই ইবন খতীব অর্থাৎ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, উক্ত হাদীছে নবীকরীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, ইউনুস (আঃ) এর উপর আমার ফযীলত বা মর্যাদা এই কারণে নয় যে, আমাকে আকাশে উঠানো হয়েছে, আর হজরত ইউনুস (আঃ) কে সমুদ্রের গভীরে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন হয়েছি, আর তিনি আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, এই হিসাবে যদি তাঁর উপর আমার মর্যাদা বুঝানো হয়, তাহলে তো হকতায়ালার জন্য স্থান ও দিক স্বীকার করতে হয়। অথচ এরূপ ধারণা ভুল। যদিও আমাকে আকাশের সাতটি স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর হজরত ইউনুস (আঃ) কে সমুদ্রের গভীরে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যে অবস্থান করার ব্যাপারে তিনি এবং আমি উভয়েই সমান। অন্যান্য নবী এবং ইউনুস (আঃ) এর উপর আমার পদমর্যাদা সাব্যস্ত করা ছাড়া আমার জন্য অন্যান্য সম্মান ও কামালাত সবই সাব্যস্ত রয়েছে।

উপরে যে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হলো, পদমর্যাদা যদি সে দৃষ্টিকোণ থেকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে আল্লাহ্তায়ালার জন্য দিক অবধারিত হয়ে যায়। এরকম কথা ইমাম দারুল হিজরাত অর্থাৎ ইমাম মালেক (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। ইমামুল হারামাইন শরীফাইন থেকেও এ ধরনের বক্তব্য সংকলিত আছে। কোনো কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাঁরা বলে থাকেন যে, আমরা ওজুদে বারী তায়ালার শানে স্থান সাব্যস্ত করার দিকে নবীগণের ফযীলত দেই না। কেননা, ওজুদে বারীতায়ালার জন্য তো সমস্ত দিকই সমান।

মালায়ে আ'লা অর্থাৎ উর্ধজগতের মাখলুকের জন্য এই নিম্নজগত অর্থাৎ দুনিয়ার জগতের মাখলুকের উপর যে প্রাধান্য রয়েছে, এ জগতের তুলনায় অই জগতের যে মর্যাদা রয়েছে, এ হিসাবে আমরা হজরত ইউনুস (আঃ) এর উপরে নবীকরীম (সঃ) কে মর্যাদা দিয়ে থাকি। এ মর্যাদা নির্ধারণটা যেনো ফযীলত ও মাকানাত, কদর ও মনযেলাতের দিক দিয়ে। স্থান হিসাবে নয়। সুতরাং মর্যাদার নিষিদ্ধতা স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট, যদ্বারা কুরবে মাকানীর মাফহুম হাসিল হয়। অবশ্য এ মতভেদ আমরা সমর্থন করি না। ফালইয়াত্তাআম্মাল।

ফেরেশতার উপর মানুষের মর্যাদা

ফেরেশতাকুলের উপর মানবজাতির প্রাধান্য প্রসঙ্গে জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ হচ্ছে, খাওয়াস্‌সুল বাশার বা বিশেষত্বপ্রাপ্ত মানব অর্থাৎ আম্বিয়া (আঃ) খাওয়াস্‌সুল মালায়েকা বা বিশেষত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তথা হজরত জিব্রাইল (আঃ), হজরত মিকাইল (আঃ), হজরত ইসরাফীল (আঃ), হজরত আযরাইল (আঃ) এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতা বৃন্দ, মুকাররবীন ফেরেশতাবৃন্দ ইত্যাদি ফেরেশতাগণের উপর প্রাধান্য রয়েছে।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকমই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এসম্পর্কে আকায়েদে নসফীর এবারত এরকম, মানবজাতির রসূলগণ ফেরেশতাবৃন্দের রসূলগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতাদের রসূল বলতে ফেরেশতাগণের ঐ জামাআত যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই ফেরেশতাকুলের জন্য রসূল। কেননা এ রসুলগণ ফেরেশতাবৃন্দের মধ্যে আহ্‌কামে ইলাহীর সংবাদ প্রদান করে থাকেন—তালীম দিয়ে থাকেন। আর যাঁরা আওয়ামুল বাশার অর্থাৎ আউলিয়া, আতকিয়া, ও সুলাহা, তাঁরা আওয়ামুল মালায়েকা (যাঁরা ফেরেশতাকুলের রসূল নন) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

শুআবুল ইমানে মানুষের মধ্যে যারা গোনাহ্‌গার, ফাসেক তাদেরকে আওয়ামুল বাশার থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত কিতাবের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত হলো। সেখানে বলা হয়েছে, ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্বেকার এবং অধুনাকালের জ্ঞানীগণ বিতর্ক করে থাকেন। কাজেই এক্ষেত্রে এই সমাধানই কাম্য যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা রসূল তাঁরা ফেরেশত্‌গণের রসূলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। জমহুরে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামআত বলে থাকেন যে, আশআরী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ফেরেশতাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে বিশ্বাসী।

কাযী আবু বকর বাকেল্লানী যিনি এই মাযহাবের উত্তম কামেল ব্যক্তি এবং শায়েখ আবুল আশআরী (রঃ) এর শাগরেদ তাঁর নিকটও এ মতটি পছন্দনীয়। আব্দুল্লাহ্‌ হালীমীও এ মতের দিকে রয়েছেন। ইমাম গায্‌যালীর বক্তব্য থেকেও কোনো কোনো স্থানে এ ধরনের মতের আভাস পাওয়া যায়। কারও কারও মাযহাব আবার এরকম যে, নিছকতা ও নৈকট্যের দিক দিয়ে ফেরেশতাগণ উত্তম। আর ছওয়াবের পরিমাণের দিক দিয়ে মানুষ উত্তম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যে মানুষকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বলে

থাকেন, সে—ও ছওয়াবের পরিমাণের দিক দিয়েই। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাহাবীগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী (রঃ) যিনি শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণের ভিতর উঁচু মর্যাদার অধিকারী একজন আলেম—তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে নিজকে সংকটাপন্ন না করে অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে কাউকেই প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আমি আশাবাদী যে কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাই করা হবে না।

ফেরেশতাবৃন্দের মধ্যেও পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হজরত জিব্রাইল (আঃ)। তাঁকে রুহুল আমীন বলা হয়ে থাকে। তিনি এলেম বহিঃপ্রকাশকারী এবং ওহী বহনকারী। তাঁর পরে আরও তিনজন ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁরা অন্যান্য ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রসূলগণ নবীগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আবার কোনো কোনো রসূলও অপর রসূলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। হুজুর আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতবা (সঃ) সমস্ত আম্বিয়া মুরসালীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন বা নবীগণের সরদার। খাতামুন্নাবিয়্যীন বা নবীগণের সিলমোহর এবং সমস্ত মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের সংখ্যার ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে হজরত আবু যর ((রাঃ) এর হাদীছ খানা উল্লেখযোগ্য। যে হাদীছখানা ইবন মারদুভী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আম্বিয়া কেরামের সংখ্যা কতো? হুজুর পাক (সঃ) বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ রসূলের সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, তিনশ' তের। (প্রকৃত এলেম আল্লাহ্তায়ালার নিকট)।

যেসমস্ত নবীর নাম কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে, তাঁরা হচ্ছেন হজরত আদম (আঃ), হজরত ইদ্রিস (আঃ), হজরত নূহ (আঃ), হজরত হুদ (আঃ), হজরত সালেহ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত লুত (আঃ), হজরত ইসমাইল (আঃ), হজরত ঈসহাক (আঃ), হজরত ইয়াকুব (আঃ), হজরত ইউসুফ (আঃ), হজরত আইয়্যুব (আঃ), হজরত শোআয়েব (আঃ), হজরত মুসা (আঃ), হজরত হারুন (আঃ), হজরত ইউনুস (আঃ), হজরত দাউদ (আঃ), হজরত সুলায়মান (আঃ), হজরত ইলইয়াস (আঃ), হজরত আলইয়াসা (আঃ), হজরত যাকরিয়্যা (আঃ), হজরত ইয়াহইয়া (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ) ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতবা (সঃ)।

অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীনের মতে যুলকিফলও একজন নবী। কুরআনে মজীদে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, এমন আছে যাদের বর্ণনা আমি আপনার কাছে পেশ করেছি, আবার এমনও আছে যাদের বর্ণনা আমি আপনার কাছে পেশ করিনি। এ থেকে বুঝা যায় যে, হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে সমস্ত নবীগণের বর্ণনা প্রদান করা হয়নি।

নবীকরীম (সঃ) এর বিশেষ মর্যাদা

আল্লাহ্ রব্বুল ইয্‌যতের পক্ষ থেকে রসূল সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এর যে সমস্ত মর্যাদা ও কারামাতের কথা কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও মহান ঘটনা হলো মেরাজের ঘটনা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত সেই মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করেছে। যেমন সূরা বনী ইসরাইলে سبحان الذى اسرى 'সুবহানাল্লাযি আসরা' আয়াতের আসরা শব্দ, এবং সূরা ওয়ান্নজমে دنى فتدلى 'দানা ফাতাদাল্লা' আয়াত দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) এর সুমহান মর্যাদার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তদুপরি আল্লাহ্‌তায়ালার বিস্ময়কর ও অনন্য সূক্ষ্ম ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টির দর্শন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য অর্জনের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

হুজুর পাক (সঃ) এর জন্য আরেকটি বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে তাঁর দুশমন মক্কা ও মদীনার মুশরেকদের থেকে হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে হেফাযত করবেন। হুজুরপাক (সঃ) যেমন স্বীয় সাহাবাগণকে হেফাযত করা ও দেখাশোনার কাজের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন, তেমনিভাবে তিনি দুশমনদের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খল থেকে নিজের জন্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেন। এধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম মোতাবেকই হয়েছিলো এবং এর মধ্যে যদিও পরিপূর্ণ হেকমত বিদ্যমান ছিলো, তা সত্ত্বেও উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর পাক (সঃ) দুশমনদের ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিলেন।

তখনকার পরিবেশ সম্পর্কে খবর প্রদান করছে এই আয়াতে কারীমা, কাফেররা যখন আপনার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছিলো আপনাকে বন্দী করার জন্য। কিংবা হত্যা করে ফেলবে অথবা আপনাকে দেশান্তরিত করে ফেলবে। —এ অবস্থা হিজরতের পূর্বে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিলো। হুজুর পাক (সঃ) এর উপর ভিত্তি করেই হিজরতের চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এ ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। এ মর্মে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, এরা যদি

মোহাম্মদ (সঃ) কে সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সাহায্য করবেন। মেরাজের ঘটনার আলোকে দেখা যায় যে, নবীকরীম (সঃ) কে কাফের মুশরেকদের পক্ষ থেকে যে দুঃখ কষ্ট দেয়া হতো, মেরাজের পর আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলেন এবং হুজুর পাক (সঃ) এর ব্যাপারে তারা যতসব মতানৈক্য করতো সবকিছুর অপনোদন করেছিলেন। কাফেররা যখন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রয়াস পেয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা তখন কাফেরদের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন। সূর গুহায় তিনি অবস্থান করছেন এ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কাফেররা তাঁকে খুঁজে বের করতে কুণ্ঠিত হলো। আল্লাহ্তায়ালা তাদের মধ্যে আলস্য ঢেলে দিলেন, তাদের মনযোগ ফিরিয়ে দিলেন অন্যদিকে।

আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া, হুজুর পাক (সঃ) এর উপর আল্লাহ্তায়ালার দেয়া প্রশান্তি প্রবাহ অবতীর্ণ হওয়া, আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তায়ালার সঙ্গতা মুশাহাদা করা—এছাড়াও অন্যান্য মহানতম মোজেজা ও নিদর্শনের ঘটনা ঘটেছে তাঁর নবুওয়াতী জীন্দেগীতে যার বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে। হকতায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর হাবীব (সঃ) কে হেফাযত করা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম, যখন তাঁর সাথীকে তিনি বললেন, চিন্তা করোনা নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।

এ ঘটনার সাথে হজরত মূসা (আঃ) এর ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। যখন তিনি বনী ইসরাইলদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। ফেরাউন ও তার বাহিনী তাঁদেরকে পিছন থেকে তাড়া করতে লাগলো। তখন বনী ইসরাইলের লোকেরা ভয় করতে লাগলো ফেরাউনের বাহিনী তাঁদেরকে পাকড়াও করে ফেলে কি না। তখন হজরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, ভয় করো না। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রভুপ্রতিপালক আছেন।

তবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রভু প্রতিপালকের দর্শন এবং হজরত মুসা (আঃ) এর দর্শনের মধ্যে বহু তারতম্য রয়েছে। হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রথম দৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার উপর পড়েছিলো দ্বিতীয় দৃষ্টি পড়েছিলো নিজের উপর। সে সময় তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সাথে আছেন। আর হজরত মুসা (আঃ) এর প্রথম দৃষ্টি পড়েছিলো নিজের উপর। তারপর দ্বিতীয় দৃষ্টি পড়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার উপর। তখন তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আছেন আমার রব।এ উভয় প্রকার দৃষ্টি ভঙ্গিই দর্শন ও নৈকট্যের অবস্থা জ্ঞাপক। তবে প্রথম প্রকারটি অধিকতর পূর্ণত্বপ্রাপ্ত এবং অধিকতর

নৈকট্যশোভিত। যেমন কেউ যদি বলেন, আমি কিছুই দেখিনি কিন্তু তার পূর্বে আল্লাহ্‌কে দেখেছি। আর যদি এরকম বলে, আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু তার পর আল্লাহ্‌কে দেখেছি। এ দুটি কথার মধ্যে প্রথমটিতে রয়েছে জযবার তরীকা আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে সুলুকের তরীকা।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাতটি প্রশংসাবাণী এবং একটি বড় কুরআন দান করেছি। সাবয়ে মাছানী এর অর্থ ঐ সাতটি লম্বা সূরা যা কুরআনে কারীমের প্রথমে সাজানো হয়েছে। আর সে গুলি হচ্ছে সূরা বাকারা থেকে সূরা আনফাল এর অথবা সূরা তৌবা এর শেষ পর্যন্ত। এখানে অথবা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আনফাল ও সূরা তৌবা মূলত এক সূরার হুকুম রাখে। একারণে এ দু সূরার মধ্যে بسم الله الرحمن الرحيم 'বিছমিল্লা হির রহ্‌মানির রহিম' এনে দুই সূরাকে বিছিন্ন করা হয়নি।

কুরআনুল করীমের সাতটি আয়াতকেও সাবয়েমাছানী বলা হয় যার অপর নাম হচ্ছে উম্মুল কুরআন বা ফাতিহা। এ ছাড়া বাকী সমগ্র কুরআনকে কুরআনে আযীম বলা হয়। এই সূরা নামাজের প্রতি রাকাতে তেলাওয়াত করতে হয় অথবা তা একাধিকবার নাযিল হয়েছে বিধায় এ উম্মুল কুরআনের নামকরণ হয়েছে সাব্‌য়ে মাছানী হিসাবে। আবার কেউ কেউ এরকম বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এ সূরাকে হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্য বিশেষিত করেছেন এবং তাঁর জন্য একে যখীরা বা সঞ্চিত সম্পদ বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো নবীকে এরকম উচ্চমানের প্রার্থনা বা প্রশংসাবাণী দান করেননি। কুরআনের নাম মাছানী রাখার এক যুক্তি এই হতে পারে যে, এ কুরআনে হাকিমে ঘটনাসমূহের বর্ণনা বারংবার পেশ করা হয়েছে। অথবা এ-ও হতে পারে যে, এতে হকতায়ালা শানুহুর হামদ ও ছানা প্রকাশ করা হয়েছে। অথবা এ কারণও হওয়া সম্ভব যে, এসব হামদ ও ছানা যা করা হয়েছে, সবই বালাগাত ও এজাযের সাথে করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা হুজুর আকরম (সঃ) এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরশাদ ফরমান, আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আরও এরশাদ ফরমান, আপনি বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত রসূল। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ ফরমান, যে, কোনো রসূলকে প্রেরণ করেছি, তাঁর আপন সম্প্রদায়ের ভাষার মাধ্যমেই

প্রেরণ করেছি, যাতে তাদের জন্য তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করতে পারেন। শেষোক্ত আয়াতখানা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ভাষাগত হিসাবে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কোনো ভাষাগত বা গোত্রগত নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানব তথা সমস্ত মাখলুকাতের জন্য নবী। প্রথমোক্ত দু'খানা আয়াতের মাধ্যমে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমর্মে হুজুর পাক (সঃ) নিজে এরশাদ ফরমান, আমি কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ আরব আজম সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। আসওয়াদ এর মর্মার্থ হচ্ছে আরব অঞ্চল। কেননা এখানকার মানুষের গায়ের বর্ণ সাধারণতঃ বাদামী বা কাল বর্ণের হয়ে থাকে। আর আহমার এর মর্মার্থ হচ্ছে আজম বা অনারব। কেননা, এখানকার মানুষের গায়ের বর্ণ সাধারণতঃ লাল বা সাদা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, নবী (সঃ) মুমেনগণের নিকট তাঁদের জানের চেয়ে প্রিয়, আর তাঁর স্ত্রীগণ মুমেনগণের মা।—আয়াতখানার মর্মকথা হচ্ছে, নবীপাক (সঃ) এর হুকুম কার্যকর ও জারী করা এরকম যেমন গোলামের উপর তার মনীবের হুকুম কার্যকর ও জারী করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার ব্যক্তিসত্তাগত অভিমত অপেক্ষা নবীকরীম (সঃ) এর হুকুমের অনুসরণ করা উত্তম হবে। হুজুরপাক (সঃ) কে কেমন মহব্বত ও অনুসরণ করতে হবে তার বর্ণনা ওজুব এর অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীগণ মুসলমানদের মা। এ বিধানটি হুজুর পাক (সঃ) এর দুনিয়া থেকে প্রস্থান হওয়ার পর তাঁর পূত পবিত্রা স্ত্রীগণকে যে বিবাহ করা যাবে না, তা তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কারামাত হিসাবে হুরমতে নিকাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তাঁরা মুসলমানগণের জন্য মা হওয়ার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, হুজুরপাক (সঃ) এর জাগতিক ওফাত অনুষ্ঠিত হলে কি হবে? তাঁরা তো আখেরাতেও তাঁর স্ত্রী। এক অপ্রচলিত কেরাআত অনুসারে উক্ত আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশ এরকমও পাওয়া যায়, নবীকরীম (সঃ) মুমেনদের জন্য পিতা।

হকতায়ালা শানুহু হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রশংসায় এরশাদ ফরমান, 'আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন আর আপনি যা জানতেন না, তা আপনাকে শিখিয়েছেন আর আল্লাহ্তায়ালার ফযল বা অনুগ্রহ আপনার উপর অনেক।' ফযলে আযীম বা মহান অনুগ্রহ বলতে যে কি বুঝায়; তার হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে, একথা দ্বারা আল্লাহ দর্শনের শক্তি ও তা বরদাশত করার

ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, হজরত মুসা (আঃ) ঐরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি। নবীকরীম (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ্পাকের দেয়া এরকম ফযল ও শরফ এর বর্ণনামূলক আয়াতে কুরআনী অনেক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানার পর কুরআন মজীদে যা আছে সবই হুজুর পাক (সঃ) এর আউসাফ ও কামালাতের বর্ণনার প্রকাশস্থল।

হুজুর আকরম (সঃ) এর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম যে, মুশরেক সম্প্রদায় এবং দ্বীনের দুশমনরা যখনই হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রতি কোনোরূপ নিন্দা দোষারোপ ও কটুক্তি বা কটাক্ষ করেছে, তখন হকতায়ালা শানুহু স্বয়ং তাঁর বন্ধুর রক্ষাকর্তা হয়ে তা প্রতিহত করেছেন। প্রেমিকের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যখন তার প্রেমাস্পদের দুর্নাম শোনে, সেটাকে তখন প্রেমিক নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর প্রতিউত্তর দিয়ে থাকে এবং তাকে উৎপাটিত করে ফেলার জন্য অগ্রসর হয়। এদিকে স্বীয় প্রেমাস্পদকে সাহায্যের দ্বার অবারিত করে দেয়। মূলতঃ তখন বিরুদ্ধবাদীকে যে প্রতিহত করা হয় তা থাকে অত্যন্ত যথাযথ, আর তাঁকে যে সাহায্য করা হয়, তা হয় অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং উচ্চমানের। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়, কাফেররা যখন নবীকরীম সম্পর্কে মন্তব্য করলো এরূপ বক্তব্যের মাধ্যমে, হে ঐ ব্যক্তি যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগোল। (নাউযুবিল্লাহ্)। আল্লাহ্তায়ালা তাদের বক্তব্যের সরাসরি উত্তর দিয়ে দিলেন, 'হে মাহবুব! আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহভাজন, পাগল নন। আর নিশ্চয়ই আপনার জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।' যাঁর মধ্যে এরকম চারিত্রিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে, তিনি কেমন করে উন্মাদ হতে পারেন?

একদা আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী দেখতে পেলো, হুজুর পাক (সঃ) মসজিদ কাবা থেকে বাইরে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে সেও মসজিদের ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে লাগলো। বাবে বনী যাহামের নিকট হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো এবং তখন সে তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললো। ঐ সময় কুরাইশ বংশের নিকৃষ্টতম লোকগুলি মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলো। আস যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করলো, তখন লোকগুলি তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এতক্ষণ কার সাথে কথোপকথন করছিলে? আস বললো আবতার অর্থাৎ নির্বংশ লোকটির সাথে। ঐ সময় হজরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর উদরে হুজুর পাক

(সঃ) এর একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে ইন্তিকাল করেছেন। সে সময় হুজুর পাক (সঃ) এর কোনো আওলাদ জীবিত ছিলেন না। তাই তারা তাঁকে আবতার বলে অভিহিত করলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা এর প্রতিউত্তর প্রদান করলেন এভাবে, প্রকৃত নির্বংশ আপনার নিন্দুকেরাই।

এক সময় কাফেররা রসূল (সঃ) কে বললো, আপনি রসূল নন। আল্লাহ্তায়ালা তার জবাব দিয়েছিলেন এভাবে, 'হে সাইয়্যেদে আলম! হেকমতপূর্ণ কুরআনের কসম, নিশ্চয়ই আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।' কাফেররা বললো, একজন পাগল কবির কারণে আমরা কি আমাদের দেবতাগণকে পরিত্যাগ করবো? আল্লাহ্তায়ালা তাদের বক্তব্য খণ্ডন করে জবাব দিলেন, 'বরং সত্য এসে গেছে এবং রসূলগণ সত্য বলেছেন। 'আল্লাহ্তায়ালা আরও বললেন, 'আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেইনি আর এটা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়।'

কাফেররা যখন বললো, ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি। এগুলি তো পূর্ববর্তী লোকদের বানানো কল্পকাহিনী। আল্লাহ্পাক তাদের একথার উত্তর এভাবে প্রদান করলেন, 'এই কুরআনের মতো একটি কিতাব রচনার উদ্দেশ্যে সমস্ত জ্বীন ও ইনসান যদি একত্রিত হয়, তবুও তারা এর মতো একটি কিতাব আনতে পারবে না।' কাফেররা যখন বললো, একি হলো এ রসূলের (অর্থাৎ এ কেমন রসূল) সে খানাও খায় আবার বাজারেও যাতায়াত করে! আল্লাহ্তায়ালা এর উত্তরে বললেন, আপনার পূর্বে আমি যতো রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা অবশ্যই খানা খেতেন এবং বাজারে যেতেন।' মক্কার কাফেররা মানুষের মধ্য থেকে রসূল আবির্ভূত হওয়াটাকে সুদূরপরাহত মনে করলো। আল্লাহ্তায়ালা তাদের ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'হে রসূল আপনি বলে দিন! যমীনে যদি ফেরেশতারা বসবাস করতো, তাঁরা শান্তিতে যমীনে বিচরণ করতো, তবুও আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাই প্রেরণ করতাম রসূল হিসাবে।'

কথাটির সারমর্ম এই যে, স্বজাতীয়তার মধ্যে মহব্বত ও আন্তরিক মিল পয়দা হয়। আর জাতিগত প্রভেদে পাওয়া যায় মতের বৈষম্য অনান্তরিকতা। কাজেই রসূল প্রেরণের এটাই হেকমত যে, ফেরেশতাগণের জন্য রসূল হলে ফেরেশতাই হবে। আর মানুষের জন্য রসূল প্রেরণ করা হলে মানুষকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। আর এর ফলে প্রত্যেক নবীই আপন আপন জাতির লোকদের জন্য নিজ সত্তাকে রক্ষাকারী ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবেন। যেমন হজরত নূহ (আঃ) বলেছিলেন আমার মধ্যে কোনো ভ্রষ্টতা নেই। হজরত হুদ (আঃ) বলেছিলেন, আমার মধ্যে

কোনো মূর্খতা নেই। কুরআন মজীদে এধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ্পাক ভালো জানেন।

কুরআন মজীদের কতিপয় মুবহাম আয়াত থেকে সন্দেহের অপনোদন

কুরআন মজীদের কিছু মুবহাম আয়াত থেকে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করণার্থে এখন আলোচনা করা হবে। কোনো কোনো অজ্ঞ-মূর্খ অথবা বক্রতা ও কুটিলতাপূর্ণ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঐ আয়াত দেখে রসূল কারীম (সঃ) এর উচ্চ মর্যাদায় বিভিন্ন রকম ত্রুটি সৃষ্টি করা এবং সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। এ আয়াতগুলি প্রকৃতপক্ষে আয়াতে মুতাশাবেহাত এর পর্যায়ভুক্তই। ওলামায়ে কেরাম এ সমস্ত আয়াতের যথাযথ ও সমীচীন তাবীল এবং উপযুক্ত অর্থ করেছেন।

অই সমস্ত আয়াত সমূহের মধ্যে অন্যতম আয়াত হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন—এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মূর্খেরা এটাই বুঝাতে চায় যে, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে রসূল কারীম (সঃ) এর মধ্যে ضلالت 'দালালাত' বা গোমরাহী ছিলো। আর সেই গোমরাহীকেই দূর করেছেন আল্লাহ্তায়ালা هدايت 'হেদায়েত' বা পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে। অথচ ওলামায়ে কেরামের একথার উপরে ঐকমত্য রয়েছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই হোক বা পরেই হোক কখনও তাঁকে গোমরাহী দ্বারা দূষিত করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালিত করেছেন, তৌহিদ দান করেছেন, ইমান দান করেছেন—এসবই তো ইসমত বা হেফাযতের মধ্যে রেখেই করেছেন। আর সমস্ত আম্বিয়াগণের বেলায়ও একই অবস্থা। যে মহান ব্যক্তিটিকে আল্লাহ্তায়ালা নবুওয়াত, রেসালত, এসতেফা ও এজতেবা (পছন্দ ও মনোনীত) এর দ্বারা ধন্য করলেন, কোনো ইতিহাসবেত্তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রমাণ করতে পারেনি যে তাঁরা ইতিপূর্বে কুফুরী, শিরকী ও গোমরাহীতে লিপ্ত ছিলেন।

তবে হাঁ, একথাটির মধ্যে অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, আকলগতভাবে জায়েয কি না। মুতাযিলাদের নিকট আকলগতভাবে জায়েয নয়। কেননা এটা অপছন্দনীয়তা এবং দূরবর্তীতাকে নির্দেশ করে। তবে আমাদের আসহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট আকলগতভাবে তা জায়েয। হকতায়ালা কাউকে দালালাত এর কূপ থেকে বের করে হেদায়ত দান করে নবুওয়াতের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। তবে বিভিন্ন উদ্ধৃতি

ও শ্রুতিগত দলীল এটাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের ঘটনা এ বাস্তব জগতে কখনও ঘটেনি।

কেননা সমস্ত আম্বিয়া কেরাম নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই আল্লাহ্তায়ালার যাত ও সিফাত সম্পর্কে অনবহিত হওয়া বা শক-সন্দেহ্ করা থেকে পবিত্র ও মাসুম ছিলেন। তাঁরা সকলেই কুফুরী, গোনাহ এবং এমন প্রত্যেকটি কাজ যা ক্ষতিকর ও ঘৃণিত—এ সবকিছু থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে ভুল-ভ্রান্তি, আবেগতাড়িত হয়ে কোনো প্রকারের গাফলতী করে ফেলা, রাগত অবস্থায় কোনো অন্যায় করে ফেলা এবং মিল্লাতের শরীয়ত ও দ্বীন-প্রচারের সাথে জড়িত এমন কোনো কাজের ত্রুটি করা, সাধারণতঃ কবীরা গোনাহ্ এবং ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গোনাহ্ থেকে মাসুম ও মামুন ছিলেন। বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া (সঃ) এর ক্ষেত্রে তাঁর ইসমত বা মাসুম থাকা সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মর্তবা অধিকতর উন্নত। যে ব্যক্তি তাঁর শানে আদবের খেলাফ ব্যক্তিগত অনুসারে কোনো মন্তব্য করবে, সে পরিত্যাজ্য হবে সন্দেহ্ নেই। নিঃসন্দেহে সে মূর্খতার নিম্নতম অন্ধকারের গভীরতম গহ্বরে নিমজ্জিত আছে। হুজুর আকরম (সঃ) এর পবিত্র সত্তা তো প্রথম থেকেই এমন পবিত্র এবং সুসজ্জিত ছিলো যে, কোনোরকম দোষত্রুটির হস্ত তাঁর ইযযত ও বুযুর্গীর আঁচল স্পর্শ করতে পারেনি।

যেমন কবি বলেছেন, তালীম ও আদব গ্রহণ করার তো তাঁর কোনো প্রয়োজনই নেই। কেননা, তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদবশীল হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও হকতায়ালার প্রতিপালন ও শিক্ষা আর ধীরে ধীরে কুরআনে পাক সন্নিবেশিত হওয়ার মাধ্যমে যে সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন, তাই এক সময় শক্তি থেকে কার্যের রূপ পরিগ্রহ করলো। এমনকি আল্লাহ্তায়ালার ঐ সমস্ত প্রতিশ্রুতি যা তাঁর জন্য দেয়া হয়েছিলো, যখন এক এক করে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগলো, তখন তো তার মাধ্যমে তিনি পূর্ণ প্রত্যয় এবং পরিপূর্ণ উন্মোচন অর্জন করলেন। কাজেই আল্লাহ্তায়ালার কুদরত প্রত্যক্ষ করা এবং মোজেজা প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রায়শঃই তিনি এরূপ বলতেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্র রসূল। কেউ যদি এরকম প্রশ্ন করে, প্রত্যেক কামেল লোকের অবস্থাইতো এরকম যে, কোনো গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা ব্যক্তিসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়, সেগুলি তরতীব অনুসারেই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ লাভ করে থাকে। তাহলে হুজুর আকরম (সঃ) এর ক্ষেত্রে বিশেষত্বটা কোথায়? উত্তরে এই বলা হবে যে, যোগ্যতা, নিকট ও দূরত্বের তারতম্য অনুসারে হবে।

কেননা কোনো বা-কামেল ব্যক্তির মধ্যে যে কামালিয়াত আসে তা কসব ও রিয়াযত (অর্জন ও সাধনা) এর মাধ্যমে বাস্তবে রূপলাভ করে থাকে। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) এর বেলায় সবইতো সতত বিদ্যমান, সতত প্রস্তুত। কিন্তু সেটা পর্দার অন্তরালে আচ্ছাদিত থাকে অর্থাৎ আলেমে গায়বের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যার বহিঃপ্রকাশটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন নাযিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে অর্জন, সাধনার কারণ ব্যতিরেকেই আত্মপ্রকাশ ঘটে। কথার সার এই যে, কুরআন কারীম হুজুর পাক (সঃ) কে মার্জিত করেছে, আদব—শিখিয়েছে একথার অর্থ এই নয় যে, দোষত্রুটি থেকে পূর্ণতার দিকে এসেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের দিকে এসেছেন।

ঐ সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র সত্তায় সিফাতে বাশারিয়াত অর্থাৎ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমান থাকা এবং স্বভাবের ও প্রবৃত্তির বিধান বিদ্যমান থাকা সাব্যস্ত করে। তারা তাঁর মধ্যে অধৈর্য ও অস্থিরতা, যেমন কার্যাবলীর উৎস ও উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে। শরীয়তের হেকমত এবং এত্তেবার মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা সেটার কারণ মনে করে। কুরআন অবতরণ তাঁকে মার্জিত করার এবং প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করার কারণ মনে করে। এরা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অনুভূতি অনুসারে সাইয়্যেদুল কাউনাইন (সঃ) এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছে বলে দাবী করে। হুজুর পাক (সঃ) এর শানে এমন ধারণা করে, এমন কথা বলে যা এ অধমের (মাদারেজুন্নবুওয়াত এর গ্রন্থকার) বিশ্বাসের রুচী বহির্ভূত। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজের অবস্থার মাপকাঠিতে অন্যকে বিচার করে। এটা একেবারেই বৈধ নয়।

এ আলোচনার কিছু অংশ যেহেতু নবীকরীম (সঃ) এর আখলাক শরীফের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, এজন্য তার পুনরোল্লেখের প্রয়োজন নেই। এস্থানে শুধু ঐ কথাগুলোর আলোচনা করা হবে, যেগুলির কারণে পথভ্রষ্ট ও বক্রচিন্তার অধিকারী লোকেরা সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয়। এ বিষয়গুলি আলোচনা করতে এ মিসকীনের (মুহতারাম গ্রন্থকার মরহুম) ভাষা অপারগ। যদিও তাদের সন্দেহ অপনোদনকল্পে একাজটি একটি বিধি সম্মত কাজ। তথাপিও অসন্তুষ্টি থেকে মুক্ত মনে হয় না। কিন্তু যেহেতু ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন এবং এর মধ্যে মুসলেহাতও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কাজেই আমিও বাধ্য হয়ে তাঁদের অনুসরণ করছি। আশা রাখি হয়তো পরিণাম ভালোই হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সমস্ত আয়াত দ্বারা নবীকরীম (সঃ) এর শানের খেলাফ কোনো ধারণা আসে, সে আয়াতের মর্মার্থ উদঘাটনের জন্য কোনো

কোনো সুফী ও মুহাক্কেক ব্যক্তিগণ যেমন মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলিকে স্মরণ রাখতে হবে এবং তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তাহলে জটিলতার নিরসন হবে, আবার ক্ষতি থেকে নিরাপত্তাও লাভ হবে। সেই আদব ও মূলনীতিমূলক ব্যাখ্যাগুলি হচ্ছে এই—(১) মহান ও বরহক আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর তরফ থেকে যে সমস্ত খেতাব বা সম্বোধন, কোনো অসন্তোষ, কোনো শানশওকত, প্রাবল্য, কোনো এস্তেগফার বা কোনো বড়ত্ব প্রকাশকারী শব্দ যেমন ('আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না)' '(অবশ্যই আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে)' '(কারও ব্যাপারে আপনার উপর কোনো যিম্মাদারী নেই)' '(আপনি দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য কামনা করেন) বা এজাতীয় আরও অন্য কোনো শব্দ বা বাক্য নবীকরীম (সঃ) এর শানে পাওয়া যায়। অথবা নবীকরীম (সঃ) এর পক্ষ থেকে বন্দেগী, আজেযী, এনকেছারী, বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, দারিদ্র ইত্যাদি প্রকাশকারী কোনো শব্দ-বাক্য পাওয়া যায়, যেমন, '(আমি তোমাদের মতই মানুষ)' '(অন্যান্য বান্দারা যেমন রাগ করে আমিও সেরকম রাগান্বিত হই)' '(আমি জানি না আমার সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা হবে।)' '(আমি জানিনা এই দেয়ালের পেছনে কি আছে)' এ জাতীয় আরও বিভিন্ন কথা যা বাস্তবে এসেছে, সে সবের তাৎপর্য উদঘাটনের ব্যাপারে আমাদের উপর অপরিহার্য নয় এবং আমাদের সেই মাকামও নেই যে আমরা তাতে বাগড়া দেবো, অংশিদারীত্ব তালাশ করবো এবং উল্লাস প্রকাশ করবো। বরং আমাদের জন্য উচিত হবে আদব, শালীনতা ও নীরবতার সীমানায় অবস্থান করে উদাসীন এবং মূক হয়ে থাকবো।

মাবুদের সম্পূর্ণ হক বা অধিকার রয়েছে তাঁর বান্দার ব্যাপারে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। আর এদিকে বান্দাও সাধারণত মাবুদ বা মনীবের দ্বারে আজিযী, এনকেছারী করে থাকে। অন্যের কি অধিকার আছে দু'জনের মধ্যে প্রবেশ করার এবং অনধিকার চর্চা করার? আদবের পরিসীমা লংঘন করার? এ হচ্ছে অজ্ঞ লোকের অই মাকাম যেখানে অনেক দুর্বল ও জাহেলের পদস্খলন হয়েছে এবং নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। 'আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকেই হেফাজত ও সাহায্য।'

এখন আলোচনায় আসা যাক আয়াতে কারীমা ওয়াওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা এর প্রকৃত অর্থ কি? মুফাসসেরীনে কেরাম এই আয়াতের তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তম্মধ্যে একটির অর্থ এরকম যে, আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে নবুওয়াতের জ্ঞান এবং শরীয়তের আহকাম

সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায় পেয়েছেন। অতপর তিনি ওয়াকেফহাল করে দিয়েছেন। এ অর্থ সমর্থন করেছেন হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ), হাসান, যেহাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ। তাঁদের সমর্থিত উক্ত অর্থের সত্যায়ন করছে কুরআনে কারীমের এই আয়াতখানা, 'আপনি কিতাব ও ইমান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।' মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, ওহীপ্রাপ্তির পূর্বে আপনি কুরআনে কারীম পাঠ করা এবং মাখলুককে ইমানের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারটা জানতেন না।

কেউ কেউ বলেন, ইমানের অর্থ হচ্ছে শরীয়তের বিধান এবং ফরজ সমূহ। কেননা হুজুর আকরম (সঃ) তো ওহীর পূর্বেও তাওহীদে হকের উপর ইমান রাখতেন। আর তারপরেই তো তাঁর উপর আহকাম ও ফরজ সমূহ নাযিল হলো, যে ব্যাপারে তাঁর ইতিপূর্বে জানা ছিলোনা। অথবা এ-ও হতে পারে যে, ইমানের পর আবার ইমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে ইমানের অর্থ হচ্ছে শরীয়তের তফসীলাত (বিস্তারিত শরীয়ত) বা নামাজ। ইমান অর্থ যে নামাজ তার সমর্থনে দলীল হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার বাণী—আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ইমান অর্থাৎ নামাজকে নষ্ট করে দেবেন।—মর্মার্থ হচ্ছে যে নামাজ কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে লক্ষ করে আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা সে গুলি নষ্ট করে দেবেন না।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) আল্লাহ্তায়ালার তাওহীদ বাস্তবায়িত করতেন। মূর্তিকে দুশমন মনে করতেন। জাহেলী যুগেও হজ ও ওমরা আদায় করতেন। হাদীছ সমূহে এসেছে, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমি কখনও শারাব পান করিনি, কখনও প্রতিমা পূজা করিনি, আর আমি এটা ভালোই জানতাম যে, কুরাইশরা কুফুরীর উপর রয়েছে। তিনি এ সমস্ত কথা বলতেন, অথচ ঐ সময় ইমানের তাফসীলাত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরাও দ্বীনে ইসমাইলীর কিছু কিছু আহকামের উপর আমল করতো। যেমন হজ, খতনা, কবর, গোছল ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা ২

মরফু হিসাবে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমি বাল্যবয়সে একদিন আমার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ক্ষুধার কারণে আমি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমার রব আমাকে রাস্তা দেখিয়েছিলেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এরকম উল্লেখ করেছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এরূপ বর্ণিত আছে। এখানে

প্রসিদ্ধ যে ঘটনাটি তা হচ্ছে—দুধমাতা হজরত হালীমাতুস্‌সাদিয়া রসূল কারীম (সঃ) কে নিয়ে এসেছিলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে অর্পণ করার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩

আয়াতে কারীমায় যে ضالا 'দাল্লান' শব্দ রয়েছে তা ضل الماء فى اللبن 'দাল্লান মাউ ফিল্লাবানে' '(দুধে পানি মিশিয়েছে)' একথাটি থেকে এসেছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পেয়েছেন যে সময় তিনি পানিকে দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে পানিকে দুধের মধ্যে ধরে রাখতেন। (আরব দেশে সাধারণত মিঠাই বা লাচ্ছি তৈয়ার করার সময় দুধের মধ্যে অধিকাংশ সময় পানি মিশানো হতো। পানিকে দুধের মধ্যে মিশ্রিত করার অর্থ হচ্ছে, তিনি মক্কার কাফেরদের কাছে মাগলুব বা পরাস্ত অবস্থায় ছিলেন। ঐ কাফেররা ছিলো গালেব বা বিজয়ী। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে শক্তি প্রদান করলেন, যাতে করে তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীনকে গালেব ও বিজয়ী করে দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ৪

আরবদেশে মরুভূমিতে একটি গাছ জন্মে যা বিলকুল একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে। সে গাছটিকে আরববাসীরা ضلاله 'দালালাহ্' বলে ডাকে। এখানে আয়াতের অর্থ এরকম, যেনো আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে ডেকে বলছেন, হে আমার হাবীব, আপনি এই নগরীতে (দালালাহ) বৃক্ষের ন্যায় নিঃসঙ্গ ও একাকী অবস্থায় আছেন। আপনি ঈমান ও তাওহীদের ফল দ্বারা উক্ত বৃক্ষকে সুশোভিত করে তুলবেন। তাই আপনাকে আমি হেদায়েত দান করলাম। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) এর দিকে মাখলুকাতকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। যাতে করে এ ফলদায়ক রাস্তা পেয়ে তারা উপকৃত হতে পারে—ধন্য হতে পারে।

ব্যাখ্যা ৫

কখনও কোনো কাওমের সরদারকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে কাওমের লোকসকল। অর্থাৎ আয়াতে কারীমার অর্থ হবে এরকম, আপনার কাওমকে আমি গোমরাহ্ পেয়েছি, তাই আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে শরীয়তের সাথে হেদায়েত দান করলাম।

ব্যাখ্যা ৬

ضال 'দাল্ল'এর অর্থ মহব্বতে অন্ধ। অর্থ এই যে, হে বন্ধু! আপনাকে ভালোবাসায় অন্ধ দিকভ্রান্ত পথিকের ন্যায় পেয়েছি। কাজেই আমি আপনাকে আমার ভালোবাসার পথ প্রদর্শন করেছি। محب 'মুহিব্ব' প্রেমিককে দাল্ল বলার অধিক প্রচলন রয়েছে। কেননা মহব্বত নিজ সত্তা সম্পর্কেও মানুষকে বেখেয়াল বানিয়ে দেয়। নিজের সুখ শান্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। এর ফলে এমন হয় যে, কখনও সচেতন অবস্থায় সে কায়েম থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, নিশ্চয় আমি তাকে প্রকাশ্য অন্ধত্বের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আরও এরশাদ করেন 'নিশ্চয়ই তুমি পুরানো অন্ধত্বের মধ্যে অবস্থান করছো।' এরূপ ব্যাখ্যা বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত আতা (রহঃ) থেকে সংকলিত।

ব্যাখ্যা ৭

আমি আপনাকে বিস্মৃত অবস্থায় পেয়েছি। তারপর আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। এরূপ ব্যাখ্যা শবে মেরাজের অবস্থার উপর প্রযোজ্য হয়। উক্ত মাকামের বিস্ময়কর অবস্থাদৃষ্টে হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়েছিলো। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, তিনি হক তায়ালার কাছে কি এবং কি ভাবে নিজের আরয পেশ করবেন? হকতায়ালার হামদ ও ছানা কিভাবে প্রকাশ করবেন। তখন আল্লাহ্তায়াল্লা তাঁকে পথ প্রদর্শন করলেন এবং কিভাবে হামদ ও ছানা প্রকাশ করবেন তার পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। তখন জনাব রসূলে মকবুল (সঃ) আরয করেছিলেন, হে আমার রব! আপনার উপর ছানা প্রকাশ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। মুফাসসেরীনে কেরামও এরকম বর্ণনা করে থাকেন। তবে এরকম অর্থ করা যাবে না যে, হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে মেরাজের ঘটনা ব্যতীত অন্য সময়েও ভুল ও বিস্মৃতির আবির্ভাব হতো। যেমন হুজুর পাক (সঃ) এর খাতায়ে এজতেহাদী সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনো কোনো লোক মনে করে থাকে যে, হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যেও ভুল ও বিস্মৃতির উদ্ভব হওয়া বৈধ। যখন এরকম কোনো ভুলভ্রান্তি বা বিস্মৃতির আবির্ভাব ঘটতো, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিতেন এবং সঠিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। এই আয়াত সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ব্যাখ্যা ৮

উক্ত আয়াতের অর্থ এরকম হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে গোমরাহ্ কাওমের মধ্যে পেয়েছেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে তাদের গোমরাহী থেকে মাসুম রেখে ইমান, এরশাদ ও হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। আমাদের নিকট এরকম ব্যাখ্যাই পছন্দনীয়। কেননা হুজুর পাক (সঃ) যখন সেই গোমরাহ্ কাওমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং তাদের সোহবত এখতেয়ার করতেন, তখন বলা হতো এবং ধারণা করা হতো যে হুজুর পাক (সঃ) হয়তো উক্ত গোমরাহীর মধ্যে পতিত হয়ে গেছেন। মূর্খতা ও ক্ষতির ঘূর্ণাবর্তে ফেঁসে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেছেন বলে মনে করা হতো। যদি আল্লাহ্তায়ালার ইসমত ও হেফাযত স্থায়ী না হতো। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'আপনাকে ফেতনায় ফেলে দেয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলো।' এবং আল্লাহ্পাক আরও এরশাদ করেছেন, 'আপনি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলেন।' তিনি স্খলনের মধ্যে নিপতিত হননি, বরং তার আগেই আল্লাহ্পাক হেফাযত করে নিলেন এবং সেই অনুগ্রহ টুকুই মুবালাগার ভঙ্গিতে আয়াতের মধ্যে বিবৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ৯

কিতাবে এলাহীর যা কিছু হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে নাযিল করা হলো, তা বর্ণনা করতে তিনি হয়রান ছিলেন, আল্লাহ্ এরূপ অবস্থায় তাঁকে পেলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে তা বয়ান করার হেদায়েত প্রদান করলেন এবং বললেন, তা বয়ান করা আমার যিম্মায়। আরও বললেন আমি আপনার উপর যিকর বা নসীহ্ত বাণী নাযিল করেছি। এ ব্যাখ্যা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) থেকে সংকলিত।

ব্যাখ্যা (১০)

সাইয়্যেদুনা হজরত আলী মুর্তজা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) এরশাদ করেছেন, "আমি জীবনে দু'বার ব্যতীত কখনও জাহেলী যুগের কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগী হইনি। সে দু'বারের প্রত্যেক বারেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছেন। আর আমার ইসমত, আমার ও আমার ইচ্ছার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছিলো, এরপর জীবনে আর কখনও আমি ও ধরনের কাজের প্রতি আগ্রহ করিনি। এমনকি আল্লাহ্তায়ালা আমাকে রেসালতের মাধ্যমে ধন্য করেছেন।" তিনি বর্ণনা-করলেন, "একদা কুরাইশ বংশের এক গোলাম

আমার সঙ্গে মিলিত হলো। সে মক্কার বিভিন্ন পাহাড়ে আমার সঙ্গে বকরী চরাতো। আমি তাকে বললাম, তুমি যদি আমার বকরীগুলি একটু দেখাশোনা করতে তাহ্লে আমি মক্কায় যেয়ে একটু কিসসা কাহিনী শুনে আসতাম, যেমন মক্কার অন্যান্য যুবকেরা করে থাকে। আমি চারণভূমি থেকে বের হয়ে মক্কায় উপস্থিত হলাম এবং যে সমস্ত ঘরে কিস্সাকাহিনীর আসর জমে, তাদের কোনো একটি ঘরে পৌঁছলাম। সেখানে যেয়ে আমি দেখলাম, তারা গানবাজনা, নাচানাচি ও খেলতামাশা করছে। আমি সেখানে বসে গেলাম এবং তাদের আসর দেখতে লাগলাম।এরপর আল্লাহ্তায়ালা আমার উপর ঘুমের প্রাবল্য এনে দিলেন। সেখানে আমি ঘুমিয়েই রইলাম, যতক্ষণ না আমার মাথার উপর সূর্যের প্রখরতা অনুভব করলাম। দ্বিতীয় রাতেও এমন হলো। এরপর আর কোনোদিন আমি তাদের দিকে ধাবিত হইনি এবং কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছাও করিনি। এমন কি আল্লাহ্তায়ালা আমাকে রেসালত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। আয়াতের দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকই ভাল জানেন।

ভার সরিয়ে দেয়া

সন্দেহ দূর করার প্র প্রেক্ষিতে আরেকখানা আয়াতে কারীমার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন 'আমি আপনার ভার সরিয়ে দিয়েছি, যে ভার আপনার পৃষ্ঠদেশকে ভেঙে ফেলছিলো।—আয়াতে কারীমার প্রতি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, গোনাহের ভার যা কঠিন ছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর উপর তা আল্লাহ্ সরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি ফুকাহা, মুহাদ্দেছীন ও মুতাকাল্লেমীনগণের এক দল এরকম মত পোষণ করেন যে, আম্বিয়া কেরাম থেকে সগীরা গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তাঁরা এ আয়াত দ্বারাই দলীল দিয়ে থাকেন। কুরআন ও হাদীছের যাহেরী শব্দ সমূহকে যদি আবশ্যিক হিসাবে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে দলীল গ্রহণের উৎস হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে এ শব্দ কেনো এরকম আরও বহু শব্দ পাওয়া যাবে, যেগুলিকে কবীরা গোনাহ্ জায়েয হওয়ার দলীল রূপে দাঁড় করানো যাবে।

শুধু তাই নয়, আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ প্রকাশিত হওয়া জায়েয নয় বলে যে এজমা রয়েছে, তাও খন্ডন করা যাবে। কিন্তু এ মতকে কোনো মুসলমানই গ্রহণ করবেনা। সত্য কথা এই যে, জায়েয বলার পক্ষের যে দলটি যেসমস্ত আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে, ঐ সমস্ত শব্দের অর্থের ব্যাপারে মুফাসিরগণের মতানৈক্য রয়েছে।

আবার তাঁদের এসমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত ও সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে। আর এ দলটি যে সকল মতকে আবশ্যিক করে থাকে সলফে সালেহীনগণ তার প্রত্যেকটার বিপরীত মত পোষণ করেন। যেহেতু এদের মাযহাবের বিরুদ্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা যে মতের উপর একত্রিত হয়েছেন, সেগুলি মুহ্তামাল বা সম্ভাব্য এবং মুআব্বাল বা তাবীলকৃত। আর সলফে সালেহীনের সর্বসম্মতিক্রমে যে মতৈক্য সংগঠিত হয়েছে, তা এদের মতের বিপরীত্। এদের দৃষ্টিগ্রাহ্য শব্দ পরিত্যাজ্য হবে। বাহ্যিক অবস্থায় উপরোক্ত বক্তব্যকে বর্জন এবং প্রকৃত বুঝের দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য্য।

নিঃসন্দেহে উপরোল্লেখিত আয়াতে কারীমার তফসীরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। (১) এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো তফসীরকার বলেন যে, আয়াতে কারীমায় যে বোঝা বা ভারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর যে দায়িত্বের বোঝা ফেলে দেয়া হয়েছে, সে দ্বায়িত্বের পরিমাণের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা। আর সে বোঝা হালকা করা বা সরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্পাক তাঁকে ছবর ও রেযা (ধৈর্য ও সন্তুষ্টি) দান করেছেন। তবে এক্ষেত্রে নবুওয়াতের বোঝা হালকা করা—এ ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কেননা নবুওয়াতের আমরকে প্রতিষ্ঠিত করা, নবুওয়াতের মোজেজাতের হেফাযত করা, তার হকসমূহ আদায় করা ইত্যাদির কারণে হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র পৃষ্ঠদেশ ভারাক্রান্ত ছিলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সাহায্যসহায়তা করে তা তাঁর জন্য লাঘব করে দিলেন। শরহে ছদর দান করে দাওয়াতে খালকের (সৃষ্টির প্রতি আহ্বানকার্যের) সাথে হুযুরে হক অর্থাৎ হকতায়ালার উপস্থিতিকে সমন্বিত করে দিয়ে সে বোঝাকে তাঁর জন্য সহজ করে দিলেন বা বোঝা সরিয়ে দিলেন। আর শরহে ছদর এমন একটি উন্নত স্তর যার পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা কেবল হুজুর পাক (সঃ) এর জন্যই খাছ ছিলো। আর কারও তা নসীব হয়নি।

ক্ষমতাশালী কামেল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম যাঁরা, তাঁরা অবশ্য তাঁদের আপন আপন যোগ্যতা ও অনুভূতি অনুসারে হুজুর আকরম (সঃ) এর আনুগত্যের বরকতে উক্ত মাকামের কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। এজন্যই বলা হয় যে, সুফীগণ কায়েম ও স্থির। আর এ সুফীগণের 'জমা' এর মধ্যে 'ফরক' (ফরক বাদাল জমা) (একীভূতির পর পৃথক হয়ে যাওয়া) এসে কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। এ মাকামটি হাসিল হয় মাহ্জুব

(পর্দাচ্ছাদিত) গণের মধ্যে। আর মাজ্‌জুবগণের মধ্যে এ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। কেননা তাদের বেলায় একীভূত অবস্থা প্রবল থাকে।

(২) কেউ কেউ বলেন وزر 'বিযর' (বোঝা) দ্বারা ঐ সমস্ত অপছন্দনীয় কার্যকলাপকে বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে কুরাইশরা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নতকে পরিবর্তন করে তাকে বিকৃত অবস্থায় পালন করতো। অথচ সেগুলি হুজুর পাক (সঃ) সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কাছে এগুলি বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হতো, কিন্তু এগুলি প্রতিহত করার মতো কোনোরূপ শক্তিও তখন তাঁর ছিলো না। এমনকি এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে আবির্ভূত করলেন, রেসালত দান করলেন, আমর (আদেশ) ও তওফীক (ক্ষমতা) ইত্যাদি দান করে তাঁকে শক্তিশালী বানালেন এবং এরশাদ করলেন, আপনি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করুন। এরশাদে বারীতায়ালার মধ্যে যে اتبع 'ইত্তাবি' শব্দটি রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার তওফীক, সাহায্য ও শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শরীয়ত জারী করা এবং আমর ও আহ্‌কামে ইলাহীকে বাস্তবায়িত করা। মিল্লাতে ইব্রাহীম বা সুন্নাতে ইব্রাহীম যে উল্লেখ করা হয়েছে বয়ানে ওয়াকে এর পরিপ্রেক্ষিতে।

(৩) কেউ কেউ বলেন যে, ذنب وزر বিযর ও যামব এর অর্থ হচ্ছে হুজুর পাক (সঃ) এর ইসমত ও হেফাযত। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। তা হচ্ছে বিযর ও যামব এর সিফত বা বিশেষণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যা তাঁর পৃষ্ঠদেশকে ভেঙে ফেলে। কাজেই এখানে وضع وزر 'ওয়াযয়ে বিযর' অর্থাৎ বোঝা দূর করে দেয়া এটাকেই মাজাযী বা রূপকভাবে বলা হয় ইসমত। ইসমত এর অর্থ হচ্ছে বিযর ও যামব (বোঝা ও গোনাহ্‌) বিদ্যমান না থাকা। এরকমভাবে অন্য আয়াতে ইসমতের নাম রাখা হয়েছে مغفرت ذنوب 'মাগফেরাতে যনুব' (গোনাহ্‌ মাফ)। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) নবুওয়াতের পূর্বে এক বিয়ের ওলীমা অনুষ্ঠানে একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে গান হচ্ছিলো। দফ এবং অন্যান্য বাজনা হচ্ছিলো। সে সময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর উপর নিদ্রা প্রবল করে দিলেন। এভাবেই তিনি গান বাজনা শোনা থেকে মাহ্‌ফুজ বা সুরক্ষিত রয়ে গেলেন।

(৪) কেউ কেউ বলেন যে 'বিযর' এর অর্থ হচ্ছে হুজুর পাক (সঃ) এর চিন্তা ফিকির এবং শরীয়ত অন্বেষণের জন্য অস্থিরতার বোঝা। এই ভার ও বোঝাই তাঁর উপর ছিলো। অবশেষে আল্লাহ্‌তায়ালার শরীয়ত তাঁর কাছে

প্রকাশিত হলো এবং হকতায়ালা শরীয়ত বর্ণনা করে দিলেন। তাঁর পবিত্র পিঠ থেকে সে বোঝা এভাবে আল্লাহ্পাক সরিয়ে নিলেন।

(৫) কেউ কেউ বলেন যে, এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের আদেশ সমূহকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আসানী ও সহজসাধ্যতা প্রদান করা, যা হুজুর পাক (সঃ) থেকে কামনা করা হয়েছিলো। আর হেফয বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করাটা একটা বোঝা তুল্য এবং কঠিন কাজ। যা বহন করাটা স্বভাবতই কঠিন। এমনকি তা পৃষ্ঠকে ভেঙে ফেলার মতো কষ্টসাধ্য।

(৬) কেউ কেউ মনে করেন, হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াতের পর যে কার্যাবলীকে হারাম করে দেয়া হয়েছিলো, ঐগুলিকে তিনি নবুওয়াতের পূর্বে বোঝা তুল্য অনুভব করতেন এবং অন্তর থেকে সেগুলিকে অত্যন্ত কঠিন মনে করতেন। নবুওয়াতের পর হকতায়ালা সেগুলির বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিলেন। এমন ছোট ছোট কাজ যা নবুওয়াতের পূর্বে ঐ কাওমের কাছে বৈধ বলে পরিগণিত হতো, কিন্তু নবুওয়াতের পর তার বৈধতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি বরং সেগুলিকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বোঝা সরিয়ে দেয়ার অর্থ, ঐ সমস্ত কাজ।

(৭) একদল আলেম এই মতের দিকে গিয়েছেন এবং তাঁদের এই মতটা কতইনা চমৎকার যে, বোঝা মানে উম্মতের গোনাহের বোঝা যা রসূলে পাক (সঃ) এর পবিত্র হৃদয়ে বোঝাতুল্য ছিলো। সুতরাং উক্ত বোঝা সরিয়ে দেয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা তাদের গোনাহের কারণে এ পৃথিবীতে তাদেরকে আযাব ও গযব থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করে দিলেন। এমর্মে যেমন আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ্তায়ালা এমন নন যে, আপনি উম্মতের মধ্যে অবস্থান করছেন এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে আযাব প্রদান করবেন।—এটাতো হচ্ছে দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব না দেয়ার সম্পর্কে ঘোষণা। আর আখেরাতে তাদের ব্যাপারে শাফাআত কবুল করার ব্যাপারেও আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে এতো বেশী প্রদান করবেন যে, আপনি তখন খুশি হয়ে যাবেন।'—আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ ফরমান- 'আপনার কারণে আল্লাহ্তায়ালা (উম্মতের) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ্ মাফ করে দেবেন।' উপরোক্ত মতটির সপক্ষে উত্তম ও প্রসিদ্ধ প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াতে কারীমা। অবশ্য এই উলামায়ে কেরাম এর আরও বিভিন্ন রকম ভাবার্থ উপস্থাপন করে থাকেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের আয়াতে কুরআনীয়া ও হাদীছের আলোকে রসূল (সঃ) এর মর্যাদা নামক অনুচ্ছেদে।

কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য না করার মাসয়ালা

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'হে নবী! আপনি আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করবেন না।—আয়াতে কারীমা থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, যেনো রসূল (সঃ) এর মধ্যে তাকওয়াহীনতা রয়েছে। যেহেতু اتق الله 'ইত্তাকিল্লাহ্' বলে আদেশ করা হয়েছে। আবার কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য না করার কথা বলা হয়েছে। তা থেকে এরকম ধারণার সূত্রপাত হয় যে, হয়তো রসূলকরীম (সঃ). এর মধ্যে কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করার দুর্বলতা রয়েছে। না হয় لاتطع الكافرين والمنافقين 'লাতুতিইল কাফিরীনা ওয়াল মুনাফিকীন' বলা হতোনা। উক্ত দুটি আদেশ ও নিষেধ সূচক ক্রিয়াদৃষ্টে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, ঐ কাজ দুটি রসূলপাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আয়াতখানার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য দুটি উদাহরণ দেয়া হলো —যেমন উপবেশনকারীকে বলা হয়, বসে থাকো, আমি তোমাদের কাছে এখনই আসছি। অথবা কোনো নীরবতা অবলম্বনকারীকে বলা হয়, 'চুপ থাকো! আশা পুরা করে দেয়া হবে।' এখানে 'বসে থাকো' আর 'চুপ থাকো—দু'টি আদেশের মধ্যে দৃঢ়তা ও তাকীদ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেলো ব্যাপারটা এরকম নয় যে, রসূল কারীম (সঃ) এর মধ্যে তাকওয়াহীনতা ও কাফের মুনাফেকদের প্রতি আনুগত্য রয়েছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এর মর্যাদা সর্বদাই বর্ধিষ্ণু অবস্থায় থাকতো। এমনকি তাঁর পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মাজাজা ও তরক্কে আউলা এবং আফযলিওয়াতের হুকুম রাখতো। কাজেই তাঁর এলেম ও মর্তবা প্রতিনিয়তঃ উন্নততর ও বর্ধিষ্ণু অবস্থায় থাকতো। তাঁর তাকওয়া নিত্য সজীবতর ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করতো।

কেউ কেউ আবার এরকম বলেছেন, আয়াতের বাহ্যিক ভাবে হুজুর পাক (সঃ) কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর উম্মতকে। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে খবর রাখেন' আয়াতে 'তোমরা যা আমল করছো' বলা হয়েছে। 'তুমি যা আমল করছো' বলা হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আনুগত্য করবেন না। ('অর্থাৎ উম্মতেরা যেনো না করে)। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্র

হৃদয়কে দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে ও তাই সমস্ত লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার যে অসন্তুষ্টি রয়েছে তা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে তা বুঝানো হয়েছে। এটা বিলকুল প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট কথা। বিস্মিত হতে হয় ঐ সমস্ত নির্বোধদের প্রতি লক্ষ্য করে, যারা এ জাতীয় আয়াতকে শাব্দিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত করে নবীকরীম (সঃ) এর সম্মানের খর্বতা সৃষ্টি করে এবং তাঁর থেকে গোনাহ্‌ হওয়া সম্পর্কে অপবিত্র ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। অথচ তিনি এসমস্ত থেকে পবিত্র।

কুরআন অবতরণ সম্পর্কে সন্দেহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে

আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ, 'আমি আপনার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি, এ ব্যাপারে যদি আপনি কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী যারা কিতাব পাঠ করে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন। নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর তরফ থেকে আপনার কাছে কে এসেছে। আর আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আর আপনি কক্ষণও হবেন না ঐ লোকদের অন্তর্ভূত, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাহলে তো আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন।'

উক্ত আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে কাকে? এখানে সম্বোধিত ব্যক্তিটি কে? হুজুর পাক (সঃ) নাকি অন্য কেউ? এ নিয়ে মুফাসসেরীনে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যারা এরূপ বলেন যে, এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে হুজুর পাক (সঃ) কে, তাদের মতবিরোধের প্রেক্ষিত তিনটি। (১) সম্বোধন যদিও হুজুর পাক (সঃ) কে করা হয়েছে, তবে এদ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে উম্মতের দিকে। যেমন অন্য জায়গায় এরশাদ হয়েছে, 'যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে'—আবার আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন, 'তুমি কি বলেছো মানুষকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাকে মাবুদ বানিয়ে নাও?'

ভাষার মধ্যে এরকম অনেক কথাই থাকে। যেমন, কোনো বাদশাহ্‌ কোনো কাওমের কাছে গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং সে বাদশাহ এটা চান যে প্রজাবর্গের কাছে কোনো নির্দেশ জারী করবেন। তখন বাদশাহ্‌ সম্বোধন করলে জনগণকে সম্বোধন করে কিছু বলেন না। বরং তাঁর নিয়োজিত গভর্ণরকেই তিনি সম্বোধন করে থাকেন। এবং বাদশাহ্‌ গর্ভণরকে বলেন যে, এরকম করো অথবা এরকম করো না। যদি এরকম করো তাহলে আমি এরূপ করবো অথবা যদি এরকম না করো তাহলে আমি এরূপ আচরণ

করবো। বাহ্যতঃ বাদশাহ্‌তো সম্বোধন করে থাকেন গর্ভণরকে। কিন্তু বাদশাহ্‌র সম্বোধনের উদ্দেশ্য তো থাকে দেশের প্রজাবর্গ। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীগণকে কোনো সম্বোধন করে থাকলেও, তা প্রকৃতপক্ষে সে নবীর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়।

কুররা বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা খুব ভালোই জানেন তাঁর রসূল সন্দেহপোষণকারী হ্‌তে পারেন না। আর এটা কেমন করেই বা হ্‌তে পারে যে, ওহীর নূরানিয়াত সত্বেও রসূল (সঃ) সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করবেন? ব্যাপারটা এভাবে বুঝা সহজ হবে, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে বললো, তুমি যদি আমার সন্তান হও তাহ্‌লে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। অথবা কোন মনীব তার গোলামকে বললো যে, তুমি যদি আমার গোলাম হও তাহ্‌লে আমার আনুগত্য কর। এক্ষেত্রে পিতা ভালোভাবেই জানে যে, সে তার পুত্র। আবার মনীবও ভালোভাবেই জানে যে, সে তার গোলাম। তা সত্বেও সন্দেহযুক্ত বাক্য দ্বারা কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে সেটিও এ ধরনের বাক্য কোনো সন্দেহ নেই। এদ্বারা পুত্রকে বা গোলামকে ধমকের ভাব দেখানো হয়েছে।

(২) হকতায়ালা ভালোভাবেই জানেন যে, হুজুর পাক (সঃ) এর কোনোরূপ সন্দেহে নেই। তা সত্বেও সম্বোধনের ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরনের ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে কেনায়ার মাহাত্মকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম সম্বোধনের সম্বোধিত ব্যক্তি হুজুর পাক (সঃ), আর দ্বিতীয় সম্বোধনের সম্বোধিত ব্যক্তি তিনি ব্যতীত অন্য কেউ। ফাফহাম।

(৩) এক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে অন্তরের সংকীর্ণতা বুঝতে হবে। এ মর্মানুসারে আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আপনি যদি কাফেরদের আচরণের কারণে সংকীর্ণতায় পতিত হন। কেউ যদি আপনাকে কাফেরদের যন্ত্রণা দান ও দুশমনী করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং পূর্ববর্তী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন যে, পূর্ববর্তী নবীগণকে তাঁদের কাওমের লোকেরা কি রকম যন্ত্রণা প্রদান করেছে। আর সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা কিরকম ধৈর্য ধারণ করেছেন। আর এটাও জেনে নিন যে, ঐ সমস্ত কাফেরদের পরিণামই বা কি রকম হয়েছিলো। আর নবীগণের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার সহায়তা কিভাবে হয়েছিলো। আপনিতো সন্দেহের মধ্যে নেই, তবুও ধরে নেয়া হোক আপনি যদি পূর্ববতী ঘটনাবলী যা কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন,অথবা শয়তান যদি খেয়ালে কোন ত্রুটি ঢুকিয়ে

দিয়ে থাকে, তাহলে আপনি পূর্ববর্তী যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং যারা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করেছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন। কেননা কুরআনে পাকে বর্ণিত ঘটনাবলী তাদের কাছেও সুসাব্যস্ত। আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যে রকম বর্ণনা করা হয়েছে তাদের কিতাবেও ঐ রকমই বিবৃত রয়েছে। ঐগুলি থেকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা ও সাব্যস্ত করাই হলো আয়াত পাকের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু এই আয়াত দ্বারা এটা বুঝানোও উদ্দেশ্য যে, তাদের কিতাব সমূহে যা কিছু রয়েছে কুরআন মজীদ সেগুলিকে প্রত্যয়ন করতে কুণ্ঠিত নয়। সে সব সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীব (সঃ) এর জ্ঞান ও বিশ্বাসকে স্পষ্ট করেছেন—এটাও এ আয়াতের উদ্দেশ্য। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব—এটা বুঝানো আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। তাই তো এই আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার সময় হুজুর পাক (সঃ) বলতেন, আমার সন্দেহও নেই। আর আমি জিজ্ঞেসও করবো না।

হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম চোখের পলক পরিমাণও রসূলে খোদা (সঃ) এর সন্দেহ ছিলোনা। আর তাদের কারো কাছে তিনি কিছু জিজ্ঞেসও করেননি।

বান্দা মিসকীন অর্থাৎ শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) বলেন, যাহেরী অর্থ এখানে গ্রহণ করা হয়নি, যা তাসদীক ও একিনের পরিপন্থী। বরং সন্দেহ বলতে মুমায়ানা ও মুশাহাদার পর কলবে যে এতমিনান বা প্রশান্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে, তার পূর্বের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই হজরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) এর প্রশ্ন সংক্রান্ত যে হাদীছ সেখানে সাওয়ালের ক্ষেত্রে 'সন্দেহ' শব্দ নেয়া হয়েছে। কেননা তিনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রভু হে! তুমি মৃতকে কীভাবে জীবনদান করো আমাকে দেখাও, এক্ষেত্রে অত্যধিক বিনয় প্রকাশার্থে এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মর্যাদাকে অধিক সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে হুজুর পাক (সঃ) বললেন, আমি তো তাঁর চেয়ে সন্দেহ পোষণ করার অধিকতর দাবীদার।

হুজুর আকরম (সঃ) সূরা সাব্বিহিসমি রব্বিকাল আ'লা তেলাওয়াত করাকে বেশী পছন্দ করতেন এ কারণে যে এ সূরায় রয়েছে, নিশ্চয় এ কুরআনের কথা রয়েছে পূর্ববর্তী সহীফা সমূহে, ইব্রাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ) এর সহীফা সমূহে।

আর দাজ্জাল সম্পর্কে হজরত তামীম দারী (রাঃ) যে তথ্য দিয়েছেন তা ঐ এরশাদেরই অনুকূল যা হুজুর পাক (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে

জানিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তাও অই অর্থেই, মোজেযা প্রকাশিত হওয়ার পর যে হুজুর (সঃ) বলেছিলেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহ্‌র রসূল।-তাও উপরোক্ত তাবীল অনুসারেই বুঝে নিতে হবে। যারা বলে থাকেন যে لئن اشركت 'লাইন আশরাকতা' আয়াতে হুজুর পাক (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়নি। বরং প্রত্যেক শ্রোতাই এখানে সম্বোধিত। ঠিক ঐ রকমই فان كنت فى شك 'ফাইন কুন্তা ফী শাককিন' আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে শ্রোতাদেরকেই। রসূল কারীম (সঃ) কে নয়।

কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এরকম—রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সময়ে তিন শ্রেণীর লোক ছিলো। (১) মুসাদ্দেকীন (২) মুকায্যেবীন ও (৩) মুনাফেকীন অথবা মুতাওয়াফফেকীন। তৃতীয় প্রকারের ব্যক্তিরাই হুজুর পাক (সঃ) এর কার্যকলাপের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতো। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ক্রিয়ার একবচনের রূপ যা 'আমি' বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা দ্বারা সম্বোধন করলেন। এবং বললেন হে মুতাওয়াফ্‌ফেক অর্থাৎ সন্দেহে নিপতিত! তুমি যদি সন্দেহের বেড়াজালে আটকে পড়ে থাকো আমার নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে প্রেরণ করা সম্পর্কে অথবা তাঁর আনীত দ্বীন সম্পর্কে, তাহলে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তাহলেই তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে রাস্তা পেয়ে যাবে এবং উম্মতের কল্যাণার্থেই যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ পেয়ে যাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তো এব্যাপারে বলেছেন, আমি তোমাদের কছে সুস্পষ্ট নূর প্রেরণ করেছি।

হকতায়ালা যখন তাদের জন্য ঐ সমস্ত বস্তুর আলোচনা করলেন, যা তাদের সন্দেহকে দূর করে দেয়, তখন রসূলকরীম (সঃ) তাদেরকে এই মর্মে ভয় প্রদর্শন করলেন যে, যখন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায় তখনও যদি তোমরা উপরোক্ত সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকো, তবে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মুকাযযেবীন এর অন্তর্ভুত হয়ে যাবে। সুতরাং সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করলেন, এখন আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুত হয়োনা, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে।' আল্লাহ্‌তায়ালা আরও এরশাদ করেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা ভালো করেই জানে যে, এটা আপনার প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ। কাজেই আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'

মর্মার্থ এই যে, আহলে কিতাবরা জানে, আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে নবী ও রসূলগণ আগমন করে থাকেন এবং তাঁদের উপর কিতাবও অবতীর্ণ

হয়। অথবা উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এরকম হতে পারে— এখানে এই বাক্যটি উহ্য আছে 'হে মোহাম্মদ (সঃ) যারা মিথ্যা অপবাদ দেয়, আপনি তাদেরকে বলুন, কক্ষণও তোমরা সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' 'সুতরাং এখানে রসূল (সঃ) কে সম্বোধন করেন নি, বরং কাফেরদের সম্বোধন করার জন্য রসূল (সঃ)কে উপলক্ষ্য করেছেন। সম্বোধন যে রসূলের প্রতি নয় তার সহায়ক একটি দলীল রয়েছে এই আয়াতে, হে রসূল (সঃ)। আপনি বলে দিন যে, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাকো ---- ।

হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি জেহেলের সম্বোধন করা

আল্লাহ্তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে হেদায়েতের উপরে একত্রিত করে দিতে পারেন। কাজেই আপনি কক্ষণও অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। কাযী আয়ায (রঃ) বলেন "আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হেদায়েতের উপর এনে দিতে পারেন, এ সত্যটি সম্পর্কে আপনি জাহেল হবেন না" আয়াতখানার অর্থ কিন্তু এরকম নয়। কেননা এরকম অর্থ করলে আল্লাহ্তায়ালার সিফত সমূহের মধ্যে জেহেল (অজ্ঞতা) গুণটি সাব্যস্ত করা হয়। আর আল্লাহ্তায়ালার সিফতসমূহের মধ্যে অথবা নবীগণের মধ্যে অজ্ঞতা' সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। অথবা ব্যাখ্যাটি এরকম হতে পারে যে, আয়াতের দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) কে নসীহত করাই উদ্দেশ্য। যেনো তাঁর কার্যাবলীতে জাহেলদের অনুকূল পদ্ধতি অনুসৃত না হয়। তাঁর মধ্যে মূর্খতা বিদ্যমান এরকম প্রমাণ আয়াতের মধ্যে নেই যে, একারণে আল্লাহ্পাক তাঁকে নিষেধ করছেন। বরং কওমের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে তিনি যেনো ধৈর্য ধারণ করেন, এব্যাপারে তাঁকে হুকুম করা হয়েছে। এ শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রদান করেছেন আবুবকর ইবন ফুরক (রঃ)।

কেউ কেউ বলেন, অর্থগতভাবে এ সম্বোধনটি উম্মতকে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। এ ধরনের ব্যাখ্যা অন্যান্য স্থানেও দেয়া হয়েছে। আর এরূপ দৃষ্টান্ত কুরআনে মজীদে অনেক আছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথার আনুগত্য করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে দিবে। —এই আয়াতে রসূলপাক (সঃ) কে সম্বোধন করা হয় নাই বরং অন্যান্যদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে বুঝতে হবে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করো তাহলে এ

বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ রয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে আপনার অন্তরে মহর মেরে দিতেন। আর যদি আপনি কোনো শেরেক করতেন, তাহলে অবশ্য আপনার আমল বাতিল হয়ে যেতো। —এ জাতীয় যতো আয়াত রয়েছে তার কোনোটিতেই হুজুর পাক (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে অন্যদেরকে।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে যে কোনোরকম আদেশ নিষেধ করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তা হুজুর পাক (সঃ) থেকে প্রকাশিত হওয়া বা সংঘটিত হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, যাঁরা তাদের প্রভুর ইবাদত করে, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। অথচ হুজুর পাক (সঃ) কখনও এজাতীয় লোককে তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন না বা নিজের সম্মুখ থেকে তাড়িয়েও দিতেন না। কেননা তিনিতো অত্যাচারী ছিলেন না। আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন, 'পূর্বে নিশ্চয়ই আপনি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।' এ আয়াতের অর্থ এই যে, হুজুর পাক (সঃ) হকতায়ালার আয়াত সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনবহিত ছিলেন। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্য এই যে, হজরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা অবহিত করার পূর্বে আল্লাহ্পাকের হাবীব (সঃ) এ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। সে কারণেই উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অন্তঃকরণে কোনোরূপ খেয়ালের উদয় হয়নি। স্বকর্ণে উক্ত ঘটনা তিনি শ্রবণও করেন নি এবং স্বয়ং তিনি সে সম্পর্কে অবহিত হতেও পারেন নি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ, শয়তানের দিক থেকে যদি কোনো অসৎ মন্ত্রণা আপনার কাছে, আসে তাহলে আপনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন। বাহ্যিকভাবে আয়াত দৃষ্টে মনে হয় যেনো, হুজুর পাক (সঃ) কে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে সক্ষম। বস্তুতঃ শয়তানের কুমন্ত্রণা হুজুর পাক (সঃ) এর জন্য নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শয়তানের ইচ্ছা এবং এরাদা এই যে, সে হুজুর পাক (সঃ) কে কুমন্ত্রণা দিতে চায়। কিন্তু সে এ ব্যাপারে অক্ষম। কেননা আল্লাহ্তায়ালা হুজুরপাক (সঃ) কে এ বিষয়ে নিরাপদ রেখেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হে রসূল! আপনার যদি কারও উপর রাগ আসে তখন আপনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে নিরাপত্তা চাইবেন। তাহলে আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে নিজ আশ্রয়ে রাখবেন। ওয়াস্ওয়াসা বা প্ররোচিত করা হচ্ছে শয়তানের সবচেয়ে নিম্নমানের তৎপরতা। যুজাজ (রঃ) এরকম

বলেছেন। জানা গেছে যে, হক্তায়ালা তাঁর হাবীব (সঃ) কে হুকুম করেছেন, আপনার যদি কখনও কোনো দুশমনের উপর রাগ আসে অথবা শয়তান আপনাকে সীমালংঘন করানোর ইচ্ছা করতে উদ্যত হয় অথবা অন্তরে কোনোরূপ মন্ত্রণা প্রক্ষেপের চেষ্টা করে— তখন আপনি হক্তায়ালার কাছে পানাহ্ চাইবেন। তিনি আপনাকে তার ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখবেন। এটা আপনার পবিত্রতার পূর্ণতার জন্যই। এ কারণেই হক্তায়ালা শয়তানকে হুজুরপাক (সঃ) এর উপর প্রবল হওয়ার শক্তি প্রদান করেন নি। ব্যাখ্যাটি নিম্নোক্ত আয়াতের ভাব প্রকাশ করছে—

যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'আমার বান্দাগণের মধ্যে এমনও বান্দা আছে, যাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।' আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ ফরমান, 'নিশ্চয় যাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁদের মধ্যে যখন শয়তানী খেয়াল উদয় হয় তখন তাঁরা হুঁশিয়ার হয়ে যায়, অতঃপর অকস্মাৎ তাঁদের দিব্যচক্ষু খুলে যায়।' এ আয়াতের মতলবও পূর্বের ব্যাখ্যার অনুরূপ বুঝতে হবে। তবে আল্লাহ্তায়ালার বাণী 'কিন্তু শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে'—এ আয়াতের অর্থ পূর্বের মতো হবেনা। কেননা 'বিস্মৃতি' আর এর বিধান এক নয়। এটা মোটেই ঠিক নয় যে, শয়তান কোনো ফেরেশতার আকৃতি ধরে এসে নবীকে ধোঁকায় নিপতিত করবে। নবুওয়াতের পূর্বেই হোক বা পরে। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা, রসূল (সঃ) কে সত্য প্রকাশের উপর কায়েম রাখবেন। সুতরাং নবী (সঃ) এর কাছে যিনি আসবেন, তিনি অবশ্যই ফেরেশতা এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত কোনো না কোনো দূত হবেন। এর অন্যথা হওয়ার উপায় নেই। এর পরিপূর্ণ আলোচনা 'ওহীর প্রারম্ভ' এর বর্ণনায় মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ্। আপনার প্রভুর বাক্য সত্য ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ, তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই।'

তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ

আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ, আমি আপনার পূর্বে যতো রসূল বা নবী প্রেরণ করেছি সবার বেলায় এটা ঘটেছে যে, যখন তাঁরা কিছু পাঠ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তাঁদের পাঠের সঙ্গে শয়তান কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। এ আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে জমহুরে মুফাসসেরীনের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে এই যে, تمنى 'তামান্না' এর অর্থ তেলাওয়াত করা আর القاء شيطان 'এলাকায়ে শয়তান' (শয়তানের কিছু সংযোজন) এর অর্থ তেলাওয়াতকারীর অন্তরে দুনিয়াবী কথা স্মরণ করে দেয়া এবং তা স্মৃতির মধ্যে আবর্তিত করতে থাকা যাতে তেলাওয়াতকারীর চিন্তা ও

তেলাওয়াতের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ভুল হয়ে যায়। অথবা তাঁর ধারণায় পরিবর্তন এনে দেয় বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা স্মৃতিতে ঢুকিয়ে দেয়। তবে আল্লাহ্তায়ালা সেগুলি দূর করে দেন বা রহিত করে দেন। সন্দেহ ও বিভ্রান্তি অপনোদন করে দেন। আয়াতে ইলাহিয়াকে সুদৃঢ় ও মযবুত করে দেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকম বলা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসেরীনে কেরামের বহু আলোচনা রয়েছে। যার অংশবিশেষ শেফা নামক কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

লাইলাতুত্তারিস এ হুজুর পাক (সঃ) এক উপত্যকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। লাইলাতুত্তারীসের ঘটনা যেখানে ঘটেছিলো সেটি ছিলো একটি উপত্যকা। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার নাম হয়েছিলো লাইলাতুত্তারীসের উপত্যকা। এটা ছিলো শয়তানের নিবাস। হুজুর পাক (সঃ) এর বর্ণনায় কি এটা পাওয়া যায় যে, শয়তান তাঁর উপর প্রবল হয়ে গিয়েছিলো? বা তাঁর উপর ওয়াসওয়াসা ঢেলে দিয়েছিলো! এটা যদি সম্ভব বলে ধরা হয়, তবে তা হয়তো হজরত বেলাল (রাঃ) এর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা হুজুর পাক (সঃ) ফজরের নামাজের হেফাযতের জন্য হজরত বেলাল (রাঃ) কে নিয়োজিত করে রেখে ছিলেন। শয়তান এসে হজরত বেলাল (রাঃ) কে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলো। যার বিস্তারিত বর্ণনা লাইলাতুত্তারীস নামের হাদীছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অন্ধ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মকতুমের ঘটনা

আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ, তিনি বিরক্ত বোধ করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন এজন্য যে, তাঁর কাছে একজন অন্ধ এসেছে। আয়াতে কারীমার প্রকাশ্য অর্থ থেকে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, যে সময় অন্ধ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ) সত্য অনুসন্ধানের মানসে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে সময় হুজুর পাক (সঃ) তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং বিমুখ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে যারা বদলোক, কাফের তাঁর সামনে উপবিষ্ট ছিলো, তিনি তাদের প্রতি মনযোগী ছিলেন, তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হুজুর পাক (সঃ) এর এই আচরণ অপরাধ বলে প্রমাণিত হয়। তাই হকতায়ালা তাঁর নিন্দা করলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আয়াত নাযিল করলেন। তফসীরের কিতাবসমূহে এই সূরার শানে নযুল এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন দেখা যাক, এদ্বারা বাস্তবিকই হুজুর পাক (সঃ) অপরাধী সাব্যস্ত হন কিনা। এখানে অপরাধ হওয়াটা ধারণা মাত্র। তবে বাহ্যিকভাবে তরকে আউলা (উত্তম অবস্থা বর্জন) বলা যেতে পারে। তদুপরি উপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের অবস্থা সম্পর্কে যদি তাঁর জানা থাকতো তবে হয়তো অন্ধ সাহাবীকেই সামনে এনে বসাতেন। কাফেরদ্বয়ের প্রতি তিনি যে গুরত্ব প্রদান করছিলেন, সেটা প্রকৃত আনুগত্য, শরীয়তের নির্দেশনা প্রচার, তালীফে কুলুব (অন্তর জয় করা), ইমান প্রতিষ্ঠার আকাংখা ও পথ প্রদর্শনের উদগ্র বাসনারই বহিঃপ্রকাশ ছিলো। কেননা তাঁর নবুওয়াতের মূল উদ্দেশ্য তো এ–ই ছিলো। গোনাহ্ ও দ্বীনের কাজের বিরুদ্ধাচরণ উদ্দেশ্য ছিলো না।

হক সুবহানাহুতায়ালা যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর হাবীব (সঃ) এর প্রতি যে একটুখানি অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিলো নসীহত প্রদান করা। এবং এদ্বারা এটাই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, দ্বীনের প্রতি আহ্বান ও দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে আপনার সুগভীর মনোযোগিতা যেনো ঐ পর্যায়ে না পৌছে যায় যার ফলে কোনো মুসলমান আপনার মনোযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সংবাদ পৌছানো এবং হুঁশিয়ার করাই এ মুহূর্তের জন্য যথেষ্ট। রসূলের দায়িত্বই তো পৌছে দেয়া। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে হজরত ইবন মাকতুমই ধমক আদবের যোগ্য। কেননা যদিও তিনি অন্ধত্বের কারণে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তথাপিও কাফেরদের সঙ্গে হুজুর (সঃ) এর যে কথোপকথন চলছিলো, তাতো তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। আর এটাও তাঁর খুব ভালোভাবেই জানা ছিলো যে দাওয়াত ও দ্বীনের প্রচারের প্রতি হুজুর আকরম (সঃ) কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন এবং একাজে তিনি কতটুকু নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। কথার উপর কথা বলার কারণে হুজুর পাক (সঃ) এর কথায় ছেদ পড়েছিলো এবং মজলিশে এক ধরনের কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছিলো। এ অবস্থা হুজুর পাক (সঃ) কে যন্ত্রণা দিয়েছিলো। আর হুজুর (সঃ) কে যন্ত্রণা দেয়াটাতো বহুত বড় গোনাহ্।

অতএব বুঝা গেলো যে, এই আয়াতে কারীমা নাযিলের মাধ্যমে হজরত ইবন মাকতুমকেই প্রকৃতপক্ষে ধমক দেয়া হয়েছে। যেমন আয়াত নাযিল হয়েছিলো হুজুর পাক (সঃ) এর হুজরা শরীফের পিছনে সজোরে ডাকাডাকি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এখানে তাঁদেরকে আয়াত নাযিলের মাধ্যমে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে শাসানো হয়েছে। তবে হজরত উম্মে মাকতুমের বেলায় অন্ধত্বের কারণে তাকে ‘অক্ষম’ হিসাবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। নম্রতা ও মেহেরবাণী প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আলাম।

মুনাফেকদেরকে অনুমতি প্রদান

আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ, 'আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন। আপনি কেনো তাদেরকে এজাযত প্রদান করলেন? এই আয়াতের মাধ্যমেও হুজুর পাক (সঃ) থেকে গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা 'ক্ষমা' শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, গোনাহ্ অবশ্যই হয়েছে। আবার (কেনো আপনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েদিলেন?) এই প্রশ্নের অর্থ এস্তেফহামে এনকারী। অর্থাৎ অনুমতি দেয়াটা উচিত হয়নি। সুতরাং মুনাফেকদেরকে অনুমতি প্রদান করাটা মুনকাবে বা অপছন্দনীয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত, যদিও রসূলে পাক (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা সান্ত্বনা বুঝাবার জন্য 'আফ' কে 'এনকারেইযন' এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। অপছন্দনীয়তা প্রকাশের পূর্বেই ক্ষমা প্রদর্শন অত্যন্ত প্রিয় ও দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। যা মহব্বত ও অনুগ্রহের ইঙ্গিত। ঐ দল বলে থাকে যে, রসূলপাক (সঃ) জীবনে দু'টি কাজ এমন করেছেন, যার হুকুম আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পূর্বে প্রদান করেননি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হুজুর পাক (সঃ) বদরের যুদ্ধ বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর অপরটি হচ্ছে মুনাফেকদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে সৃষ্ট সন্দেহের জবাব এই—'আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন' এরূপ কথা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার পর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ নয়। এখানে এ বাক্যটি হুজুর পাক (সঃ) এর মর্যাদা ও সম্মানের গুরুত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে। যেমন কোনো ব্যক্তি তার একজন সম্মানিত বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন, তুমি আমার ব্যাপারে কি করলে? আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হোন, তুমি আমার কথার কি উত্তর দিলে? আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি আমার অধিকার সম্পর্কে অবহিত হও ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের কথার দ্বারা বন্ধুর সম্মানের অতিরিক্ততা বুঝানো ছাড়া আর অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে না।

এ কথার উদ্দেশ্য বন্ধুর অন্যায় ও ত্রুটি সাব্যস্ত করা নয়। আরেকটি কথা এই যে, আল্লাহ্ এখানে غفر الله 'গফারাল্লাহু' বাক্য ব্যবহার করেননি। কেননা غفر 'গফারু' শব্দ বিরূপ মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য হয়। বিরুদ্ধবাদীরা যে অর্থ গ্রহণ করেছে ঐরূপ অর্থ বুঝানোর উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। হাদীছ শরীফেও এ ধরনের শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্য ঘোড়া ও

গোলামের যাকাত মাফ করে দিয়েছেন। —অথচ ব্যাপার এমন নয় যে, ঘোড়া এবং গোলামের যাকাত পূর্ব থেকেই ওয়াজেব ছিলো।

ইমাম কুশাইরী (রঃ) বলেন, যারা একরম বলে যে গোনাহ্র পূর্বে মাফ করার কথা আসতেই পারে না, তারা আরবী ভাষার রীতি সম্বন্ধেই অজ্ঞ। তারা বলে যে, عفا الله عنك 'আফাল্লাহু আনকা' এর অর্থ হচ্ছে لم يلزم لك ذنب 'লাম ইয়ালযিম লাকা যামবুন' অর্থাৎ আপনার উপর গোনাহ্র কোনো বৈধতা নেই। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এরকম বলা হয়েছে। এখন অনুমতি দেয়া উচিৎ হয়নি, এই কথায় আসা যাক। তারা বলে যে, এনকার ও এতাব (শাসানো) এটা উত্তম আচরণ পরিহার করার জন্য করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে কেউ কেউ এরকম বলেছেন যে, হকতায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর মুনাফেকদেরকে অনুমতি প্রদানের ব্যাপারটা রুখসত দান করেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তারা যদি কারো ব্যাপার সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু অনুমতি চায়, তবে আপনি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা অনুমোদন দিতে পারেন। —দেখা গেলো যে, আল্লাহ্তায়ালা অনুমতি প্রদান করাকে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে ছেড়ে দিয়ে একটা সাধারণ হুকুম দিয়েদিলেন, যা তাঁর আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, কিতাবে 'তফতুনিয়া' নামক কিতাব থেকে এরকম উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে যে, এক জামাত এরকম মত পোষণ করে যে, এক্ষেত্রে হুজুরে পাক (সঃ) কে শাসানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। এরূপ কক্ষণও হতে পারে না। বরং হুজুর পাক (সঃ) এক্ষেত্রে মোখতার অর্থাৎ তাঁকে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে অনুমতি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে। হুজুর পাক (সঃ) তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জানালেন যে, আপনি যদি তাদেরকে অনুমতি না—ও দিতেন তবুও তারা তাদের মুনাফেকীর কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতো। 'আপনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন' বলে কোনো অভিযোগ এখানে নেই।

মুনাফেকদের প্রতি মনের টান

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি যদি আপনাকে সুদৃঢ় না রাখতাম তাহলে আপনি তাদের প্রতি সামান্য ঝুঁকে পড়তেন। আর এজন্য আপনাকে আমি জীবনের ও মৃত্যুর দ্বিগুণ স্বাদ গ্রহণ করাতাম। —এই আয়াতখানার প্রকাশ্য অর্থ এই যে, মুনাফেকদের প্রতি হুজুর আকরম (সঃ)

এর মনের টান হয়ে গিয়েছিলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কঠিন আযাবের উপযোগী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে হেফাযত করেছেন এজন্য তিনি তাদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রয়েছেন। এটা খারাপ একটা ধারণা। এরকম ধারণা সর্বদাই পরিত্যাজ্য। আয়াতখানার প্রকৃত অর্থ হবে এরকম, আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে যদি হুজুর পাক (সঃ) এর ছাবেতে কওমী ও ইসমত না থাকতো, তাহলে তাদের নিকটত্বের দিকে, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি তিনি ঝুঁকে পড়তেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্পাকের ইসমত হুজুর পাক (সঃ) এর সঙ্গে ছিলো। এজন্য ইসমত তাঁকে মুনাফেকদের প্রতি ঝুকে পড়া থেকে বিরত রেখেছে।

এখানে একথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, হুজুর পাক (সঃ) তাদের সে প্রবৃত্তিপরায়ণতা গ্রহণ করার ইচ্ছাও করেন নি। আম্বিয়া কেরামগণ থেকে গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে। শরয়ীভাবেই হোক বা আকলের দিকে থেকেই হোক, কোনোক্রমেই গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার সম্পর্ক আম্বিয়া কেরামের দিকে সংযুক্ত করা জায়েয নয়। কেননা ইসমত হচ্ছে আল্লাহ্পাকের হেফাজত আর ইসমত এখতিয়ারকে বাতিল করেনা। নবীগণ দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়াতে প্রতিবন্ধক হয় ইসমতে এলাহী। কাজেই সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, সমস্ত নবীগণ মাসুম এবং হুজুর পাক (সঃ) কে ও আল্লাহ্পাক এর উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। বরং আয়াত দ্বারা হুজুর পাক (সঃ) পরিপূর্ণ পবিত্রতার গুরুত্বই বুঝানো হয়েছে। এবং এটাও বুঝানো হয়েছে যে, তার সাথে হেফাযতে ইলাহী, ইসমত ও মহব্বত ছিলো। এ আয়াত দ্বারা কোনোরূপ ধমক, কঠোরতা, তিরস্কার করা বুঝানো হয়নি।

বদরের বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ

বদরের যুদ্ধবন্দীদের থেকে ফিদয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, কোনো নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাঁরা কোনো কাফেরকে জীবিত কয়েদ করবেন, যতক্ষণ না যমীনে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা হবে। তোমরা দুনিয়ার মাল চাও, অথচ আল্লাহ্তায়ালা চান আখেরাত। আল্লাহ্তায়ালা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। আর আল্লাহ্তায়ালা যদি একটি কথা লিখে না রাখতেন, তাহলে তোমরা কাফেরদের থেকে যে মাল গ্রহণ করলে সেজন্য আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি দান করতেন।

এই আয়াতখানাকেও একদল লোক হুজুর পাক (সঃ) এর উপর আল্লাহ্‌তায়ালার তিরস্কার বলে সাব্যস্ত করে থাকে। ঘটনা হলো, হুজুর পাক (সঃ) সাইয়্যেদুনা হ্‌জরত আবুবকর (রাঃ) এর পরামর্শক্রমে বদরের বন্দীদের থেকে ফিদয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। হ্‌জরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর পরামর্শ ছিলো তাদেরকে কতল করার। কিন্তু হুজুরপাক (সঃ) তা গ্রহণ করেননি। এটা ছিলো তাঁদের নিজস্ব এজতেহাদ। আর এজতেহাদ ভুল প্রমাণিত হলেও শরীয়তবিরুদ্ধ নয়। তবে এজতেহাদী ভুলের উপর কোনো নবীর স্থির থাকাটা বৈধ নয়। উছুলে ফেকার মধ্যে এরকমই বিধান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হ্‌জরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের জন্য পরাজয় এনে দিলেন। কাফেরদের সত্তুর জন মারা গেলো এবং সত্তুর জনকে বন্দী করা হলো। তখন হুজুর আকরম (সঃ) এ সমস্ত কয়েদীদের সম্পর্কে হ্‌জরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হ্‌জরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হ্‌জরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যে, কয়েদীরা তো আমাদেরই চাচাদের সন্তান। এরা আমাদের ভাই, আমাদের কবীলার লোক। এদের সম্পর্কে আমার রায় এটাই যে, এদের থেকে ফিদইয়া গ্রহণ করা হোক। তাতে আমাদের যে সম্পদ আমদানী হবে, তার মাধ্যমে আমরা অন্যত্র কাফেরদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবো। আবার এদের ব্যাপারে আশাও করা যায়, আল্লাহ্‌পাক যদি হেদায়েত দান করেন, তাহলে একদিন তো এরাও আমাদের সার্বিক শক্তির অংশবিশেষ হতে পারবে। হ্‌জরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, রসূলপাক (সঃ) এরপর আমার মতামত চাইলেন। বললেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব—এসম্পর্কে তোমার মত কি? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মত হ্‌জরত আবু বকরের মতের অনুরূপ নয়। আমার মত এই যে, এদেরকে হত্যা করা হোক। এবং এমর্মে আমি আরও বলতে চাই যে, অমুককে আমার হাতে তুলে দেয়া হোক, যেনো স্বহস্তে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। (তখন হ্‌জরত ওমর তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি ইশারা করেছিলেন) আর হ্‌জরত আলীকে হুকুম করা হোক, সে যেনো তার ভাই আকীলকে হত্যা করে।হ্‌জরত হামযা (রাঃ) কে হুকুম দেয়া হোক, তিনি যেনো তাঁর অমুক প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করে। যাতে আল্লাহ্ আল্লামুল গয়ুব জেনে নিতে পারেন, আমাদের অন্তর কাফের মুশরেকদের ভালোবাসা-বন্ধুত্ব থেকে পবিত্র। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) এর

নিকট হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অভিমতই পছন্দ হলো এবং তিনি তাই গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় দিন যখন আমি হুজুর পাক (সঃ) এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন দেখলাম হুজুর পাক (সঃ) এবং তাঁর কাছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বসে আছেন। উভয়ই ক্রন্দনরত অবস্থায় আছেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)। বলুন, কোন বস্তু আপনাদেরকে ক্রন্দন করালো? কেননা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমিও আপনাদের সাথে কাঁদবো। আর তা না হলে জোর করে হলেও ক্রন্দন করার চেষ্টা করবো। তখন হুজুর পাক (সঃ) বললেন, তোমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার ব্যাপারে। তখন হুজুর পাক (সঃ) নিকটস্থ একটি বৃক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন যে, নিঃসন্দেহে ঐ বৃক্ষের চেয়েও কাছে এর আযাব রয়েছে। ঐ সময়ই আল্লাহ্পাক এই আয়াত নাযিল করলেন, কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয় যে, কোনো কাফেরকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করবে, যতক্ষণ না যমীনে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা হয়। اثخان 'এছখান' এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত করা, কোনো জিনিসের মধ্যে আধিক্য করা। এইস্থানে তার অর্থ হবে হত্যা করা এবং যখম করা। ভাবার্থ এই যে, নবীর জন্য উচিত যখন তাঁর কাছে কোনো বন্দীকে আনা হয়, তখন তাকে হত্যা করে ফেলা। এবং এই হত্যার মধ্যে মুবালাগা বা আধিক্য করতে হবে, যাতে কুফুরী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রবল হয়।

তোমরা দুনিয়ার মালমাত্তা চাও, অথচ আল্লাহ্পাক চান আখেরাত'— এই আয়াতের ভাঁবার্থ এই যে, তোমরা দুনিয়ার মাল ও গনীমত ইত্যাদির আকাঙক্ষা করছো। অথচ আল্লাহ্পাক চাচ্ছেন আখেরাতের কামিয়াবী। এর মাধ্যমেই (হত্যার মাধ্যমে) দ্বীন ইসলামের শক্তি সূচিত হবে এবং আখেরাতের ছওয়াব এর উপর ভিত্তি করেই প্রদান করা হবে।

আল্লাহ্তায়ালা যদি পূর্বে একটি কথা না লিখে রাখতেন, তাহলে হে মুসলমানগণ। তোমরা যে মুক্তিপণ হিসাবে কাফেরদের মাল গ্রহণ করেছো, এর জন্য তোমাদেরকে আযাব প্রদান করা হতো।' এই আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্তায়ালার বিধান যদি এমন না হতো যে, এজতেহাদের ভুলের কারণে কোনোরূপ ধরপাকড় নেই, তাহলে এইসময় তোমরা কাফেরদের নিকট থেকে যে সম্পদ গ্রহণ করেছো সেজন্য তোমাদেরকে আযাব দেয়া হতো। এক হাদীছে এ রকম বর্ণিত হয়েছে, এর জন্য যদি আযাব দেয়া হতো, তাহলে কেবলমাত্র ওমর ছাড়া আর কেউ এ থেকে রেহাই পেতো না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ দলের লোকগুলি বলে থাকে যে, হুজুর পাক (সঃ) কে আযাব ও তিরস্কারের ধমক দেয়া হয়েছে এই আয়াতের

মাধ্যমে। তাদের বক্তব্যের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবের লিখক বলেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর পাক (সঃ) এর উপর কোনো গোনাহ্‌র বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।।

—বরং আয়াতে ঐ জিনিসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা অন্যান্য সমস্ত নবীগণের কাউকেই প্রদান করা হয়নি। বিশেষ করে হুজুর পাক (সঃ) কে—ই প্রদান করা হয়েছে। হুজুর পাক (সঃ) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর জন্য গনীমতের মাল বৈধ ছিলোনা। যেমন রসূলপাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, আমার জন্য গনীমতসমূহ হালাল করে দেয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে এ-ও বলা যেতে পারে যে, এ হুকুম হুজুর পাক (সঃ) ছাড়া সমস্ত নবীগণের জন্য প্রযোজ্য। তবে হুজুর পাক (সঃ) এর জন্য এটা বৈধ যে, তিনি তাদেরকে হত্যা না করে, তাদের কাছ থেকে ফিদয়া গ্রহণ করতে পারেন। আর ফিদয়া গনীমতেরই একটা প্রকার। আয়াতের একাংশে বলা হয়েছে, 'তোমরা দুনিয়ার ধন সম্পদ গ্রহণ করতে চাও'—এ আয়াত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, এদ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে যারা দুনিয়া কামনা করে এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী মাল ছামান সঞ্চয় করে। হুজুর আকরম (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ এই আয়াতের লক্ষ্য নন। এমর্মে যেহাক (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত তো নাযিল হয়েছিলো ঐ ঘটনার সময়, যখন বদরের যুদ্ধে মুশরেকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিলো। তখন লোকেরা মাল ছামান কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময় মুশরেকদের সংগে যুদ্ধ করা থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) তখন সংকটাপন্ন অবস্থা আঁচ করতে পেরে চিন্তা করলেন, হয়তো মুশরেকরা মোড় পরিবর্তন করে পুনরায় মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যেহাক (রঃ) এর মত অনুযায়ী ঘটনা যদি এরকমই হয়ে থাকে, তাহলে এই আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো বুঝতে হবে। আল্লাহ্‌পাক বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা দুনিয়া কামনা করে। আর এমন কিছু লোক এমনও আছে যারা কামনা করে আখেরাত। এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে মুফাসসেরীনে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এ আয়াতের অর্থ হবে এরকম "যদি পূর্বে লিখিত না থাকতো যে, আমি কারও উপর আযাব প্রদান করবো না। কিন্তু নিষিদ্ধতার পর তো অবশ্যই আযাব প্রদান করবো।" এ কথায় বুঝা যায় যে, কয়েদীদের ব্যাপারটা কোনো গোনাহ্‌র কাজ ছিলোনা। কেননা তখনও নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়নি।

কেউ কেউ আবার এরকম বলে থাকেন, এর অর্থ তোমাদের ইমান যদি কুরআনের উপর না থাকতো, তবে গনীমতের (ফিদইয়া) ব্যাপারে তোমাদেরকে আযাব প্রদান করা হতো। কুরআনের উপর ইমান ছিলো বিধায় তোমরা আমার ক্ষমারযোগ্য হয়েছো। অথবা এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, লওহে মাহফুযে যদি লিখা না থাকতো যে, গনীমতসমূহ তোমাদের জন্য হালাল—এ জাতীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা সবই গোনাহ্ ও নাফরমানীর বিরুদ্ধে। কেননা যে কাজ করা হালাল, তাতে কোনো গোনাহ্ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, তোমাদের যে গনীমত হাসিল হয়, তা তোমরা হালাল ও পবিত্র হিসাবে ভক্ষণ করো। কেউ কেউ বলেন, রসূল কারীম (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরামকে কতল ও ফিদইয়ার মধ্যে যে কোনোটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিলো। সাইয়্যেদুনা হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল কারীম (সঃ) এর কাছে হজরত জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন, কয়েদীদের ব্যাপারে আপনার সাহাবীগণকে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে এই শর্তের উপর তাদের কাছে থেকে ফিদইয়া আদায় করে মুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, আগামী বৎসর সাহাবাগণের মধ্য থেকে সত্তুর জনকে শহীদ করা হবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, আমরা ফিদইয়াটাই গ্রহণ করলাম। যাতে করে আমাদের মধ্য থেকে সত্তুর জন শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। পরে দেখা গেলো, উহুদের যুদ্ধে সত্তুর জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁরা তো অনুমতি পাওয়ার পরই একাজ করেছিলেন; কাজেই গোনাহ্ হলো কোথায়? এখানে আবার কেউ কেউ এরকম বলেন যে, কতল ও ফিদইয়া দু'এর মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো বটে, তবে কতল ও রক্ত প্রবাহিত করাটাই ছিলো উত্তম। সাহাবাগণ তা করেননি। এজন্য আয়াত দ্বারা তিরস্কার করা হয়েছে। তাই বলে এতে কোনো গোনাহ্ সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহ্পাক ভালো জানেন।

পরাক্রম প্রকাশ ও রবুবিয়াতের প্রাধান্য

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, যদি আমার সম্পর্কে কোনো বানানো কথা বলতেন, তবে আমি ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে ফেলতাম। —এ আয়াতখানার অর্থ এরকম দাঁড়ায়, যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলছেন, রসূল (সঃ) যদি নিজের তরফ থেকে কোনো বাক্য তৈয়ার করে আল্লাহ্তায়ালার বাক্য বলে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই তাঁকে দক্ষিণহাত দিয়ে ধরে ফেলতেন অর্থাৎ অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে পাকড়াও করতেন এবং তাঁর শাহ্রগ কেটে ফেলতেন—তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন। এদ্বারা হুজুর পাক (সঃ) এর প্রতি

আল্লাহ্তায়ালার আযাব আরোপিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। রাজা বাদশাগণের বেলায় এরকম হয়ে থাকে। তারা কারও উপর রাগান্বিত হলে তখন এরকম শাস্তির কথা বলে থাকেন। কিন্তু এটা হচ্ছে বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা এখানে এরূপ অর্থে আয়াত নাযিল করেননি। হুজুর পাক (সঃ) এর চূড়ান্ত সত্যবাদিতা এবং আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম মুবালাগার সাহায্যে বাণী পেশ করা হয়েছে। অবে এই আয়াতেও অন্যান্য আয়াতের মতো হুজুর পাক (সঃ) এর বুযুর্গী ও শান মর্যাদা বুঝানোর সাথে সাথে আল্লাহ্তায়ালার পরাক্রম ও রবুবিয়াতের প্রাধান্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই আয়াত হুজুর পাক (সঃ) এর চরিত্রের প্রতি যে অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার অবান্তরতা ও তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ মহব্বত এর দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অপবাদ দানকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের প্রতি এদ্বারা তারীয (হুঁশিয়ার) করা হয়েছে যাতে করে তারা সাবধান হয়ে যায়। যেকোনো অবস্থাতেই আমাদের উচিত যেনো আদবের অঞ্চল হস্তচ্যুত না হয়, সাথে সাথে যেনো রসনাও নিয়ন্ত্রণে থাকে, কারণ এটি প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের মধ্যস্থিত বিষয়।

তফসিলী এলেমের মাসআলা

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, ইতিপূর্বে আপনি কিতাব সম্পর্কেও জানতেন না এবং শরীয়তের আহ্কামের বিস্তারিত জ্ঞানও ছিলো না। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ইমানের আহ্কাম, ইমানের সিফাতের তাফসীলাতের হুকুম। যেরকম কুরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে। কেননা উক্ত তাফসীলাতের অস্তিত্বতো সাধিত হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার পর এবং দ্বীন ও শরীয়তের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর।

একথাতো সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, হুজুর আকরম (সঃ) নবুওয়াতের পূর্বেও আল্লাহ্তায়ালার তৌহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, মূর্তিকে ও মূর্তিপূজারীদেরকে তিনি শত্রু মনে করতেন। হজ ও ওমরা পালন করতেন। তিনি কখনও শরাব স্পর্শ করেননি। অথচ আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বান্দাদের জন্য তাঁর মাধ্যমে যে শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন, তখনও তা অবতীর্ণ হয়নি। এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই। ইমান থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাসদীক ও একরার ও সাক্ষ্য প্রদান। কেউ কেউ বলেন, ইমানের অর্থ এখানে ইমান ও আহ্কামের দাওয়াত। কেউ কেউ আবার এরকমও বলেছেন যে, ইমান শব্দটির পূর্বে একটি মুযাফ (সম্বন্ধপদ। উহ্য আছে অর্থাৎ ইমানদার কারা আপনি জানতেন না। আপনার প্রিয়জন, আত্মীয়, নিকটতম ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ এদের ভিতর থেকে কে ইমান আনতো তা আপনি অবহিত ছিলেন না। তবে এরকম অর্থ কালামের পূর্বাপর ভাবধারার পরিপন্থী। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১৬—

চতুর্থ অধ্যায়

হুজুর পাক (সঃ) এর তালীম, মর্যাদা ও রেসালাত সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব, তথা তৌরিত ও ইঞ্জীল কিতাবে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে। আহলে কিতাবের আলেমগণ এজমালী ও তফসীলী (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত) ভাবে তাঁর স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন, তারই আলোকে আলোচনার ধারা অগ্রসর হবে।

সুতরাং এঅর্থে আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ, 'যারা এ উম্মী নবী ও রসূলের অনুসরণ করে, তারা তাদের নিকট যে তৌরিত ও ইঞ্জীল কিতাব রয়েছে তাতে একথা লিখিত রয়েছে বলে দেখতে পায় যে, তিনি মানুষদেরকে সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করবেন।'—হুজুর আকরম (সঃ) এর আলোচনা অতীত আসমানী কিতাব সমূহে বিস্তর রয়েছে। আম্বিয়া কেরামগণের মজলিশ সমূহের মধ্যে খাতেমুলআম্বিয়া (সঃ) সম্পর্কে সর্বদাই আলোচনা হতো। হকতায়ালা যখন নবী করীম (সঃ) কে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন, কাজেই তারাতো তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই করে থাকবেন। কেননা দস্তুর হচ্ছে, মানুষ প্রিয়জনের আলোচনা বেশী বেশী করে থাকে। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হুজুর আকরম (সঃ) এর সত্যবাদীতার প্রমাণ।

আয়াতের মাধ্যমে হুজুর পাক (সঃ) সম্পর্কে যে সংবাদ প্রদান করা হলো, তা যদি বাস্তবের অনুরূপ না হতো, তাহলে তাদের উন্নাসিকতা থেকে যেতো এবং এটা হতো মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণ। এটা সত্য কথা যে, ইহুদী, নাসারাদের চাইতে হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অন্যেরা বেশী জানতো না। ইহুদী ও নাসারারা তো তাদের কিতাব তৌরিত ও ইঞ্জীলের মধ্যে তাঁর গুণাবলী সমূহ অধ্যয়ন করেছিলো। আর তারা মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরে অপেক্ষমান ছিলো। কেননা মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর আবির্ভাবের আলামত সমূহ পাওয়া যাচ্ছিল।

এরাতো ঐ ইহুদী নাসারা যারা তাদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা করলে হুজুর পাক (সঃ) এর আবির্ভাবের ওসীলা দিয়ে বিজয় কামনা করতো। তারা এরকম বলতো যে, এখনতো সেই সময় এসে গেছে, যখন আমরা নবীয়ে আখেরুজ্জামান এর আশ্রয়ের ছায়াতলে থেকে তোমাদের (বিরুদ্ধাবাদী) সঙ্গে লড়াই করবো। ইহুদী নাসারারা মৃত্যুর সময় আপন সন্তানদেরকে ওসীয়ত করে যেতো এবং বলতো, আমাদের অন্তিমকালের সালাম তোমরা হুজুর (সঃ) এর বারেগাহে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলবে যে, আমরা এতোকাল তাঁর অপেক্ষায় থেকে থেকে জীবন সাঙ্গ করে দিয়েছি এবং এ পৃথিবী থেকে ইমানের সাথে বিদায় নিয়েছি।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরকম এরশাদ করেছেন, 'তারা নবীকরীম (সঃ) কে এরকমই চিনতো, যেমন নিজেদের সন্তানসন্ততিকে চিনতো।' সারকথা এই যে, কাফেররাও নবীকরীম (সঃ) কে খুব ভালো করেই চিনতো। কিন্তু তাঁর পবিত্র আবির্ভাব যখন হলো, তখন সেই পূর্ববর্তী হতভাগ্যতার পুনরাবির্ভাব ঘটলো। হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে এরা তখন নবী করীম (সঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে দিলো। জেনে বুঝেই তারা সত্যপথকে গোপন করার উদ্দেশ্যে তাদের কিতাবের মধ্যে তাহ্‌রীফ (পরিবর্তন) করতে লাগলো। দুনিয়ার মহব্বত ও নেতৃত্বের লোভ তাদেরকে অতি নিম্নস্তরে নামিয়ে দিলো। কিন্তু এহেন তাহ্‌রীফ বা রূপান্তর সত্ত্বেও নবীকরীম (সঃ) এর নবুওয়াতের দলীল সমূহ এবং তাঁর শরীয়তের নিদর্শনসমূহ অই সমস্ত কিতাব সমূহে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিলো।

বর্ণিত আছে সুরইয়ানী ভাষায় নবীকরীম (সঃ) এর নাম ছিলো মুশফেহ্‌। আর মাশফাহ্‌ অর্থই হচ্ছে মোহাম্মদ (সঃ)। সুরইয়ানী ভাষায় শাফাহ্‌ শব্দের অর্থ হচ্ছে হামদ বা প্রশংসা। তারা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করতো তখন বলতো شفحالله 'শাফহানলাহু' অর্থাৎ তার আরবী হচ্ছে الحمد لله 'আলহামদুলিল্লাহ্‌'। শাফাহ্‌ শব্দের অর্থ যখন হামদ, তখন মাশফাহ্‌ শব্দের অর্থ হবে মোহাম্মদ (প্রশংসিত)। হুজুর পাক (সঃ) এর অবস্থা, গুণাবলী, তাঁর নবুওয়াতের আলামত ও নিদর্শনাবলী পরিষ্কারভাবে তাঁর আবির্ভাব ও হিজরতের স্থানে বিদ্যমান ছিলো।

যেদিন হুজুর আকরম (সঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন, সেদিন হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবন সালাম যিনি ইহুদীদের ধর্মযাজক ও সম্মানিত গুণীজনদের অন্যতম ছিলেন এবং হজরত ইউসুফ (আঃ) এর আউলাদ ছিলেন, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় এসে ইমান গ্রহণ করলেন। যেদিন থেকে

তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, হুজুর আকরম (সঃ) মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করবেন, সেদিন থেকেই তিনি তাঁর মহান বরকতময় সাক্ষাত লাভের প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন তিনি হুজুর (সঃ) এর দীদারে ধন্য হলেন, তখন হুজুর (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমিই কি সেই ইবন সালাম যে ব্যক্তি ইয়াসরিবের আলেম। তিনি আরয করলেন, হাঁ। হুজুর (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহতায়ালার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। তুমি কি তৌরিত কিতাবে আমার সম্পর্কে বর্ণনা পেয়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে বিজয়ী করে দেবেন। তিনি আপনার দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর প্রবল করে দিবেন। নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমি আল্লাহ্র কিতাবে আপনার সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বর্ণনা পেয়েছি। যেমন আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী (সঃ)! আপনাকে আমি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।

তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আরও উক্ত হয়েছে, উম্মীদের জন্য, অর্থাৎ আরববাসী যারা অধিকাংশই লেখাপড়া জানতোনা, তাদের আশ্রয় দানকারী। শুধু তাই নয়, বরং তিনি সারাজাহানের জন্য আশ্রয়ের আধার। তবে এখানে আরবদেরকে খাছ করে বলার কারণ হচ্ছে, যেহেতু তিনি আরবদেশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরাই হচ্ছে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি। অথবা তাঁদেরকে খাছ করে উল্লেখ করার কারণ এ-ও হতে পারে যে, প্রথমে তারা মূর্খতায়, অজ্ঞতায়, এবং আত্মিক হতভাগ্যতায় নিমজ্জিত ছিলো। হুজুর পাক (সঃ) তাদেরকে তালীম ও তরবিয়াত প্রদান করে হেদায়েতের বুলুন্দ মাকাম নসীব করে দিলেন। 'হারাজ' বলা হয়, ঐ সুরক্ষিত স্থানকে, যেখানে কোনো বিপদ ও কষ্ট পৌঁছতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে তারা হুজুর পাক (সঃ) এর মাধ্যমে বিপদাপদ থেকে আশ্রয় পেয়েছে। সে বিপদাপদ প্রবৃত্তিপ্রসূত হতে পারে, আবার শয়তানী ওয়াসওয়াসা প্রসূতও হতে পারে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ ফরমান, 'আল্লাহ্তায়ালা এমন এক মহান সত্তা, যিনি উম্মীগণের মধ্যে থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহ্তায়ালার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব এবং হেকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো। উপরোক্ত হেফাজত দ্বারা এ অর্থও হতে পারে যে, তিনি তাদেরকে স্থায়ী আযাব, ধ্বংস ও নির্মূল হওয়া থেকে হেফাযত ও আশ্রয়ের মধ্যে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা

এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা এরকম নন যে, আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন ,অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে আযাব প্রদান করবেন।'

আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম (রাঃ) এর হাদীছের পরিশিষ্ট এই, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আপনি আমার খাছ বান্দা। এই বিশেষণ পাওয়ার সমকক্ষ আর কেউ নেই, আর আপনি আমার রসূলও বটে। যাঁকে আমি সমস্ত সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করেছি। আমি আপনার নাম রাখলাম মুতাওয়াক্কিল। কেননা, আপনি সকল কাজে আমার উপর নির্ভর করেছেন। আপনি আপনার ব্যক্তিসত্তাগত শক্তির বাইরে এসে গেছেন। কেননা বন্দেগীর হাকীকত এটাই। আপনি কর্কশভাষী নন। কঠোরও নন। এঅর্থে কুরআন মজীদে উক্ত হয়েছে আপনি যদি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে এরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। তবে অন্য জায়গায় যে বলা হয়েছে '(আপনি মুনাফেক ও কাফেরদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন)' তার উত্তর হচ্ছে এই যে চরিত্রগত সৌন্দর্য এবং হৃদয়ের কোমলতা তাঁর স্বভাবগত ও জন্মগত গুণ ছিলো। আর কঠোরতার যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা মাখলুকের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তবে এর আরেকটি উন্নততর ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে যে, কঠোরতা না করা এবং অন্তরের নম্রতা—এটা মুসলমানদের বেলায়। আর এর বিপরীতটি কাফের ও মোনাফেকদের জন্য। হুজুর আকরম (সঃ) এর উভয়বিধ গুণ আল্লাহ্তায়ালার ওয়াস্তেই ছিলো।

যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহব্বতও আল্লাহ্র ওয়াস্তে, দুশমনীও আল্লাহ্র ওয়াস্তে।—হুজুর পাক (সঃ) নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, প্রফুল্লচিত্ত থাকা আমার স্বভাব। আখলাক সংক্রান্ত অধ্যায়ে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না, যেমন জাহেলদের অভ্যাস। বিনম্র হওয়া এবং উচ্চস্বরে কথা না বলা বুদ্ধিমানের স্বভাব। মজলিশে, ঘরে, বাজারে সর্বত্রই বক্রচরিত্র থেকে দূরে থাকাও বুদ্ধিমানের নিদর্শন। হুজুর পাক (সঃ) কোনো মন্দের বিনিময়ে কাউকে মন্দ প্রতিদান দিতেন না। বরং ক্ষমা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তায়ালা কক্ষণও তাঁর হাবীব (সঃ) কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না যতক্ষণ না বক্র জাতিকে সংশোধন করবেন এবং যতক্ষণ না মানুষেরা কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে তওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

আল্লাহ্তায়ালা হুজুর পাক (সঃ) এর মাধ্যমে এমন অন্ধদেরকে চক্ষুষ্মান করে দিবেন যারা সত্যপথ দেখে না। এমন কর্ণকে খুলে দিবেন যা

সত্যকথা শ্রবণ করতে অক্ষম। এমন কলবকে খুলে দিবেন যা কিছু বুঝে না এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।

অন্য এক হাদীছে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তিনি বাজারে ডাকাডাকি করবেন না এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলবেন না। যা বলবেন তা সত্য হবে। তিনি সকল সৌন্দর্য ও উৎকর্ষমন্ডিত হবেন। (আল্লাহ্ বলেন) আমি তাঁকে যাবতীয় পবিত্র স্বভাব দান করবো। এতমিনান, প্রশান্তি, স্থিরতা ও ধীরতাকে তাঁর পরিচ্ছদ বানাবো। তাকওয়া ও পরহেজগারীকে তাঁর অন্তর বানাবো। হেকমত হবে তাঁর বুদ্ধিমত্তা। সত্যবাদীতা ও অঙ্গীকার পালন হবে তাঁর স্বভাব। ক্ষমা ও কল্যাণ হবে তাঁর আদব। আদল বা ন্যায় বিচার হবে তাঁর চরিত্র। হক হবে তাঁর শরীয়ত। হেদায়েত হবে তাঁর ইমান। ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। আমি তাঁর নাম রাখবো আহ্মদ। লোকেরা গোমরাহীর পর তাঁর মাধ্যমে হেদায়েত পাবে। তাঁর ওসীলায় মানুষ মূর্খতার পর পুনরায় জ্ঞান লাভ করবে। স্বল্পপরিচিতির পরে তাঁর নাম পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। (আল্লাহ্ বলেন) স্বল্পতার পর আমি তাঁকে অধিক দান করবো। বিরহের পর আমি তাঁকে আহ্বান করবো। দরিদ্রতার পর তাঁকে আমি সম্পদ দান করবো। বিরুদ্ধবাদী অন্তর বিক্ষিপ্ত অভিলাষসম্পন্ন ও বিচ্ছিন্ন দলসমূহের মধ্যে আমি তাঁর মাধ্যমে প্রেমভালোবাসা ঢেলে দেবো। তাঁর উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত হিসাবে সাব্যস্ত করবো। কাবে আহ্বার থেকেও এরকম বর্ণিত আছে।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, সাইয়্যেদুনা হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তৌরিত কিতাবে মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে কি কি বর্ণনা পেয়েছো? তখন তিনি বর্ণনা করলেন, তৌরিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মোহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ 'আবদে মুখতার' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত বান্দা হবেন। মক্কা মুকাররমায় তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। মদীনা মুনাওয়ারা হবে তাঁর হিজরতের স্থান। শামদেশ তাঁর করায়ত্বে আসবে। তিনি কর্কশভাষী হবেন না। কঠোরও হবেন না। বাজারে তিনি গোলোযোগ সৃষ্টিকারী হবেন না। মন্দ কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। বরং ক্ষমাশীলতাই হবে তাঁর মহানগুণ। এই বর্ণনায় হুজুর পাক (সঃ) উম্মতের প্রশংসাও করা হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর উম্মত সুখদুঃখে, কষ্টে আনন্দে-সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞচিত্ত হবেন। তাঁদের স্বভাব হবে নিম্নে অবতরণের সময় তাঁরা আল্লাহ্র প্রশংসা' 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করবেন। আর উর্ধে উঠার সময় আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব 'আল্লাহু আকবার' বলবেন, নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সূর্যের প্রতি

লক্ষ্য রাখবেন। সূর্য যখন কোনো নামাজের সময় নির্দেশ করবে তখনই তাঁরা সে নামাজ আদায় করে নিবেন, যদিও তাঁরা মাটিতে অবস্থান করেন। টাখনুর উপরে তাঁরা পাজামা বা লুঙ্গি পরিধান করবেন। তাঁরা নিজেদের অঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থাৎ হাত বা মুখমণ্ডল অজু দ্বারা ধৌত করবেন। তাঁদের মধ্য থেকে আহ্বানকারী মুয়াজ্জিন গগনবিদারী ধ্বনিতে আযানের বাণী উচ্চারণ করবেন। তাঁদের কাতার যুদ্ধের ময়দানে আর নামাজের স্থানে একই রকম হবে। রাত্রি বেলায় তাঁরা সঙ্গীতমুখর হবেন। সঙ্গীতমুখর হওয়ার অর্থ ওযীফা কালাম ও কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনিতে মুখরিত হবেন।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি রসূলকরীম (সঃ) কে বলতে শুনেছেন।—হজরত মুসা (আঃ) এর উপর তৌরিত নাযিল হয়েছিলো। তিনি তা পাঠ করতে যেয়ে উম্মতে মোহাম্মদী (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পান। তখন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আরয করলেন, হে খোদা! আমি তৌরিতে এমন এক উম্মতের আলোচনা পেলাম যারা সর্বশেষ উম্মত হবে, অথচ অগ্রগামীও হবে। অর্থ এই যে, কালের হিসাবে তারা হবে সর্বশেষ। কিন্তু উত্তমতা ও মর্যাদার দিক দিয়ে হবে প্রথম এবং অগ্রগামী। তাঁদের জন্য শাফাআত করা হবে। তাঁদের দোয়ার বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাঁদের বুকে কালামে এলাহী সংরক্ষিত থাকবে। তাঁরা তাঁদের হেফয অনুসারে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করবে। তাঁরা গনীমতের মাল ভক্ষণ করবে। সদকা তাঁদের উদরের জন্য তৈরী করা হবে। তাঁরা ঐ বিশেষ উম্মত, যাঁদের জন্য শরীয়তের বিধি বিধান সহজ করা হবে। গনীমত ও সদকা তাদের জন্য হালাল করে দেয়া হবে। পূর্ববর্তী উম্মতেরা এর বিপরীত, তাদের জন্য গনীমত ও সদকা হালাল ছিলোনা। এ উম্মত খারাপ কাজের উদ্দেশ্য করলে তখন তা লিপিবদ্ধ করা হবেনা, যতক্ষণ না সে খারাপ কাজ বাস্তবায়িত করবে। খারাপ কাজ সম্পাদন করলে একটিই লিপিবদ্ধ করা হবে। তাঁরা যখন কোনো নেকীর কাজ করার নিয়ত করবে, তখনই তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তা বাস্তবায়িত করলে দশগুণ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। তাঁদেরকে পূর্ব ও পরের জ্ঞান দান করা হবে। আখেরী যমানায় যে দজ্জাল আবির্ভূত হবে, তাকে এই উম্মতের লোকেরাই হত্যা করবে।

নবী করীম (সঃ) এর উম্মত হওয়ার জন্য হজরত মুসা আঃ এর বাসনা

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা, আঃযখন তৌরিত কিতাবের ফলকে আখেরী যমনার উম্মতের প্রায় সত্তরটি গুণাবলী দেখতে পেলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে আরয করলেন, আয় আল্লাহ্! অই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে ঘোষণা এলো, হে মুসা! অই উম্মতকে আমি তোমার উম্মত কেমন করে বানাবো? তারা তো হবে আখেরী যমানার নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সঃ) এর উম্মত। তখন হজরত মুসা (আঃ) আরয করলেন, হে আমার রব! তাহলে তুমি আমাকেই উম্মতে মোহাম্মদী (সঃ) বানিয়ে দাও। এই পরিপ্রেক্ষিতে তখন আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসা (আঃ) কে দুটি সৌন্দর্য দান করলেন। এরশাদ হলো, 'হে মুসা! তোমাকে আমি মানুষের উপর মনোনীত করেছি আমার রেসালত ও আমার কালামের মাধ্যমে। কাজেই আমি যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ করো। আর তুমি কৃতজ্ঞচিত্তদের অন্তর্ভুত হও।' তখন হজরত মুসা (আঃ) আরয করলেন। হে আল্লাহ্! আমি এতে রাযী আছি।

আবু নাঈম হজরত সালেম ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন ওমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কা'ব আহবারকে জনৈক ব্যক্তি বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে হিসাব কিতাবের জন্য মানুষ একত্রিত হয়েছে। সমস্ত নবীগণকে সেখানে ডাকা হয়েছে। সমস্ত নবীগণই আপন আপন উম্মতদেরকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, প্রত্যেক নবীগণের দু'টি করে নূর আর উম্মতদের একটি করে নূর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এরপর হুজুর আকরম (সঃ) কে আহ্বান করা হলো। তাঁকে দেখলাম যে, শরীরের সমস্ত পশম মুবারকে একেকটি করে নূর রয়েছে। আর তাঁর উম্মতের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে দু'টি করে নূর। কা'ব আহবার তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে এরকম কি কোথাও তুমি পাঠ করেছো? লোকটি বললো, আল্লাহর কসম। স্বপ্নে দেখা ছাড়া এরকম আমি আর কোথাও পড়িনি। তখন কা'ব বললেন, কসম ঐ মহান সত্তার যাঁর কুদরতের হাতে কা'বের প্রাণ, এই বৈশিষ্ট্য মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁর উম্মতের। আর পূর্বে বর্ণিত অবস্থাটি হচ্ছে অন্যান্য নবী ও উম্মতগণের। কিতাবে ইলাহীর মধ্যে এরকম বর্ণনা বিদ্যমান আছে। মনে হয় তুমি যেনো তৌরিত কিতাবে তা পাঠ করেছো।

হুজুর পাক (সঃ) এক নবুওয়াত সম্পর্কে ইহুদীদের জ্ঞান

কিছু বর্ণনা এমন পাওয়া যায়, যাতে মনে হয় যে, হুজুর পাক (সঃ) এর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদীদের পূর্ব থেকেই জানা ছিলো। তবে তাদের মধ্যে যারা মন্দ তারা তাঁর আত্মপ্রকাশের পর শত্রুতাবশতঃ তাঁকে অস্বীকার করেছিলো। তবে যাঁদের অবস্থার সাথে তওফীক ও হেদায়েতে রব্বানী শামিল হয়েছিলো, তাঁরা অই মন্দ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

তারা তো সর্বদাই তৌরিত কিতাবের শিক্ষা ও অনুশীলনের সময় হুজুর আকরম (সঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতো এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে এর আলোচনা করতো। তাঁর হুলিয়া মুবারক কি রকম হবে—তারও বর্ণনা করতো। হিজরত ও আবির্ভাবের স্থান নির্ধারণ করে তারা বলতো যে, নবীয়ে আখেরুজ্জামান মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় স্থায়ী হবেন। কিন্তু যখন হুজুর পাক (সঃ) মদীনায় এলেন, তখনই তারা হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করলো এবং বলতে লাগলো যে ইনি অই ব্যক্তি নন যাঁর সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে বলে আসছিলাম। তারা তখন তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকৃত বর্ণনা দিতে লাগলো। কিন্তু তাদের এই রদবদল সত্ত্বেও দলীল ও সাক্ষী সমূহ তৌরিত কিতাবে সমুজ্জ্বল ছিলো।

আউস গোত্রের এক ব্যক্তি আবু আমের পাদ্রী ছিলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রে তার চেয়ে অধিক হুজুর আকরম (সঃ) এর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনাকারী আর কেউ ছিলোনা। এরা মদীনার ইহুদীদেরকে মহব্বত করতো, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করতো। তাদের কাছে রসূল করীম (সঃ) এর ছানা সিফাত ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো, তারা হুজুর পাক (সঃ) এর সিফাত তার কাছে ব্যক্ত করে বলতো যে, মদীনা হবে তাঁর হিজরতের স্থান। এরপর সে ইহুদীদের কাছ থেকে 'তাইমা' নামক স্থানে গেলো এবং সেখানকার লোকদের কাছ থেকেও এরকমই শুনতে পেলো। এরপর সে শামদেশে গিয়ে সেখানকার নাসারাদের কাছে হুজুর পাক (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারাও তার কাছে হুজুর আকরম (সঃ) এর ছানা সিফাত অই রকমই বর্ণনা করলো। এরপর আবু আমের নির্জনতা অবলম্বন করলো এবং পাদ্রী হয়ে গেলো। পাদ্রীদের মতো লেবাস পরিধান করা শুরু করলো। এরপর থেকে সে সব সময়ই বলতো, আমি মিল্লাতে হানিফিয়া দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী এবং নবীয়ে আখেরুজ্জামানের আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছি।

উক্ত আবু আমের থেকে জ্বীনদের নারীরাও হুজুর আকরম (সঃ) এর সিফাত ও আলামতের বর্ণনা শুনেছিলো। কিন্তু হুজুর আকরম (সঃ) যখন

আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন সে স্বীয় অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুনাফেকীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে লাগলো। সে হুজুর আকরম (সঃ) কে এরূপ প্রশ্ন করতো, হে মোহাম্মদ (সঃ) আপনি কোন ধর্মের উপর আবির্ভূত হয়েছেন? তিনি বলতেন, মিল্লাতে হানিফিয়া। তখন সে বলতো, না আপনি তা অন্য ধর্মের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। হুজুর পাক (সঃ) বলতেন, না। বরং আমি তাকে অধিকতর উজ্জ্বল ও পাক সাফ করে নিয়ে এসেছি। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেছিলেন, হে আবু আমের! অই সমস্ত সংবাদের কি হলো, আমার ছানা সিফাত সম্পর্কে ইহুদীরা যা তোমার কাছে ব্যক্ত করেছিলো? তখন সে বলেছিলো, আরে আপনি তো নন, ইহুদীরা যে সমস্ত ছানা সিফাত বর্ণনা করেছিলো তা আপনার মধ্যে নেই। হুজুর পাক (সঃ) তখন বলেছিলেন, হে আবু আমের, তুমি মিথ্যা বলছো। আবু আমের বললো, আমি মিথ্যা বলছিনা বরং আপনি অসত্য বলছেন। হুজুর আকরম (সঃ) তখন বললেন, মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্তায়ালা নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস করবেন। এরপর আবু আমের মক্কা ফিরে গেলো এবং কুরাইশদের ধর্মের অনুসরণ করতে লাগলো।

পরবর্তীতে উক্ত আবু আমের শামদেশে যাওয়ার পথে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায়ভাবে মোসাফিরি অবস্থায় হুজুর পাক (সঃ) এর বদ দোওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করে। আবু আমেরের এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে যতক্ষণ কারও তৌফিক ও হেদায়েত নসীব না হয় ততক্ষণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা তার জন্য কোনো কাজে আসে না। 'আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রতি হেদায়েত দান করেন।'

উক্ত আবু আমেরের পুত্র ছিলেন হজরত হানযালা (রাঃ), তাঁকে 'গাছীলে মালায়েকা' বলা হয়। তিনি হুজুর পাক (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে ইমান গ্রহণ করলেন। তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবা হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি যে 'গাছীলে মালায়েকা' হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন তার একটা ঘটনা রয়েছে। এমর্মে ইবন হেব্বান তাঁর সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর গ্রন্থ মুস্তাদরেক এর সাথে শায়খাইনের শর্তানুসারে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো এরকম—তিনি নববিবাহিত ছিলেন। অই দিনই তাঁর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিলো। তিনি স্ত্রীর সাথে বাসরযাপন শেষ করেছিলেন। হঠাৎ করে উহুদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। জানাবত থেকে পাক হওয়ার জন্য গোছল সম্পন্ন করার মতো অবসরটুকুও তিনি পাননি। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন—কাফেরদের

সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি উহুদের প্রান্তরে শাহাদতের শুরা পান করলেন। হুজুর পাক (সঃ) দেখতে পেলেন যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে গোছল করাচ্ছে। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, হানযালার প্রকৃত অবস্থাটি কি? অন্য শহীদদের মাঝখান থেকে নিয়ে ফেরেশতাগণ তাঁকে গোছল দিচ্ছে কেনো? (কেননা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম—যুদ্ধের ময়দানে কেউ শহীদ হলে তখন তাকে গোছল দিতে হয় না এবং তার দেহ থেকে বস্ত্রও অপসারণ করা হয় না। আর এখানে তো দেখা যাচ্ছে ফেরেশতাগণ তাঁকে গোছল দিচ্ছে?)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল (সঃ) বললেন, সে জুনুবী ছিলো। নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে এ অবস্থাতেই উঠে এসেছিলো। পরে যখন তাঁর স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তখন তিনি এরকম অবস্থাই বর্ণনা করেছিলেন। এ হাদীছের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) জুনুবী শহীদকে গোছল দেয়ার বিধান সাব্যস্ত করেছিলেন। তবে সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, ঐ গোছল যা জানাবতের কারণে ফরজ হয়েছিলো, শরীরের বৃত্ত থেকে বান্দার বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর হুকুমও রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কারণে যে গোছল অপরিহার্য হয়, তা শাহাদতের কারণে রহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাঁর উপর আর কোন গোছল ফরজ রইলো?

ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ)? দলীল হিসাবে হজরত হানযালা (রাঃ) এর ঘটনাকে উপস্থাপন করে থাকেন এবং হুজুর পাক (সঃ) এর এরশাদ, যা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে তিনি জুনুবী ছিলেন, তাঁকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।

এখন তৌরিত, যবুর, ইঞ্জিল এবং হজরত আদম (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের সহীফা সমূহে হুজুর আকরম (সঃ) এর মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তার বর্ণনা উপস্থাপন করা হবে।

তৌরিত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাব থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ

এতে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই যে, আসমানী কিতাবসমূহে হুজুর পাক (সঃ) এর আহওয়াল শরীফের বর্ণনা রয়েছে বলে কুরআন মজীদে যে সাক্ষ্য রয়েছে, তার অধিক কোনো দলীল পেশ করার সাধারণত কোনো প্রয়োজন আর পড়ে না। তবে আল্লাহ্‌র দুশমন কাফেরদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু দলীলপ্রমাণ পেশ করা প্রয়োজন। এতে

মুসলমানের অন্তর প্রশান্ত হবে এবং বিশ্বাসের নূর সুদৃঢ় হবে। অই বদবখতেরা কিতাবের আমানত রক্ষা করার স্থলে খেয়ানত করতো। তৌরীতের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা সত্বেও যে নির্দশন ও নমুনা পাওয়া যায় তা এরকম, আল্লাহ্তায়ালা সাইনা পাহাড়ে তাজাল্লী নিক্ষেপ করলেন, সাগীর পাহাড়ে আবির্ভূত হলেন এবং ফারান পাহাড়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সাইনা মানে ঐ পাহাড় যাকে তুরে সাইনা বা তুরে সিনীন বলা হয়। হকতায়ালা তাঁর উপর তাজ্জাল্লী নিক্ষেপ করলেন এবং হজরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বললেন এবং এদ্বারা তাঁর নবুওয়াত প্রমাণিত হলো। সাগীর নামক স্থান থেকে তাঁর উপর ইঞ্জীল কিতাব অবতীর্ণ হলো। ফারান ইরানী ভাষার একটি নাম। আর মক্কা মুকাররমায় বনী হাশেমদের অই পাহাড়গুলিকে ফারান বলা হয় যার একটির উপর উঠে হুজুর পাক (সঃ) নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আর এ পাহাড়ের উপরই সর্বপ্রথম আল্লাহ্তায়ালার ওহী নাযিল হয়েছিলো। এখানে তিনটি পাহাড় রয়েছে। আবু কুরায়স পাহাড়—যার পাদদেশে মক্কা মুকাররমার লোকালয়। তার বরাবর রয়েছে কায়ফাআন পাহাড় যা বাতনে ওয়াদী পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এ পাহাড়ের পূর্ব দিকে এর সংলগ্ন অবস্থায় আছে শুআবে বনী হাশেম। আর এ শুআবের মধ্যেই হুজুর আকরম (সঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইবন কুতাইবা যিনি উম্মতের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন, তিনি পূর্ববর্তী অনেক কিতাব পড়েছিলেন এবং তার অনুবাদ করেছিলেন। তিনি আলামুন্নবুওয়াত নামক কিতাবে বলেছেন, তৌরিত কিতাবের উপরোক্ত বিবরণ সম্পর্কে কেউ সামান্য চিন্তা ভাবনা করলেই এর তাৎপর্য অনুধাবন করতো। কেননা প্রকৃত অবস্থা এই যে, এসময়ে হকতায়ালার তুরে সায়নাতে তাজ্জাল্লী ফরমানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে হজরত মুসা (আঃ) এর উপর তৌরিত কিতাব নাযিল করা। আর জাবালে সাগীর থেকে যহুর হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে হজরত ঈসা (আঃ) এর উপর ইঞ্জীল কিতাব নাযিল করা। কেননা হজরত ঈসা (আঃ) আরসে খলীলের জাবালে সাগীরে (যাকে নাসেরা বলা হয়) বসবাস করছিলেন। আর এর উপর ভিত্তি করেই তাঁর অনুসারীগণকে নাসারা বলা হয়। যখন একথা সাব্যস্ত হলো যে, সাগীর পর্বত থেকে হক তায়ালার যহুর ফরমানোর অর্থ হজরত ঈসা (আঃ) এর উপর ইঞ্জীল কিতাব অবতীর্ণ হওয়া, তখন ফারান পর্বতমালায় হকতায়ালার আত্মপ্রকাশ হওয়ার

অর্থ হবে হুজুর আকরম (সঃ) এর উপর কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুসলমান এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য নেই যে, ফারান মক্কার পর্বতমালার নাম। তারা যদি এরূপ দাবী করে যে, ফারান মক্কার পর্বতমালা ভিন্ন অন্য কোনো পাহাড়ের নাম, তাহলে তা হবে সত্যের অপলাপ। এরকম অবস্থায় আমরা তাদের কাছে প্রশ্ন রাখবো, তাহলে বলো দেখি অন্য একটি স্থান কোথায় অবস্থিত—যেখানে হকতায়ালার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো, যার নাম ফারান। সেখানে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছিলো এবং হজরত ঈসা (আঃ) এর পর সে নবীর উপর কিতাব নাযিল হয়েছিলো। আমাদেরকে ঐ দ্বীনটি দেখিয়ে দাও যা প্রকাশ ও উন্মুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে ইসলামের মতো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। তোমাদের কি এটা জানা নেই যে, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের মতো সমুজ্জ্বল, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কোনো দ্বীনের আত্মপ্রকাশ আর ঘটেনি।

তৌরিত কিতাব থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ

তৌরিত কিতাবে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা তৌরিতের মধ্যে হজরত মুসা (আঃ) এর সঙ্গে ফামেস সফরে এরূপ সম্বোধন করেছিলেন—তোমাদের রব বনীইসরাইলের জন্য, তোমাদেরই ভাইদের ভিতর থেকে (অন্য এক বর্ণনায় আছে তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে) একজন নবী আবির্ভূত করবেন এবং যে নবীর মুখে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কালাম উপস্থাপন করবেন আর তিনি তাদের জন্য ঐ সমস্ত ব্যাপারে হুকুম করবেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করেছেন। তারপর যারা তাঁর নির্দেশ প্রতিপালিত করবেনা—আল্লাহ্ বলেন যে, আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো।

তৌরিত কিতাবের এহেন ভাষ্যটি সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নবুওয়াতেরই দলীল। কেননা হজরত মুসা (আঃ) ও তাঁর কাওম বনী ইসরাইল হজরত ইসহাক (আঃ) এর বংশধর। আর নবী করীম (সঃ) হলেন ইসহাক (আঃ) এর ভাই হজরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর। আর যে নবীর আগমনের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তিনি যদি বনী ইসরাইলদের মধ্যে থেকে হন, তবে তো তাদের মধ্যে থেকে হলো—তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে হলোনা। আর তারা যদি বলে যে, বনী ইসরাইল ও বনী ইসমাইলের ভ্রাতৃসম্পর্ক—এ দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাহলে তার উত্তরে আমরা বলবো, এভাবে তোমরা তৌরিত কিতাবের প্রতি মিথ্যারোপ করছো। কেননা তৌরিতে উল্লেখ রয়েছে, বনী ইসরাইলের

মধ্যে হজরত মুসা (আঃ) এর মতো কোনো নবী আসে নি। তৌরিতের অন্য এক অনুবাদে রয়েছে, হজরত মুসা (আঃ) এর মতো আর কোনো নবী বনী ইসরাইলের মধ্যে আগমনই করবেন না।—সুতরাং কোনো কোনো ইহুদী যে বলে, উপরোক্ত প্রতিশ্রুত নবী হলেন হজরত ইউশা ইবন নূন। তাদের বক্তব্য এই তরজমা দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কেননা হজরত ঈউশা (আঃ) হজরত মুসা (আঃ) এর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর মতোও ছিলেন না। বরং তিনি হজরত মুসা (আঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর খাদেম হিসাবে ছিলেন। আর হজরত মুসা (আঃ) এর ওফাতের পর তাঁর দাওয়াতী কার্যে সাহায্যকারী ও শক্তি সংযোজনকারী ছিলেন।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো, উক্ত প্রতিশ্রুত নবী হচ্ছেন সাইয়্যেদে আলম হজরত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে হজরত মুসা (আঃ) এর সমকক্ষ ও আনুরূপ্যের দাবীদার। বরং তারও উর্ধে। হুজুর পাক (সঃ) দাওয়াতে হক প্রতিষ্ঠা, মোজেজার চ্যালেঞ্জ, আহকাম প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান রহিত করণ ইত্যাদির দিক দিয়ে হজরত মুসা (আঃ) এরই মতো। সুতরাং বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সেই প্রতিশ্রুত নবী হচ্ছেন আখেরী যমানার নবী সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। এর মধ্যে কোনোরূপ দ্বিধা দ্বন্দ ও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

তৌরিত কিতাবের সেই ভাষ্য—"আমি আমার কালাম তাঁর মুখে উপস্থাপন করবো" কথাটির তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য এই—আমি আমার কালামের ওহী তাঁর কাছে প্রেরণ করবো। আর তিনি সেই ওহীর কালামের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠিকে সম্বোধন করবেন যা তিনি স্বয়ং শ্রবণ করে থাকবেন। তাঁর কাছে আমি কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি অবতীর্ণ করবো না। যেহেতু তিনি একজন উম্মী নবী।

ইঞ্জীল কিতাব থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ

হুজুর আকরম (সঃ) এর সুসংবাদ সম্পর্কে ইঞ্জীল কিতাবে বর্ণনা এসেছে। এই বর্ণনা দিয়েছেন ইবন যফর। তিনি বলেন, হজরত ঈসা (আঃ) এর হাওয়ারী ছিলেন ইউহান্না। তিনি ইঞ্জীল কিতাব থেকে হজরত মসীহ্ ঈসা (আঃ) এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন—

হজরত ঈসা (আঃ) বললেন, "আমি পিতার কাছে দরখাস্ত করছি তিনি যেনো তোমাদের জন্য অপর একজন ফারে ফালীত (রসূল) দান করেন। যিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি রুহে হক। তিনি সবকিছুই

তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। তখন পিতা বললেন, বৎস! তুমি প্রস্থানকারী। কেননা, তোমার পরে সেই ফারে ফালীত আগমন করবেন। যিনি তোমাদের যাবতীয় ভেদ উজ্জীবিত করে সমস্ত বস্তুকে পরিবর্তন করবেন। তিনি আমার সাক্ষ্য প্রদান করবেন, যেমন আমি তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করছি। আমি তোমাদের জন্য আমছাল (উপদেশবাণী) প্রদান করেছি, আর তিনি তার ব্যাখ্যা নিয়ে আগমন করবেন (ব্যাখ্যার অর্থ কুরআন মজিদ)। আর ফারে ফালীত এমন হবেন, সারা জাহানের মধ্যে কেউ তাকে দমন করতে পারবেনা। তুমি যদি আমার আহ্বান মানো আর আমার প্রতি মহব্বত রাখো, তাহলে আমার এ ওসীয়ত স্মরণ রাখবে। আমি খোদার কাছে দরখাস্ত করছি তিনি তোমাদের জন্য ফারে ফালীত দান করবেন, যিনি আখেরী যমানা পর্যন্ত তোমাদের সাথে থাকবেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এই যে, হকতায়ালা হজরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতের প্রতি এমন একজন পয়গম্বর প্রেরণ করবেন, যিনি আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত রেসালতের প্রচারে এবং জনশাসনের ব্যাপারে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। সেই পয়গম্বরের শরীয়ত শেষ যমানা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন, হুজুর পাক (সঃ) ছাড়া এমন কোনো রসূল কি জগতে আবির্ভূত হয়েছেন?

ফারে ফালীত কি? এর ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্য নাসারারা মতানৈক্য করেছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছে, ফারে ফালীত মানে হামেদ অর্থাৎ প্রশংসাকারী। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছে, ফারে ফালীত মানে মুখলেস। ফারে ফালীতের অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত ধরে নিয়ে শেষোক্তদের সত্যকে যদি প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে বিশুদ্ধচিত্ত তো এমন রসূলকে হতে হবে যিনি সমস্ত জাহানের মুক্তির জন্য তশরীফ আনবেন। আর এই ব্যাখ্যাই যদি গ্রহণ করা হয়, তবে তো আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলেই হলো। কেননা প্রত্যেক নবীই আপন আপন উম্মতকে কুফুরী থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। হজরত ঈসা (আঃ) এর উক্তিও এই অর্থের সহায়ক। তিনি বলেছেন "আমি মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য এসেছি।" যখন হজরত ঈসা (আঃ) এর উক্তি থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনি মানুষের নাজাত দানকারী। অতঃপর তিনি যখন আপন পিতার কাছে অপর ফারে ফালীতের জন্য প্রার্থনা করলেন তখন সাব্যস্ত হলো যে, এক ফারে ফালীত (অর্থাৎ তিনি নিজে) বিদায় হবেন এবং অপর ফারে ফালীত আগমন করবেন।)

ফারে ফালীতের অর্থ যদি হামেদ বা প্রশংসাকারী গ্রহণ করি, তাহলে তো দেখা যায়, এ শব্দটি আহমদ শব্দের অধিকতর নিকটবর্তী। এ

পরিপ্রেক্ষিতে ইবন যফর বলেন, ইঞ্জীল কিতাবে যে বিষয়ের তরজমা করা হয়েছে, তা এটাই প্রমাণ করে যে, ফারে ফালীত হচ্ছেন রসূল। এ জন্যই হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "যে কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছো, তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কথা নয়। বরং তা হচ্ছে পিতার কালাম যা তোমাদের জন্য আমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর সেই ফারে ফালীতকে পবিত্র আত্মার রব আমার নামে প্রেরণ করবেন যাতে করে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, উপদেশ প্রদান করবেন যেমন আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করে থাকি।"

সুতরাং এর চেয়ে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা কি হতে পারে যে, ফারে ফালীত হবেন ঐ রসূল, যাঁকে আল্লাহ্তায়ালা প্রেরণ করবেন এবং তিনি আল্লাহ্র মাখলুককে সর্ববিষয়ে শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে বক্তৃতা ও উপদেশ শোনাবেন। উপরোক্ত বর্ণনায় যে 'পিতা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা কিন্তু পরিবর্তিত শব্দ। আর নাসারারা যে 'রব' শব্দের স্থলে পরিবর্তিত শব্দ 'পিতা' ব্যবহার করেছে, এটাও তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত নয়। তারা মনে করেছে পিতা শব্দটি সম্মানজনক শব্দ। এ শব্দ দ্বারা শাগরেদরা উস্তাদকে সম্বোধন করে নিজের এলেমের নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করে উস্তাদের উপর। এটাও প্রসিদ্ধ কথা যে, নাসারারা তাদের দ্বীনের আলেমগণকে রুহানী পিতা বলে সম্বোধন করতো। বনী ইসরাইল ও বনী আ'য়াসরাও নিজেদেরকে 'আমরা আল্লাহ্র সন্তান' বলে দাবী করতো। এসমস্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে নাসারারা বদগোমানীতে নিপতিত হয়েছিলো।

হজরত ঈসা (আঃ) এর ভাষ্য (পরিবর্তিত), পিতা সেই ফারে ফালীতকে আমার নামেই প্রেরণ করবেন। এদ্বারা সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর রেসালতের সত্যতা ও সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়। তদুপরি উক্ত ভাষ্য ইঙ্গিত প্রদান করছে, কুরআনে কারীমের ঐ সমস্ত আয়াতে কারীমার দিকে, যা হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইঞ্জীল শরীফের অপর এক অনুবাদে হজরত ঈসা (আঃ) বলেন "ফারে ফালীত আগমন করবেননা, যতক্ষণ না আমি দুনিয়া থেকে চলে যাবো। আর সেই ফারে ফালীত যখন আগমন করবেন, তখন দুনিয়াকে ভুলভ্রান্তির জন্য তিরস্কার ও হুঁশিয়ারি প্রদান করবেন। তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলবেন না। তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট থেকে যা শ্রবণ

করবেন, তাই ব্যক্ত করবেন। ন্যায় ও সত্যতার পথে তিনি মানুষদেরকে পরিচালিত করবেন এবং জগতবাসীকে গযবের সংবাদ প্রদান করবেন,"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনোকিছুই বলবেন না, বরং ঐ সমস্ত কথাই বলবেন, যা আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে শুনবেন। কেননা হকতায়ালা তাকে প্রেরণ করবেন।" আর এরকম তো আল্লাহ্তায়ালা কুরআনে কারীমে হুজুর পাক (সঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, 'তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথাই বলেন না, তিনি তাই বলেন যা তাঁর কাছে ওহী করা হয়।'

হজরত ঈসা (আঃ) আরও বলেছেন, "তিনি অর্থাৎ ফারে ফালীত আমার বুযুর্গী ও সম্মান বর্ণনা করবেন এবং আমার নবুওয়াতের আলামত (মোজেজা) সমূহকে মহান জানবেন। "বাস্তব অবস্থাও ছিলো এরকম। হুজুর আকরম (সঃ) হজরত ঈসা (আঃ) এর বুযুর্গী ও সম্মান যেরকম বর্ণনা করেছেন অন্য কেউ এরকম বর্ণনা করেননি। হুজুর পাক (সঃ) তাঁর রেসালতের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তাঁর উম্মতেরা তাঁকে যে সমস্ত ভ্রান্ত অভিধায় ভূষিত করেছিলো, তিনি তাঁকে তা থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

যা কিছু বলা হলো, এর সমস্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হুজুর পাক (সঃ) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। হুজুর পাক (সঃ) ছাড়া আর এমন কে ছিলেন যিনি বনী ইসরাইল আলেমদের মাধ্যমে সত্য গোপন করা, কলেমাতে রব্বানীর পরিবর্তন সাধন করা ও স্বল্প মূল্যে দ্বীন বিক্রি করে দেয়ার মতো জঘন্য কাজের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন? এমন কে ছিলেন যিনি গযব ও গায়েবী অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছেন?

হকতায়ালা ইঞ্জীল কিতাবে হজরত ঈসা (আঃ) এর কাছে এমর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলেন যে, তুমি সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদ (সঃ) কে স্বীকার করো ও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখো এবং তোমার উম্মতের কাছে একথা বলে দাও যে, প্রত্যেক অই ব্যক্তি যে মোহাম্মদ (সঃ) এর যামানা পাবে সে যেনো তাঁর উপর ঈমান আনে। হে আমার সাহসী সন্তান! তুমি জেনে রাখো যে, মোহাম্মদ (সঃ) যদি না হতেন, তাহলে আমি আদম, জান্নাত, জাহান্নাম কোনো কিছুই সৃষ্টি করতাম না। আমি যখন আরশ সৃষ্টি করলাম, তখন সে কম্পমান ছিলো। স্থির হতে পারছিলোনা। অতঃপর আমি আরশের উপর লিখে দিলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'। তখন সে শান্ত হয়ে গেলো।

১৭—

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় বায়হাকী থেকে হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা জার ও নাসারারা হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। ঐ সময় তারা বললো যে, ঐ আল্লাহ্‌র কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আমি ইঞ্জীল কিতাবে আপনার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পাঠ করেছি। আল্লাহ্‌র সাহসী সন্তান হজরত ঈসা (আঃ), আপনার সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) দালায়েলুন্নবুওয়াত কিতাবে আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হিশাম ইবনুল আস উসুববী থেকে। তিনি বলেন যে, আমাকে আরও কতিপয় লোকের সাথে রুমের কায়সার হেরকালের নিকট প্রেরণ করা হলো তার কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করার উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি হাদীছখানা সম্পূর্ণ বর্ণনা করলেন। বর্ণনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, একরাত্রে হেরকাল আমাদেরকে তার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা তার কাছে যাওয়ার পর তিনি একটি বৃহদাকারের সিন্দুক আনলেন, যার ভিতরে ছোট ছোট কুঠুরী ছিলো। প্রত্যেকটি কুঠুরীর মুখ ছিলো ছোট ছোট। তিনি সেই সিন্দুকখানা খুললেন এবং একটি কালো রঙের রেশমের কাপড়ের টুকরা বের করে মেলে ধরলেন। তার মধ্যে একখানা ছবি দেখা গেলো, যার চোখ দু'টি ছিলো বড় বড়। নিতম্ব ছিলো বেশ পুরু। গর্দান ছিলো লম্বা, কেশ ছিলো বিন্যস্ত। এটা ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার উত্তম সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি।

তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমরা কি এ ছবিটি চিনতে পেরেছো? আমরা বললাম, না। "তিনি বললেন, এটা হচ্ছে হজরত আদম (আঃ) এর চিত্র। এরপর তিনি আরেকটি কুঠুরী খুলে কালো রঙের একটি রেশমের কাপড়ের টুকরা বের করে মেলে ধরলেন। তাতে এমন এক সাদাবর্ণের চিত্র দেখা গেলো যার চোখ দু'টি বড় বড় লাল রঙের। মাথার চুল ও দাড়ি সুদর্শনীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি এঁকে চিনো?" আমরা বললাম, 'না।' তিনি বললেন, এটি হজরত নূহ্ (আঃ) এর প্রতিচ্ছবি। এরপর তিনি আরেকটি কুঠুরী খুললেন এবং রেশমের কাপড়ের আরেকটি টুকরা বের করে প্রসারিত করলেন। তাতে দেখা গেলো এক সুন্দর চিত্র, যার চেহারা শুভ্র। মনে হলো যেনো স্বয়ং হুজুর পাক (সঃ) তশরীফ এনেছেন। তিনি বললেন," এঁকে কি তোমরা চিনতে পারছো" আমরা বললাম, "হাঁ। ইনি হচ্ছেন মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)।" এরপর আমরা ক্রন্দন করতে লাগলাম।

হেরকাল দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পুনরায় বসে পড়লেন। পুনরায় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন "ইনিই কি তিনি?" আমরা বললাম, "হাঁ ইনিই তিনি। এ ছবিখানা দেখা মানে তাঁকেই দেখা। এরপর হেরকাল ছবিখানার প্রতি দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে তাকিয়ে থাকলেন। অতঃপর মন্তব্য করলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! ইনিই আখেরী নবী। সিন্দুকের মধ্যে আরও অনেক পয়গম্বরের ছবি ছিলো। কিন্তু সমস্ত ছবি প্রদর্শন না করে তাড়াতাড়ি করে তাঁর ছবিখানা বের করে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে যেনো সত্বর তোমাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারি। নতুবা এই সিন্দুকে হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ) হজরত ঈসা (আঃ) ও হজরত সুলায়মান (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরগণের ছবিও আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ সমস্ত ছবি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, হজরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আবেদন করেছিলেন, সমস্ত আম্বিয়া ও আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ্‌পাক যেনো তাঁকে দেখিয়ে দেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ সমস্ত ছবি তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এগুলি সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে আদম (আঃ) এর সুরক্ষিত সংগ্রহে ছিলো। হজরত যুলকারনাইন (আঃ) অস্তাচলস্থান থেকে ছবিগুলো বের করে এনেছিলেন এবং হজরত দানিয়েল (আঃ) এর কাছে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন।

যবুর কিতাব থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ

যবুর শরীফের চুয়াল্লিশতম অধ্যায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা আখেরী যমানার নবী (সঃ) কে সম্বোধন করে বলেছেন, আপনার মুবারক ওষ্ঠদ্বয় থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত নিঃসৃত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা চিরকাল বরকতময় রেখেছেন। সাররাহ্ কিতাবে 'ফয়েয' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়া, পানির প্রাচুর্য নদীর দু'কূল ছাপিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া ও প্রবাহিত করা ইত্যাদি। এ পরিপ্রেক্ষিতে হাদীছের একটি প্রকার আছে হাদীছে মুস্তাফিয, অর্থাৎ এমন হাদীছ যা অধিক বিস্তার লাভ করেছে। 'ফাইয়্যায' শব্দের অর্থ বাহাদুর, দানবীর। হে বুযুর্গ! আপনি স্বীয় স্কন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে নিন। 'জাব্বার' বলা হয় এমন সুউচ্চ বৃক্ষকে যেখানে কারও হাত পৌঁছতে পারে না। এঅর্থেই বলা হয় নাখলায়ে জাব্বারা অর্থাৎ অতি উঁচু খেঁজুর গাছ। নিঃসন্দেহে আপনার শরীয়ত ও সুন্নত আপনার দক্ষিণ হস্তের সম্মানের সহিত যুক্ত। আপনার তীর ধারালো। সমস্ত উম্মত আপনার অধীনে মস্তকাবনত।

যাঁর সম্পর্কে বলা হলো সেই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। ঐ নেয়ামত যা তাঁর পবিত্র ও মিষ্ট ওষ্ঠদ্বয় থেকে জারী হবে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী। আর যে কিতাবের কথা বলা হয় তা হচ্ছে তাঁর উপর নাযিলকৃত কুরআন মজীদ। সুন্নত দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাঁর দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যাবলীকে। গর্দানে তরবারী ঝুলানোর কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে আখেরী যমানার নবী হবেন আরবীয় নবী। কেননা আরবীয়রা ছাড়া আর কোনো জাতির লোক গর্দানে তরবারী ধারণ করে না। এটা্তো সুবিদিত কথা যে, যে নবী সাহেবে শরীয়ত ও সাহেবে সুন্নত হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করেন, তিনি সাধারণত তরবারী সহকারেই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। যাতে করে তরবারীর মাধ্যমে মানুষকে সংশোধন করে হকের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন। সে তরবারীর সাহায্যে দুনিয়া থেকে যেনো কুফুরীকে মিটিয়ে দিতে পারেন।

যবুর শরীফে এরকম আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একদিন হজরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মুনাজাত করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! সুন্নত যাহেরকারী একজন (নবী) প্রেরণ করো, যাতে মানুষ জানতে পারে যে মসীহ (আঃ) মানুষ।"

এ সমস্ত সংবাদ হজরত মসীহ্ (আঃ) ও হুজুর আকরম (সঃ) এর দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে তাঁদের প্রকৃত অবস্থা যাহির করার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছিলো। তার সারমর্ম এই যে, হে খোদা! মোহাম্মদ (সঃ) কে তুমি প্রেরণ করো, যাতে তিনি মানুষদেরকে জানাতে পারেন এবং তারা যেনো পড়তে পারে যে, হজরত মসীহ (আঃ) মানুষ ছাড়া অন্যকিছু নন, তিনি কোনো ইলাহ বা খোদা নন। হজরত দাউদ (আঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, মানুষেরা হজরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে উলুহিয়াতের দাবী করে বসতে পারে।

হুজুর আকরম (সঃ) সম্পর্কে হজরত দাউদ (আঃ) এর আলোচনা ও বর্ণনা এরকম —আল্লাহ্তায়ালা সেই নবীয়ে আখেরুজ্জামানকে সত্য, সঠিক, কর্মী ও বক্তা হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাঁকে এবং তাঁর উম্মতকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কৃতকার্যতা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উম্মতকে এমন মহিমা দান করেছেন যে, তারা শয়নস্থলে আল্লাহ্তায়ালার তসবীহ পাঠ করবে এবং বুলুন্দ আওয়াযে তকবীর বলবে। তাঁদের হস্তে ধারালো তরবারী থাকবে, যাতে সে তরবারীর সাহায্যে তাঁরা আল্লাহ্র ইবাদতে বিমুখদের

মোকাবেলা করতে পারে এবং সে কালের বিধর্মী বাদশাহ্দেরকে বন্দী করতে পারে এবং বিধর্মী সম্মানীত লোকদের গলায় তওক পরিয়ে দিতে পারে।

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্তায়ালা সীহুন (মক্কা মুকাররমা) থেকে প্রশংসিতজনের পাথরখচিত মুকুটের আত্মপ্রকাশ নির্ধারণ করেছেন।" উপরোক্ত ভাষ্যে যে মুকুটের উল্লেখ করা হয়েছে সে মুকুটের অর্থ দান করা রাজত্ব ও আমানত। আর মাহমুদ (প্রশংসিত জন) এর অর্থ হচ্ছেন মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)।

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি বাদশাহ্ হবেন। মহান হৃদয়ের অধিকারী ও দানশীল হবেন। দরিয়া থেকে দরিয়া পর্যন্ত, নহর থেকে যমীনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং তার উপকূলের সবাই তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসবে। তাঁর দুশমনেরা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা মৃত্তিকা লেহন করবে। যমানার বাদশাহ্ বা তাদের মুসাহেববৃন্দ সহকারে সেজদারত অবস্থায় যমীনের উপর মস্তক অবনত করে তাঁর সামনে হাযির হবে এবং তাঁর উম্মতের নির্দেশ পালনে তারা বিনয়াবনত হবে। গর্দান অবনত করার মাধ্যমে তারা তাঁর উম্মতের হাত থেকে মুক্তি পাবে। তিনি লাঞ্ছিত ও চিন্তাক্লিষ্ট লোকদেরকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি দান করবেন। সহায়হীন দুর্বল ও আর্তজনতাকে সাহায্য করবেন। দুর্বল ও মিসকীনদের প্রতি মেহেরবানী করবেন। সবসময়ই তাঁর উপর দরুদ পাঠ করা হবে এবং সর্বদাই তাঁর জন্য লোকেরা দোয়া করতে থাকবে। অনন্তকাল পর্যন্ত সব সময়ই তাঁর নামের আলোচনা ও অনুশীলন হতে থাকবে।

আম্বিয়া কেরামের বিভিন্ন সহীফায় সুন্দর আলোচনা

তিনখানা আসমানী কিতাব অর্থাৎ তৌরিত, ইঞ্জীল ও যবুর শরীফে যে রকম সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি প্রত্যেক নবীর সহীফার মধ্যেও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি আবুল আম্বিয়া হজরত আদম (আঃ) এর সহীফায়ও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমর্মে হকতায়ালা তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, "আমি মক্কার খোদাওয়ান্দ। সেখানকার অধিবাসী আমার প্রতিবেশী। খানায়ে কাবার যেয়ারতকারী আমার মেহমান। সে আমার সাহায্য সহযোগিতার আশ্রয়ে আমার ছায়ায় অবস্থান করবে। আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে। আমি সে ঘরকে পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসীদের দ্বারা আবাদ রাখবো। গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে

মানুষ আলুথালু কেশে ধূলায় ধূসরিত হয়ে 'লাব্বায়েক' বলতে বলতে তকবির দিতে দিতে চোখে অশ্রুর ঢল নামিয়ে সেখানে উপস্থিত হবে। খানায়ে কাবার যেয়ারতকারীদের উদ্দেশ্য বাইতুল্লাহ্র যেয়ারত এবং আমার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। কেননা আমিই তো সে ঘরের মালিক। আমারই যেয়ারতে এসেছে বলে তারা আমারই মেহমান। সে আমার করমের উপযোগী ও অধিকারী হবে। তার অর্থ হচ্ছে, আমি তাঁকে অনুগৃহীত করবো। তাঁকে আমি বঞ্চিত হতে দিবোনা। সেই খানায়ে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমি প্রদান করবো তোমারই বংশধর একজন নবীর উপর যাঁকে বলা হবে ইব্রাহীম। তাঁর মাধ্যমে আমি খানায়ে কাবার বুনিয়াদকে উঁচু করাবো এবং তাঁর হাত দিয়েই আমি সে ঘরকে আবাদ করাবো। তাঁর জন্য আমি যমযমের কূপ প্রকাশিত করবো। খানায়ে কাবার হেরেম ও হেল তাঁরই উত্তরাধিকারীত্বে অর্পণ করবো। মাশআরে হারামকে তাঁরই হস্তে সজ্জিত করবো। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পরবর্তী প্রত্যেক যমানায়ই লোকেরা তাকে আবাদ রাখবে। সে ঘরের দিকে যাত্রা করার কসদ ও ইচ্ছা রাখবে। এমনকি পর্যায়ক্রমে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার ফরযন্দগণের মাধ্যমে ঐ নবী পর্যন্ত পৌঁছবে যাঁকে বলা হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি নবুওয়াতের ধারাক্রম সমাপ্তকারী হবেন। যাঁরা উক্ত ঘরে অবস্থান করবে, যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, মুতাওয়াল্লী হবে, উক্ত ঘরের হজ পালন করবে, তাঁদের সকলের মধ্যে আমি সেই নবীকেই সর্বাধিক সম্মান প্রদান করবো। যাঁরাই আমাকে অন্বেষণ করবে তাদের উপর অপরিহার্য হবে সেই নবীর জামাতের সাথে একাত্ম হওয়া।' যাঁর কেশরাজি হবে উম্মতের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত, ধূসরিত। তিনি আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁর মান্নত ও নযর পূর্ণ করবেন।"

ইব্রাহীম (আঃ) এর সহীফা

হজরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) এর সহীফায় রয়েছে, হে ইব্রাহীম! তোমার সন্তান হজরত ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে তুমি যে দোয়া করেছো তা আমি কবুল করলাম। আমি তাঁর উপর এবং তাঁর আওলাদের উপর বরকত জারী করবো। তাঁর সন্তানদের ভিতর থেকে আমি আলমে ওজুদে এমন এক ফরযন্দের আবির্ভাব ঘটাবো যিনি হবেন মহাসম্মানিত। যাঁর পবিত্র নাম হবে মোহাম্মদ (সঃ)। তিনি হবেন আমার পছন্দকৃত, মনোনীত ও প্রেরিত। তাঁর উম্মত হবে সর্বোত্তম উম্মত।

হুবকুক (আঃ) এর কিতাবে

হজরত হুবকুক (আঃ) একজন নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন হজরত দানিয়েল (আঃ) এর সমকালীন। তাঁর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা বরকত ও পবিত্রতার সাথে ফারান পর্বত থেকে আবির্ভূত হলেন এবং পৃথিবীকে আহমদ (আঃ) এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও পবিত্রতার দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। তিনিই হচ্ছেন যমীন ও উম্মতের গরদানের মালিক।

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই আকাশ মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রশংসায় উন্মুক্ত হয়েছে আর পৃথিবী ভরপুর হয়েছে তাঁর প্রশংসায়। আরও বলা হয়েছে, তাঁর নূরে যমীন আলোকিত হবে এবং তাঁর অশ্ব সমুদ্রেও চলাচল করবে।—হজরত হুবকুক (আঃ) এর বাণীতে এরূপ উল্লেখ আছে, হে মোহাম্মদ (সঃ)! অতি দ্রুতগতিতে আপনার ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হবে এবং আপনার নির্দেশে পরিচালিত তীর খুবই পরিতৃপ্ত হবে। উপরোক্ত বাক্যটি একটি কেনায়ামূলক বাক্য। এর অর্থ হচ্ছে, কোনো কাজে প্রাচুর্যের সৃষ্টি হওয়া এবং পরিণামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত উপনীত হওয়া। বাক্যটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, নবীকরীম (সঃ) এর সময়ে দ্বীন ও মিল্লাতের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে। যেমন হকতায়ালা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সমাপ্ত করেছি।

হজরত ওহাব ইবন মুনাববাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি প্রাচীন কিতাবসমূহ পাঠ করেছি। তাতে আল্লাহ্তায়ালা এরকম কসম করেছেন "আমার ইযযত জালালের কসম! আমি আরবের পর্বতরাজির প্রতি স্বীয় নূর অবতীর্ণ করবো, যে নূরের আলোকে মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত সবকিছুই নূরানী হয়ে উঠবে। ইসমাইল (আঃ) এর আওলাদের মধ্য থেকে আমি একজন আরবী ও উম্মী নবী প্রেরণ করবো যাঁর উম্মতের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির মতো এবং পৃথিবীর স্থলভাগ সমতুল্য। তাঁরা সকলেই আমার রবুবিয়াত ও তাঁর রেসালাতের উপর ইমান আনবে। তাঁরা আপন আপন পিতৃপুরুষদের মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে বেরিয়ে আসবে তাঁর ধর্মের দিকে।

হজরত মুসা (আঃ) একদিন আরয করলেন, হে আল্লাহ্। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আর তোমার নামসমূহ পবিত্র। নিঃসন্দেহে তুমি আখেরী যমানার নবীকে শ্রেষ্ঠ ইযযতসম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছো।

আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে ঘোষণা এলো, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সেই নবীর দুশমনদের বদলা গ্রহণ করবো, আমি তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আমি সমস্ত দাওয়াতের উপর তাঁর দাওয়াতকে গালেব ও বিজয়ী করে দেবো। যে তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আমি তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো। তাঁর শরীয়ত এমন এক শরীয়ত যা আদল ও ইনসাফ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। আদল ও ইনসাফ কায়েম করার জন্যই আমি সে শরীয়তের আত্মপ্রকাশ ঘটাবো। আমার যাতে পাকের কসম, আমি-তাঁর ওসীলাতে তামাম উম্মতের জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দেবো। দুনিয়াতে আমি (শেষ শরীয়তের) সূচনা করবো ইব্রাহীম (আঃ) এর মাধ্যমে। আর তার যবনিকা রচনা করবো মোহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে। যে কেউ তাঁর যমানা পাবে, অথচ তাঁর উপর ইমান আনবে না এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করবেনা তাঁর উপর আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হবেন।

হজরত শুআইয়া (আঃ) এর সহীফা

হজরত শুআইয়া (আঃ) এর সহীফায় হুজুর আনওয়ার (সঃ) এর সম্পর্কে এরকম আলোচনা করা হয়েছে—হকতায়ালা ফরমান যে, বান্দা অর্থাৎ হুজুর পাক (সঃ) আমার প্রিয়পাত্র, আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি আমার মনোনীত, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি তাঁর প্রতি আমার পক্ষ থেকে রুহ্ বর্ষণ করি। আমি তাঁর কাছে আমার ওহী অবতীর্ণ করবো, তখন উম্মতের উপর উক্ত ওহীর আকৃতি প্রকাশিত হবে। উক্ত বান্দা আমার এমন বান্দা যিনি কোনোদিন অট্টহাসি হাসবেন না, বাজারেও তাঁর উচ্চবাচ্য শোনা যাবে না। আমার সে বান্দা অন্ধদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, বধিরদের কর্ণ খুলে দেবেন এবং মৃত অন্তরকে জীবন দান করবেন। আমি তাঁকে এমন জিনিস দান করবো, যা অন্য কাউকে প্রদান করিনি। আমার সেই বান্দা হবেন আহমদ। তিনি তাঁর প্রতিপালকের প্রাণজ প্রশংসা আদায় করবেন। কেউ তাঁকে দুর্বল করতে পারবেনা। কেউ তাঁকে পরাভূত করতে পারবে না। তিনি তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। সৎ অথচ দুর্বল যাঁরা, তাদেরকে তিনি নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত মনে করবেন না। তিনি সিদ্দীকগণকে শক্তিশালী করবেন। তিনি তাওয়াযু ও বিনয় প্রকাশকারী লোকদের জন্য স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি আল্লাহ্তায়ালার নূর। সে নূরকে কেউ কক্ষণও নির্বাপিত

করতে পারবে না। তাঁর মাধ্যমে আমার সম্মান প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মাধ্যমে টালবাহানার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে জ্বীন ও ইনসান আনুগত্যশীল হবে।

এছাড়া হজরত শুআইয়া (আঃ) নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে নিজে যা আলোচনা করেছেন তা এরূপ,— তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেন, হে মোহাম্মদ (সঃ)! আমি সেই আল্লাহ্ যিনি আপনাকে সত্যের মাধ্যমে মহান ও শক্তিশালী বানিয়েছেন এবং আপনাকে এমন এক নূর বানিয়েছেন যার মাধ্যমে আপনি আপনার অন্ধ উম্মতদেরকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতে সক্ষম হবেন। আর আপনি এমন এক দলীল হবেন যার মাধ্যমে প্রবৃত্তিপরায়ণতার অন্ধকার থেকে মানুষকে নূরের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন।

হজরত শুআইয়া (আঃ) এর কিতাবে আরও আছে—তিনি বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এরশাদ করেছেন, হে শুআইয়া। ওঠো এবং দেখো। যাকিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হয়, সে সম্পর্কে মানুষদেরকে জানিয়ে দাও। তখন আমি উঠলাম এবং দেখলাম দুজন আরোহী সামনের দিক থেকে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তন্মধ্যে একজন গাধার উপর আরোহন করেছেন। অপরজন উটের উপর। আরোহীদ্বয় একে অপরকে বলছেন, বাবেল শহর ধ্বংস করে দাও এবং অই শহরের অই সকল স্মৃতিকেও ধ্বংস করে দাও যেগুলি এর অধিবাসীরা খোদাই করে বানিয়েছে।

ইবন কুতায়বা, যিনি ওলামায়ে উম্মতের অন্যতম এবং আসমানী কিতাব সমূহের এলেমের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন, তিনি বলেন, উক্ত বর্ণনায় গাধার উপর আরোহী ব্যক্তি ছিলেন হজরত ঈসা (আঃ)। এ সম্পর্কে নাসারাগণের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং উটের উপর আরোহী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। কেননা বাবেল শহরের পরাজয় ও তথাকার মূর্তির ধ্বংস সাধন হুজুর পাক (সঃ) এর পবিত্রহস্ত মুবারক দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিলো। হজরত ঈসা (আঃ) এর হাতে নয়। বাবেল অঞ্চলে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যমানা থেকেই সর্বদা সেখানকার বাদশা মূর্তিপূজা করে আসছিলো। আর হজরত ঈসা (আঃ) এর গাধায় সওয়ার হওয়া আর হুজুর আকরম (সঃ) এর উষ্ট্রে আরোহন করা এটা তো খুবই প্রসিদ্ধ ব্যাপার।

হজরত শুআইয়া (আঃ) এর কিতাবে আরও উল্লেখ আছে—আল্লাহ্ বলেন, আলে কায়দারের মহল্লা দিয়ে আমি বনাঞ্চল ও শহরাদি ভরে দেবো। তাঁরা সর্বদাই তসবীহ পাঠ করবে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়

আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এরা এমন লোক হবে যারা আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ব ও বুযুর্গী বর্ণনা করবে। তারা প্রতিটি জল ও স্থলভাগে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও তাঁর তসবীহ্ ঘোষণা করবে। তাঁরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তকবীরধ্বনি সমুন্নত করতে করতে অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ততার সাথে এগিয়ে আসবে। চারুশিল্পীরা যেমন শিল্পকর্মের জন্য মাটি ভেঙে পিষে খান খান করে পদদলিত করে কর্দম তৈয়ার করে, তেমনি তাঁরা অহংকারীর দম্ভ চূর্ণ করে পৃথিবী দলিত মথিত করে এগিয়ে আসবে।

উপরোক্ত ভাষ্যের মর্মার্থ এই যে, তারা আল্লাহ্র ভালোবাসায় পাগোল পারা হয়ে তেজোদ্দীপ্ততার সাথে এগিয়ে আসবে, হজ সম্পাদনের জন্য দ্রুত গতিতে আসবে, আওয়ায উচ্চ করতে করতে আসবে, তলবীয়া পড়তে পড়তে আসবে, তওয়াফের সময় যমী ও রমল করবে ইত্যাদি। ইবন কুতায়বা বলেন যে, আলে কায়দারের অর্থ হচ্ছে আহলে আরব। কেননা এতে ঐকমত্য রয়েছে যে, হজরত ইসমাইল (আঃ) এর নাতির নাম ছিলো কায়দার। ইবন কুতায়বা বর্ণনা করেন, হজরত শুআইয়া (আঃ) এর কিতাবে মক্কা মুকাররমা, খানায়ে কাবা এবং হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে এরকম কথা আছে যে, মানুষ এসে উক্ত পাথর মুবারক চুম্বন করবে। হজরত শুআইয়া (আঃ) এরকম বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এমর্মে এরশাদ করেছেন, তোমরা শুনে রাখো। আমি সীহুন অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় স্বীয় গৃহ (বাইতুল্লাহ্) নির্মাণ করবো, যার এক কোণে থাকবে হাজারে আসওয়াদ। উক্ত পাথরকে মহত্ব ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। লোকেরা তাকে চুম্বনকরবে। আল্লাহ্ তায়ালা মক্কা মুকাররমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আকের (নিঃসন্তান)! তুমি খুশি থাকো এবং তসবীহ্র সাথে সাক্ষ্য প্রদান করো। শোনো! তোমার আহ্ল (মান্যকারী) আমার আহ্লের চেয়ে বেশী হবে। আমার আহ্ল বলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী অর্থাৎ বনী ইসরাইলদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর নবীকরীম (সঃ) এর উম্মত যাঁরা মক্কায় হজ ও ওমরা পালন করতে আসবে তাঁদের সংখ্যা বনী ইসরাইলদের তুলনায় অধিক হবে। হকতায়ালা মক্কা মুকাররমাকে আকের বা নিঃসন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রেক্ষিতটি হচ্ছে এই যে, হজরত ইসমাইল (আঃ) এর পূর্বে এখানে কোনো আবাদ ছিলো না এবং এখানে কোনো কিতাবও নাযিল হয়নি। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থা ছিলো ভিন্ন। সেখানে অনেক আম্বিয়া কেরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে স্থান সর্বদাই ওহী নাযিলের ক্ষেত্র ছিলো।

হজরত শুআইয়া (আঃ) এর কিতাবে আরও রয়েছে, হকতায়ালা মক্কা মুকাররমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমার যাতে পাকের কসম, যে রকম কসম আমার উপযোগী, নূহ (আঃ) এর যমানায় আমি প্রলয়ের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। তোমার সম্পর্কে আমি আমার যাতে পাকের কসম করে বলছি, আমি তোমার প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবোনা এবং আমি তোমাকে কখনও পরিত্যাগও করবো না। যতক্ষণ সমস্ত পবর্তরাজি আপন আপন স্থান থেকে বিচ্যুত ও উৎপাটিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নেয়ামতসমূহ তোমার উপর থেকে অপসারণ করবোনা। হে কাবা! তুমি জেনে রেখো যে আমি তোমার ভিত্তিগুলিকে চূনা ও পাথর দিয়ে নির্মাণ করিয়ে দেবো। তোমাকে আমি মনিমুক্তা দ্বারা সজ্জিত করে দেবো। তোমার ছাদকে সিক্ত মোতি দ্বারা, তোমার দরোজাকে যবরযদ পাথর দ্বারা সাজিয়ে দেবো। তোমা থেকে অনাচারকে বহু দূরে রাখা হবে। তোমাকে কোনো গোনাহ্গার স্বীয় গোনাহ্ দ্বারা ক্ষতি করতে পারবে এমন ভয় করো না। ওঠো, উজ্জ্বল হও। তোমার নূরকে পৌঁছিয়ে দেয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার মহত্ব ও সম্মান তোমারই উপর নিপতিত— এর মধ্যে খাতেমুল আম্বিয়া (সঃ) এর নূরের বহিঃপ্রকাশের সুসংবাদ রয়েছে। এমনিভাবে হেরেম শরীফ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভেড়া ও বকরী একস্থানে বিচরণ করবে। তাদের রাখাল সম্পর্কে যে মাহাত্ম ও মহিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করা ক্ষমতার বাইরে।

মোট কথা এই যে, সাইয়েদে আলম (সঃ) এর গুণাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে কোথাও কোথাও এর চেয়েও বেশী আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনায় কোনোরূপ অস্পষ্টতা এবং সন্দেহের লেশমাত্র নেই। তবে হাঁ, দ্বীনের দুশমনেরা ওসব গুণাবলী, অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ রূপান্তরিত করেছে। তা সত্বেও বিস্তর দলীল সমূহ ও সাক্ষীপ্রমাণসমূহ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

"কাফেররা চায় মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে অথচ আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নূরকে পূর্ণতা প্রদান করবেন, যদিও কাফেররা এটাকে অপছন্দ করে।" সূরা সফ

সুসংবাদ সম্বলিত কতিপয় বিবরণ

মোটামুটিভাবে জানা গেলো যে, সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আলোচনা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিদ্যমান

রয়েছে। আর আহলে কিতাবদেরও এ সম্পর্কে অকাট্য এলেম এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। পরবর্তীতে তারা হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে হতভাগ্যতার কাছে পরাভূত হয়ে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান ও দূরবর্তীতার রাস্তা অবলম্বন করে পরিবর্তন ও রূপান্তরের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো। এখানে এদের হিংসা বিদ্বেষ সংক্রান্ত কিছু বিবরণ উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

হাদীছঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁর পিতা মালেক ইবন সিনান যিনি শুহাদায়ে উহুদগণের অন্যতম ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একদিন কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে বনী আব্দুল আশহাল গোত্রে গেলাম। ঐ সময় ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি ছিলো। সেখানে যাওয়ার পর ইউশা নামক জনৈক ইহুদীকে বলতে শুনলাম, এখন ঐ নবীর আত্মপ্রকাশের কাল নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে, যাঁর নাম হবে আহমদ। তিনি মক্কার হেরেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তিনি এই শহর অর্থাৎ মদীনাতে হিজরত করে আসবেন। একথা শুনার পর আমি স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলাম। ইউশার কাছ থেকে যা শুনেছি, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি আমার কাওমের জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত কথা শুনালাম। তখন সে বললো, একথাতো শুধু একা ইউশাই বলছে না, বরং ইয়াছরিবের সমস্ত ইহুদীই একথা বলাবলি করছে।

এরপর আমি সেখান থেকে বনী কুরায়যা মহল্লায় গেলাম। সেখানেও শুনতে পেলাম, হুজুরপাক (সঃ) সম্পর্কে একই আলোচনা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইহুদীদের সরদার যুবায়র ইবন বাতা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই অই লাল তারা উদিত হয়ে গেছে, যা কোনো নবীর আবির্ভাব ব্যতীত কখনও উদিত হয়না। সে আরও বললো যে, এখন আহমদ (সঃ) ছাড়া তো আর অন্য কোনো নবীর আবির্ভাব হবেনা। এই শহর অর্থাৎ ইয়াছরিব হবে তাঁর হিজরতের স্থান। হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) হিজরত করে যখন মদীনা আলোকিত করলেন, তখন আমি এই ঘটনাটি তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, যুবায়ের এবং তার সাথী ইহুদীদের সরদাররা যদি মুসলমান হয়ে যেতো, তাহলে সমস্ত ইহুদীরাই ইসলাম গ্রহণ করতো। কেননা এরা সকলেই তাদের অনুসারী।

হজরত কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ইহুদীরা যখন আরবের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় কামনা করে বিভিন্ন দোয়া করতো, তখন তারা উক্ত দোয়ায় বলতো—হে আল্লাহ্! তৌরিত কিতাবের মধ্যে যে

নবীয়ে আখেরুজ্জামানের সংবাদ আমরা পেয়েছি, সে নবীর আবির্ভাব ঘটাও। যাতে করে তিনি আত্মপ্রকাশ করে কাফেরদেরকে শায়েস্তা করতে পারেন, আর আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে এ সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে পারি। তাদের এই দোয়া করার কারণ এই ছিলো যে, তারা মনে করতো উক্ত নবী তাদের স্বজাতীয় হবেন অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকেই আসবেন। পরবর্তীতে তারা যখন দেখলো যে, সে নবী তাদের স্বজাতীয় না হয়ে বনী ইসমাইল্ থেকে আগমন করেছেন, তখনই তারা প্রত্যাখ্যানের পথ গ্রহণ করলো এবং অস্বীকার ও অবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হলো।

হাদীছ ঃ হজরত মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মাকুকাশ বাদশার কাছে গেলেন। বাদশাহ্ তাঁকে লক্ষ্য করে বললো, মোহাম্মদ (সঃ) নবী ও রসূল ঠিকই। তবে তিনি যদি কিবত অর্থাৎ মিশর অথবা রোমের লোক হতেন, তাহলে সকলেই তাঁর অনুসরণ করতো। মুগীরা (রাঃ) বলেন, এরপর আমি ইসকান্দারিয়াতে উপস্থিত হলাম। সেখানে যাওয়ার পর এই অঞ্চলের এমন কোনো গীর্জা আমি বাদ রাখিনি যেখানে যাইনি। আমি কিবত ও রোমের সমস্ত ধর্মীয় নেতাদেরকে বলেছি যে, তোমরা তোমাদের আসমানী কিতাবসমূহে হুজুর আকরম (সঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কে যা কিছু পেয়েছো আমার কাছে বর্ণনা করো।

সেখানে একজন ধর্মীয় নেতা ছিলো। লোকেরা রোগাক্রান্ত হলে তার কাছে আসতো। সে তাদের জন্য দোয়া করতো। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আম্বিয়াগণের মধ্যে এমন কোনো নবী কি বাকি আছেন, যার আবির্ভাব এখনও হয়নি? অথচ ভবিষ্যতে আগমন করবেন? সে বললো, হাঁ! তিনি শেষ নবী। তাঁর মধ্যে এবং হজরত ঈসা (আঃ)এর মধ্যবর্তী আর কোনো নবী নেই। শুধু সেই নবী বাকি রয়েছেন। নিঃসন্দেহে হজরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। সে নবী হবেন আরবী উম্মী—তাঁর নাম হবে আহমদ। তিনি খুব বেশী লম্বাও হবেন না আবার বেঁটেও হবেন না। তাঁর দুচোখ হবে রক্তিম বর্ণের। সাদাও হবে না। কালোও হবে না। তাঁর চুল হবে থোকা থোকা। তিনি শক্ত ও মোটা কাপড় পরিধান করবেন। আহারের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ খাবার গ্রহণ করবেন। যখন যাই মিলবে তাই আহার করবেন। তার উপরই সন্তুষ্ট থাকবেন। তাঁর স্কন্ধে তলোয়ার থাকবে। কোনো ব্যক্তি তাঁর মুকাবেলা করতে এলে তিনি তাকে ভয় করবেন না। যুদ্ধে তিনি কখনও আগে আক্রমণকারী হবেন না। তাঁর আসহাবগণ তাঁর জন্য জীবন কুরবান করতে কুণ্ঠিত হবেন

না। তাঁরা আপন আপন পিতা মাতা ও সন্তান সন্তুতির চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবাসবেন। তাঁর আত্মপ্রকাশ হবে এমন স্থানে যেখানে 'সলম' নামক বৃক্ষ রয়েছে। তিনি এক হেরেম (পবিত্রস্থান) থেকে বের হয়ে অপর হেরেমের দিকে হিজরত করবেন। তিনি এক কোলাহলময় স্থান থেকে খেজুরের বনানীময় স্থানের দিকে হিজরত করে আসবেন। তিনি পায়েব গোছার আধাআধিস্থানে লুঙ্গি পরিধান করবেন। শরীরের অঙ্গসমূহের বিভিন্ন প্রান্ত ধৌত করবেন (অজু করবেন)। আর এহেন ধৌত কাজে এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে, যা অন্য কোনো নবীগণের বেলায় ছিলোনা।

সমস্ত নবীগণই আপন আপন কওমের প্রতি আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তিনি সারা জাহানের জন্য আবির্ভূত হবেন। সমস্ত ভূখন্ডকে তাঁর জন্য সেজদার স্থান বানানো হবে। তিনি মাটিকে পাক পবিত্রকারী হবেন। যেখানেই নামাজের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই তিনি (পানিবিহীন অবস্থায়) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবেন। হজরত মুগীরা (রাঃ) উক্ত সফর থেকে যখন ফিরে এলেন, সে লোকটি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং রসূল করীম (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে তিনি যা শুনেছিলেন সব নবীকরীম (সঃ) এর কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

হাদীছ ঃ হজরত সাঈদ ইবন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর পিতা যায়েদ ইবন আমর একদা ধর্মের তালাশে বের হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় 'মুসেল' নামক স্থানে একজন পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। পাদ্রী লোকটি যায়েদকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কোত্থেকে আসছো? যায়েদ বললেন, বাইতে ইব্রাহীম অর্থাৎ খানায়ে কাবা থেকে আসছি। পাদ্রী বললো, কিসের তালাশে বের হয়েছো?" যায়েদ বললেন, "দ্বীনের তালাশে বের হয়েছি।" পাদ্রী বললো, "ফিরে যাও, তুমি যাঁর সন্ধানে বের হয়েছো তিনি অচিরেই তোমাদের ভূখন্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন।" এ কারণেই যায়েদ ইবন আমর ইবন নুযায়েলকে জাহেলী যুগের তৌহিদবাদী বলা হয়। তিনি মুশরেকদের হাতে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত্ ভক্ষণ করতেন না এবং আপন সম্প্রদায়ের নিকট তৌরিত কিতাব পাঠ করতেন না। এর আলোচনা সহীহ্ বুখারী শরীফেও বিবৃত হয়েছে।

হাদীছ ঃ হজরত ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী (সঃ) কে একজন পুরুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রেরণ করেছেন। উক্ত কথাটির মূল ঘটনা হচ্ছে এই যে, হুজুর আকরম (সঃ) একদিন এক ইহুদীর গির্জায় তশরীফ নিয়েছিলেন। সেখানে যেয়ে তিনি দেখলেন, একজন ইহুদী তৌরিত কিতাব পাঠ করে কওমের

লোকদেরকে শুনাচ্ছেন। উক্ত ইহুদী তৌরিত কিতাব পাঠ করতে করতে নবীয়ে আখেরুজ্জামানের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় পৌঁছেই চুপ হয়ে গেলো, আলোচনা ক্ষান্ত করে সে রোগাক্রান্ত বাচ্চার মতো প্রলাপ বকতে শুরু করলো। তখন অপর একটি লোক সেখানে যেয়ে পূর্বোক্ত লোকটির কাছ থেকে তৌরিত কিতাব নিয়ে হুজুর পাক (সঃ) এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ পাঠ করে বলতে লাগলেন যে, এগুলি হচ্ছে আপনার গুণাগুণ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসূল। এ কলেমা পাঠ করার পর পরই লোকটির মৃত্যু হলো। এরপর হুজুর পাক (সঃ) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা তোমাদের এ ভাইয়ের গোছল ও জানাযার ব্যবস্থা করো।

হাদীছ ঃ হজরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন তায়েফের বাদশাহ্ তুব্বা মদীনা শরীফের উপর চড়াও হলো— ইতিপূর্বে সে এলান করে দিয়েছিলো যে, আমি মদীনাকে বিরান করে দেবো। আর সেখানকার অধিবাসীদেরকে আমি হত্যা করবো, আমার ঐ পুত্রের জানের বিনিময়ে, যাকে তারা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছিলো। তখন সে যমানার ইহুদীদের বড় আলেম সামউল বলেছিলো "হে বাদশাহ্! এটাতো ঐ শহর যেখানে বনী ইসমাইলের মধ্য থেকে আগত আখেরী যমানার নবী হিজরত করবেন। সেই নবীর জন্মভূমি হবে মক্কা মুকাররমা। কিন্তু তাঁর রওজা শরীফ হবে এখানে। এসব কথা শুনামাত্র তুব্বা বাদশাহ্ মদীনা শরীফ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। ইমাম মোহাম্মদ ইবন ইসহাক বুখারী (রঃ) স্বীয় হাদীছগ্রন্থ বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীতে উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীতে তুব্বা বাদশাহ্ নবীয়ে আখেরুজ্জামানের জন্য এক আলীশান মহল নির্মাণ করেছিলো। তুব্বার সাহচর্যে তৌরিত কিতাবের চারশ' আলেম সর্বদাই অবস্থান করতেন। উক্ত বর্ণনা শুনার পর সেই চারশ' আলেম তুব্বাকে ছেড়ে মদীনা শরীফে রয়ে গিয়েছিলেন এ আশায় যে, আখেরী যমানার নবীর সোহবতের মহান সৌভাগ্য হাসেল করবেন। তুব্বা বাদশাহ্ চারশ' আলেমের প্রত্যেকের জন্য একেকটি করে বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। একটি করে বাঁদী দান করেছিলেন এবং সকলকেই অঢেল ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। তুব্বা তখন একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন যার মধ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেই চিঠির মধ্যে কতিপয় কবিতার উল্লেখ ছিলো। কবিতাগুলো এরকম—

'আমি আহমদ (সঃ) এর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি অই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল, যিনি মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আমি যদি তাঁর আত্মপ্রকাশের যমানা পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহ্‌লে আমি তাঁর ওযীর এবং চাচাতো ভাই হবো।'

অতঃপর তুব্বা বাদশাহ্‌ উক্ত চিঠিখানা মোহ্‌রযুক্ত করে উক্ত চারশ' আলেমগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম যিনি, তাঁর কাছে প্রত্যার্পণ করে ওসীয়ত করলেন যে, তুমি যদি নবীয়ে আখেরুজ্জামানকে পাও তাহ্‌লে আমার এই চিঠি তাঁর খেদমতে পেশ করবে। অন্যথায় বংশানুক্রমে আপন আপন আওলাদদেরকে এই চিঠি পৌঁছানোর ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে। তুব্বা বাদশাহ্‌ হুজুর আকরম (সঃ) এর জন্যও একখানা বাড়ি নির্মাণ করিয়ে রেখেছিলেন। সে বাড়িখানা হুজুর পাক (সঃ) এর কদম স্পর্শ করা পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। কথিত আছে, হিজরতের সময় হুজুর পাক (সঃ) যে হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর বাড়িতে তশরীফ এনেছিলেন, সেই বাড়িই উক্ত বাদশাহ্ কর্তৃক নির্মিত বাড়ি।

আরো বর্ণিত আছে, যুবায়ের ইবন বাতা ইহুদীদের একজন অন্যতম বড় আলেম ছিলো। সে বলেছে, আমার পিতা একদা একখানা চিঠি লিখেছিলেন। যার মধ্যে আহ্‌মদ মুজতবা (সঃ) এর আলোচনা ছিলো। চিঠিখানা মোহ্‌রযুক্ত করে আমার কাছে দিয়ে বললেন, এ চিঠিতে যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি একজন নবী। যিনি কিরত নামক স্থানে যাহির হবেন। তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এই। অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলো। কিন্তু তখনও হুজুর পাক (সঃ) আবির্ভূত হননি। কিন্তু সে যখন শুনতে পেলো যে, হুজুর আকরম (সঃ) মক্কাতে যাহির হয়েছেন, তখন সে উক্ত চিঠিখানা নষ্ট করেছিলো এবং হুজুর পাক (সঃ) এর শান ও সিফত সমূহ্‌ গোপন করবার চেষ্টা করেছিলো।

বনু কুরায়যা, বনু নযীর ও ফেদেক কবীলা এবং খয়বরের ইহুদীরা হুজুর পাক (সঃ) এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকে তাঁর সম্পর্কে জানতো। এমনকি তারা বলতো, মদীনা শরীফে তিনি হিজরত করবেন। মক্কা মুকাররমায় যেদিন হুজুর পাক (সঃ) ভূমিষ্ঠ হলেন, সেদিন তারা বলেছিলো, আজ রাতে আহ্‌মদ মুজতবা (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর জন্মের তারকা উদয় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন সে কাফেররা তাঁকে অস্বীকার করা শুরু করে দিলো। তাদের অস্বীকারের কারণ ছিলো তাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা।

বিবরণ ঃ হিশাম ইবন উরওরা আপন পিতা থেকে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন, মক্কা মুকাররমায় জনৈক ইহুদী ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলো। যখন হুজুর আকরম

(সঃ) এর জন্মরজনী সমাগত হলো তখন সে কুরাইশদের মজলিশে এসে বসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আজ রাতে তোমাদের কারও কোনো সন্তান জন্ম নিয়েছে কি? কুরাইশরা বললো, আমাদের জানা নেই। সে বললো, না। হে কুরাইশগণ। তোমরা আমার কথামতো অনুসন্ধান করো! নিশ্চয়ই আজ রাত্রে সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। তিনি এই উম্মতের নবী। তাঁর নাম আহমদ। তাঁর দু কাঁধের মাঝামাঝিতে পশমাবৃত একটি চিহ্ন থাকবে। একথা শুনে কুরাইশের লোকেরা মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং ইহুদীর বক্তব্য শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো।

কুরাইশরা যখন সকলেই আপন আপন গৃহে ফিরে গেলো তখন পরিবারের লোকদের কাছ থেকে শুনতে পেলো, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁর নাম রাখা হয়েছে মোহাম্মদ (সঃ)। এরপর তারা উক্ত ইহুদী লোকটির কাছে এসে বললো, আমাদের ওখানে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। ইহুদী লোকটি কুরাইশদের কাছ থেকে এখবর শোনার পূর্বে অথবা মতান্তরে খবর শোনার পর বললো, আমাকে সেই নবজাত সন্তানটির কাছে নিয়ে চলো। তারা তাকে হজরত আমেনার বাড়ীতে নিয়ে এলো। হুজুর আকরম (সঃ) কে বাইরে নিয়ে আসা হলো।

ইহুদী লোকটি হুজুর আকরম (সঃ) এর পৃষ্ঠদেশে সেই নিশানা অর্থাৎ মহরে নবুওয়াত দেখতে পেলো এবং সঙ্গে সেঙ্গে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। লোকটি যখন সম্বিত ফিরে পেলো তখন কুরাইশরা বললো, আফসোস! কি হলো তোমার। ইহুদিটি বললো, বনী ইসরাইল থেকে নবুওয়াতের ধারা বিদায় নিতে চলেছে এবং তৌরিত কিতাব এখন তাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেলো। এ নবজাত সন্তান বনী ইসরাইলদেরকে মেরে ফেলবে। আর তাদের আহবার ও ওলামাদেরকে কতল করবে। আরবীয়রা নবুওয়াতের নিয়ামত পেয়ে গেলো। হে কুরাইশ গোত্র। তোমাদের জন্য মুবারকবাদ। জেনে রেখো, খোদার কসম, মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত তোমাদের শান শওকত ছড়িয়ে পড়বে। এই ঘটনার শেষাংশের কিছু বর্ণনা বেলাদতে সাইয়্যেদে আলম (সঃ) এর অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

হাদীছ ঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) একদা বায়তে মাদরাসে তশরীফ নিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে জ্ঞানী-বুদ্ধিমান তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন সূরিয়াকে আনা হলো। হুজুর আকরম (সঃ) নির্জনে তাকে নিয়ে আলোচনা করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে

তোমার দ্বীনের কসম দিয়ে বলছি। শুধু তাই নয় বনী ইসরাইলদের উপর যেমন নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো—মান্না সালওয়া অবতীর্ণ হয়েছিলো, মেঘের ছায়া প্রদান করা হয়েছিলো এ সবের কসম দিয়ে বলছি। তুমি বলতো দেখি "আমি কি আল্লাহ্‌র রসূল?" সে তখন উত্তরে বললো, হাঁ, শুধু আমি নই; আমার কাওমের সকলেই একথা খুব ভালোকরেই জানে। আপনার প্রশংসা, পরিচিতি, গুণাবলী ও সৌন্দর্যসমূহ যা কিছু আমি জানি তার সবকিছুই তৌরিত কিতাবে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এ কওম আপনার উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে প্রতিহিংসার কারণে আপনাকে অস্বীকার করে। হুজুর পাক (সঃ) বললেন, এরপরও কোনো জিনিস তোমাকে ইমান গ্রহণ করা থেকে বাধা দিচ্ছে? তুমি কেন মুসলমান হচ্ছো না? সে বললো, আমি আমার কাওমের বিরুদ্ধাচরণ করাটাকে পছন্দ করি না। আমি এটা কামনা করি—তারা যেনো সকলেই আপনার আনুগত্য করে ইমান নিয়ে আসে, মুসলমান হয়ে যায়, তাহ্‌লে আমিও মুসলমান হয়ে যাবো।

হাদীছ ঃ হজরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি একদা শাম দেশের বসরা এলাকার কোনো এক বাজারে ছিলাম। হঠাৎ এক পাদ্রীর আস্তানা থেকে শুনতে পেলাম জনৈক পাদ্রী বলছে ব্যবসায়ীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমাদের মধ্যে মক্কার কোনো লোক রয়েছে কিনা? তালহা (রাঃ) বললেন, হাঁ আমি ওখানকার বাসিন্দা। পাদ্রী বললো, মক্কাতে কি আহমদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন? আমি বললাম, কোন্ আহমদ? সে বললো, আব্দুল মুত্তালিবের নাতি। আজকের এই সময়েই সম্ভবতঃ তিনি আগমন করেছেন। তিনি আখেরী নবী। হেরেমের জায়গা হবে তাঁর প্রকাশিত হওয়ার স্থান আর তাঁর হিজরতের স্থান হবে খোরমা, পাহাড় ও কোলাহলমুখরিত স্থান অর্থাৎ ইয়াছরিব।

হজরত তালহা বলেন, পাদ্রীর কথাগুলি আমার মনে দাগ কাটলো। অতঃপর আমি সেখান থেকে মক্কা মুকাররমায় চলে এলাম। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম নতুন ঘটনা ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে কিনা। লোকেরা বললো, হাঁ মোহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (সঃ) নবুওয়াতের দাবী পেশ করেছেন এবং ইবন কুহাফা অর্থাৎ হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর আনুগত্য কবুল করেছেন। এরপর আমি হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে এসে পাদ্রীর কথাগুলি জানালাম। এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "আপনি কি সে নবীর আনুগত্য কবুল করেছেন?" তিনি বললেন, হাঁ।—এরপর হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হজরত তালহা

(রাঃ) কে নিয়ে হুজুর পাক (সঃ) এর কাছে গেলেন এবং তিনিও নবী করীম (সঃ) এর আনুগত্য কবুল করলেন।

হাদীছ ঃ হজরত জুবায়র ইবন মুতয়িম (রাঃ) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেন, যে সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবী (সঃ) কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর নবুওয়াত মক্কায় মশহুর হয়ে গেলো, তখন আমি শাম দেশের দিকে চলে গেলাম। আমি যখন বসরায় পৌঁছলাম তখন নাসারাদের একটি জামাত এলো এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি হেরেম মক্কা থেকে আসছো? আমি বললাম, হাঁ। তারা আমাকে আবার প্রশ্ন করলো," তুমি কি সেই লোকটিকে চেনো যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করেছে? আমি বললাম, 'হাঁ আমি তাঁকে চিনি।' তখন তারা আমার হাত ধরে ফেললো এবং আমাকে এমন একটি ইবাদতখানায় নিয়ে গেলো, যেখানে অসংখ্য ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। তারা বললো, এ ছবিগুলি খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করে দেখো দেখি, এগুলির কোনোটির সাথে তাঁর সাদৃশ্য আছে কিনা। আমি এক এক করে প্রত্যেকটি ছবি খুব ভালো ভাবে পরখ করে দেখলাম। কিন্তু কোনোটির সাথে নবী করীম (সঃ) এর আকৃতির মিল পেলাম না। তারপর এরা আমাকে আরও বড় একটি ইবাদতখানায় নিয়ে গেলো। সেখানে পূর্বের তুলনায় আরও বেশী ছবি ঝুলন্ত ছিলো। তারা বললো, দেখো দেখি এসমস্ত ছবির কোনটির সঙ্গে সেই মুবারক আকৃতির মিল আছে?। দেখতে দেখতে অকস্মাৎ হুজুর আকরম (সঃ) এবং হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর আকৃতি আমার দৃষ্টিগোচের হলো। দেখলাম হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হুজুর পাক (সঃ) এর হাঁটু মুবারক ধরে বসে আছেন। তখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "এ আকৃতি কি তোমার কখনও দৃষ্টিগোচর হয়েছে?" আমি বললাম হাঁ, তবে সাথে সাথেই আমার মনে একটা চিন্তা জাগলো যে, এখনই সবকিছু খুলে বলা ঠিক হবে না। দেখা যাক, এরা আর কি বলে। তারা এরপর হুজুর পাক (সঃ) এর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করলো। এরপর আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিই সেই নবী যাঁর বর্ণনা প্রদান করা হলো। অতঃপর তারা আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করলো, তুমি কি জানো এই লোকটি কে? যিনি তাঁর জানু মুবারক ধরে বসে আছেন। আমি বললাম, ইনি তাঁর খাছ সহচর এবং তাঁর পরে ইনিই হবেন তাঁর প্রধান খলীফা। তবে আমার ভয় হচ্ছে কুরাইশরা না জানি তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আমার একথা শুনে তারা বললো, খোদার কসম! কুরাইশরা তাঁকে কক্ষণও হত্যা করতে পারবে না। তিনি

আখেরী যমানার নবী। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সকলের উপর বিজয়ী করে রাখবেন।

হাদীছ ঃ আখতাবের পুত্র হুয়াই একজন ইহুদী ছিলো। তাঁর কন্যা হজরত সুফিয়া (রাঃ) উম্মাহাতুল মুমিনীন এর একজন ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরম (সঃ) যখন কুবায় পদার্পণ করলেন এবং সেখানে অবস্থান করছিলেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইবন আখতাব এবং আমার চাচা আবু ইয়াসের ইবন আখতাব অর্ধরাত্রে অন্ধকারে হুজুর আকরম (সঃ) এর কাছে গেলেন এবং সেখান থেকে আর ফিরে এলেন না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এলো। কিন্তু তারা ফিরলেন না।

অবশেষে তারা যখন ঘরে ফিরলেন আমি তাদেরকে খুব বিষণ্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখতে পেলাম।তারা যে কতো বেশী চিন্তিত ছিলেন তা আমি অনুমান করতে পারছিলাম না। ঘরে প্রবেশ করেই তাঁরা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যেহেতু অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় আমি তাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলাম, তাই আমার অভ্যাস মুতাবেক সর্বাগ্রে তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তারা দুশ্চিন্তায় এতো বেশী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করারও অবকাশ তাদের ছিলো না। এমনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যাতনাদগ্ধ অবস্থায় আমার চাচা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনিই কি সেই নবী? ইনিই কি সেই আখেরী যমানার নবী যার গুণাবলীর বর্ণনা আমরা তৌরিত কিতাবে পেয়েছি? আমার পিতা তখন চাচাকে বললেন, হাঁ ইনিই সেই নবী, খোদার কসম, ইনিই সেই নবী। আমার চাচা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একীনের সাথে জানো যে ইনিই সেই নবী? আমার পিতা বললেন, খোদার কসম, আমি একীনের সাথেই জানি যে ইনিই সেই নবী? চাচা বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার অন্তরের অবস্থা কি রকম? মহব্বত না দুশমনী? আমার পিতা বললেন, দুশমনী। আল্লাহ্র কসম! যতদিন আমি জীবিত থাকবো তাঁর প্রতি আমার দুশমনী চালিয়ে যাবো। পরবর্তীকালে এ উভয় বদবখত্ হুজুর আকরম (সঃ) এর চিরন্তন দুশমনীতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলো। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক।

ঐ ইহুদীদের কতিপয় বদবখত দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও হাকীর মাল অর্জনের অসীলায় দুনিয়াবী ধ্বংসশীল জিন্দেগীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে নেফাকের মত ঘৃণ্য নীতিকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে আসফালা সাফেলীনদের স্তরে উপনীত হয়েছিলো। আবার এ সমস্ত ইহুদীদের মধ্যে এমন কতিপয় ওলামা ও আহবারও ছিলেন যাঁদের সৌভাগ্যের ললাটে প্রথম থেকেই আযলী

রহমত ও সাআদাত অংকিত করা হয়েছিলো। তাঁরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন এবং আখেরাতের দৌলত ও সৌভাগ্য জমা করে নিয়েছিলেন। যেমন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম প্রমুখ। মাখবরীক যিনি ওলামায়ে ইহুদীদের এর মধ্যে বিরাট বড় আলেম, ধনী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনিই হুজুর আকরম (সঃ) এর সিফাত খুব ভালো করে জানতেন এবং তার উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি স্বীয় কওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! খোদার কসম। তোমরা ভালো করে জানো যে, সাইয়্যেদুনা মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে সাহায্য করা আমাদের সকলের উপরই ওয়াজিব। কাজেই তোমরা এ সৌভাগ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করো। ইহুদীরা বললো, আজ তো শনিবার সপ্তাহের পবিত্র দিন। তিনি বললেন, কোনো সপ্তাহ টপ্তাহ নেই। তোমরা বেরিয়ে এসো, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

একথার পর তাঁরা অস্ত্রধারণ করলেন। ইমান এনে ওসীয়ত করে গেলেন, আজকের এ যুদ্ধে যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমাদের যাবতীয় ধন সম্পদের মালিক হুজুর আকরম মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। তিনি যা চাইবেন তাই করবেন, যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে দান করতে পারবেন। অবশেষে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতের সুরা পান করলেন এবং হুজুর আকরম (সঃ) তাঁদের যাবতীয় মাল হস্তগত করলেন। হুজুর পাক (সঃ) যে আম সদকা দান করতেন তা তাঁদের এই মাল থেকেই করতেন। হজরত সালমান ফারসী (রাঃ) যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তিনশ বৎসর ধরে আবার অন্য এক বর্ণনা অনুসারে তার চেয়েও অধিক কাল ধরে হুজুর পাক (সঃ) এর আবির্ভাবের খবর শুনে তাঁর প্রতীক্ষায় দিবানিশি অতিবাহিত করছিলেন। এ সম্পর্কে মশহুর ঘটনা রয়েছে।